কিশোর থ্রিলার
সেবা
প্রকাশনী
Banglapdf.net
NAEEM
তিন গোয়েন্দা
ভলিউম ৩৪
রকিব হাসান
NAHID

ভলিউম-৩৪

তিন গোয়েন্দা

৮৬, ১২৩, ১২৪

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-1396-4
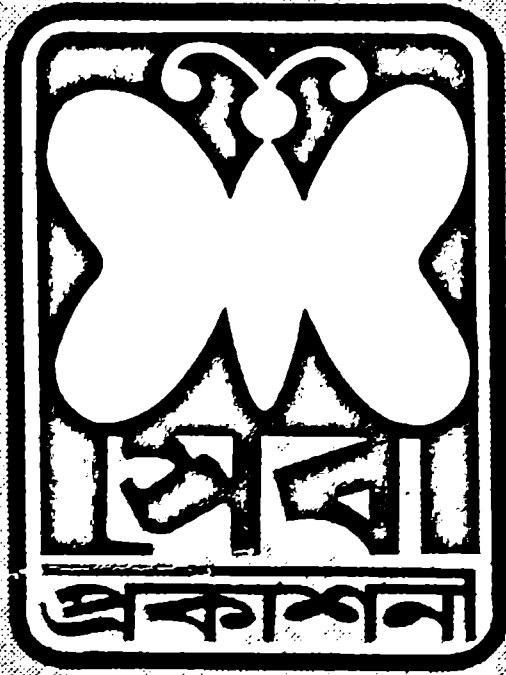
প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩
Volume-34
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

সেবা প্রকাশনী

পঞ্চান্ন টাকা

তিন গোয়েন্দার আরও বই:

তি. গো. ভ. ৩৫ (নকশা, মৃত্যুঘড়ি, তিন বিঘা)
তি. গো. ভ. ৩৬ (টক্কর, দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো)
তি. গো. ভ. ৩৭ (ভোরের পিশাচ, গ্রেট কিশোরিয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ) ৫৪/-
তি. গো. ভ. ৩৮ (উচ্ছেদ, ঠগবাজি, দীঘির দানো)
তি. গো. ভ. ৩৯ (বিষের ভয়, জলদস্যুর মোহর, চাঁদের ছায়া)
তি. গো. ভ. ৪০ (অভিশপ্ত লকেট, গ্রেট মুসাইয়োসো, অপারেশন অ্যালিগেটর)
তি. গো. ভ. ৪১ (নতুন স্যার, মানুষ ছিনতাই, পিশাচকন্যা)
তি. গো. ভ. ৪২ (এখানেও ঝামেলা, দুর্গম কারাগার, ডাকাত সর্দার)
তি. গো. ভ. ৪৩ (আবার ঝামেলা, সময় সুড়ঙ্গ, ছদ্মবেশী গোয়েন্দা)
তি. গো. ভ. ৪৪ (প্রত্নসন্ধান, নিষিদ্ধ এলাকা, জবরদখল)
তি. গো. ভ. ৪৫ (বড়দিনের ছুটি, বিড়াল উধাও, টাকার খেলা)
তি. গো. ভ. ৪৬ (আমি রবিন বলছি, উল্কি রহস্য, নেকড়ের গুহা)
তি. গো. ভ. ৪৭ (নেতা নির্বাচন, সি সি সি, যুদ্ধযাত্রা)
তি. গো. ভ. ৪৮ (হারানো জাহাজ, শ্বাপদের চোখ, পোষা ডাইনোসর)
তি. গো. ভ. ৪৯ (মাছির সার্কাস, মঞ্চভীতি, ডীপ ফ্রিজ)
তি. গো. ভ. ৫০ (কবরের প্রহরী, তাসের খেলা, খেলনা ভালুক)
তি. গো. ভ. ৫১ (পেঁচার ডাক, প্রেতের অভিশাপ, রক্তমাখা ছোরা)
তি. গো. ভ. ৫২ (উড়ো চিঠি, স্পাইডারম্যান, মানুষখেকোর দেশে)
তি. গো. ভ. ৫৩ (মাছেরা সাবধান, সীমান্তে সংঘাত, মরুভূমির আতঙ্ক) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৫৪ (গরমের ছুটি, স্বর্গদ্বীপ, চাঁদের পাহাড়) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৫ (রহস্যের খোঁজে, বাংলাদেশে তিন গোয়েন্দা, টাক রহস্য) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৫৬ (হারজিত, জয়দেবপুরে তিন গোয়েন্দা, ইলেক্ট্রনিক আতঙ্ক)
তি. গো. ভ. ৫৭ (ভয়াল দানব, বাঁশিরহস্য, ভূতের খেলা)
তি. গো. ভ. ৫৮ (মোমের পুতুল, ছবিরহস্য, সুরের মায়া)
তি. গো. ভ. ৫৯ (চোরের আস্তানা, মেডেল রহস্য, নিশির ডাক) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬০ (শুঁটকি বাহিনী, ট্রাইম ট্র্যাভেল, শুঁটকি শত্রু) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬১ (চাঁদের অসুখ, ইউএফও রহস্য, মুকুটের খোঁজে তি. গো.) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬২ (যমজ ভূত, ঝড়ের বনে, মোমপিশাচের জাদুঘর) ৪০/-
তি. গো. ভ. ৬৩ (ড্রাকুলার রক্ত, সরাইখানায় ষড়যন্ত্র, হানাবাড়িতে তিন গোয়েন্দা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৬৪ (মায়াপথ, হীরার কার্তুজ, ড্রাকুলা-দুর্গে তিন গোয়েন্দা) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৫ (বিড়ালের অপরাধ+রহস্যভেদী তিন গোয়েন্দা+ফেরাউনের কবরে) ৩৬/-
তি. গো. ভ. ৬৬ (পাথরে বন্দী+গোয়েন্দা রোবট+কালো পিশাচ) ৩৮/-
তি. গো. ভ. ৬৭ (ভূতের গাড়ি+হারানো কুকুর+গিরিগুহার আতঙ্ক) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৬৮ (টেরির দানো+বাবলি বাহিনী+শুঁটকি গোয়েন্দা) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৬৯ (পাগলের গুপ্তধন+দুখী মানুষ+মমির আর্তনাদ) ৪২/-
তি. গো. ভ. ৭০ (পার্কে বিপদ+বিপদের গন্ধ+ছবির জাদু) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭১ (পিশাচবাহিনী+রত্নের সন্ধানে+পিশাচের থাবা) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭২ (ভিনদেশী রাজকুমার+সাপের বাসা+রবিনের ডায়েরি) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৭৩ (পৃথিবীর বাইরে+ট্রেইন ডাকাতি+ভুতুড়ে ঘড়ি) ৪৬/-
তি. গো. ভ. ৭৪ (কাওয়াই দ্বীপের মুখোশ+মহাকাশের কিশোর+ব্রাউন্সভিলে গণ্ডগোল) ৫১/-
তি. গো. ভ. ৭৫ (কালো ডাক+সিংহ নিরুদ্দেশ+ফ্যান্টাসিল্যান্ড) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৬ (মৃত্যুর মুখে তিন গোয়েন্দা+পোড়াবাড়ির রহস্য+লিলিপুট-রহস্য) ৪১/-
তি. গো. ভ. ৭৭ (চ্যাম্পিয়ান গোয়েন্দা+ছায়াসঙ্গী+পাতাল ঘরে তিন গোয়েন্দা) ৫০/-
তি. গো. ভ. ৭৮ (চট্টগ্রামে তিন গোয়েন্দা+সিলেটে তিন গোয়েন্দা+মায়াশহর) ৪৩/-
তি. গো. ভ. ৭৯ (লুকানো সোনা+পিশাচের ঘাটি+তুষার মানব)
তি. গো. ভ. ৮০ (মুখোশ পরা মানুষ+অদৃশ্য রশ্মি+গোপন ডায়েরি)
তি. গো. ভ. ৮১ (কালোপর্দার অন্তরালে+ভয়াল শহর+সুমেরুর আতঙ্ক) ৪৭/-
তি. গো. ভ. ৮২ (বনদস্যুর কবলে+গাড়ি চোর+পুতুল-রহস্য) ৪৪/-

যুদ্ধ ঘোষণা

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫

'ওদের খুন করতে যাব আমরা!'

উত্তেজনায় চকচক করছে মুসা আমানের চোখ। হাত দিল হোলস্টারে, এই নিয়ে পঞ্চাশতম বার দেয়া হয়ে গেল। কোমরে ঝোলানো পিস্তলের ওজন সহনীয় হয়ে ওঠেনি এখনও।

'জানি না,' কিশোর বলল। 'ইনডিয়ানরা পুরোপুরি ঘিরে ফেলার আগে খুন করার আদেশ দেবেন কিনা জেনারেল মরিসন, বলতে পারব না।' প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকাল সহকারী গোয়েন্দার দিকে। পুরানো ফ্যাটিগ হ্যাট, হাইকিং বুট, আর সৈনিকের ইউনিফর্মে চমৎকার মানিয়েছে তাকে।

কিশোরও একই পোশাক পরেছে। কেবল হ্যাটটা আলাদা। সে মাথায় দিয়েছে বানি হ্যাট।

রবিনকে লাগছে সিনেমার পর্দা থেকে নেমে আসা সাজানো সৈনিকের মত। ভাড়া করে আনা জাম্পস্যুট পরেছে। মাথায় কালো বেরিট ক্যাপ।

তার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল কিশোর।

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে দু-হাত তুলে মৃদু হাসল রবিন, 'আমার দিকে চেয়ে লাভ নেই। আমি এ সব করিনি, কতবার বলব। যত নষ্টের মূল মুসা আর জিনা। ওরাই গিয়ে নাম লিখিয়েছে।'

'হয়েছে হয়েছে,' রেগে উঠল জিনা, 'মুসারও কোন দোষ নেই! যত দোষ আমার! আমিই লিখিয়েছি। জানতাম না, তোমাদের ওপর এতটুকু অধিকার খাটাতে পারব না আমি! যাচ্ছি! তোমাদের আসা লাগবে না। নাম আমি কাটিয়ে দেব, গালমন্দ শুনতে হলে আমিই শুনব।'

জাম্পস্যুটের বেল্টে দু-হাতের দুই আঙুল ঢুকিয়ে ঝটকা দিয়ে ঘুরল সে।

খপ করে তার হাত চেপে ধরল মুসা, 'আরে দাঁড়াও, দাঁড়াও! যাব না বললাম নাকি…'

'তুমি বলোনি, কিন্তু কিশোর বলছে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমিও যাব না বলিনি। বলছি, যাওয়ার আগে চারজনের একটা গ্রুপ ফটো তুলে রাখা দরকার। বাবা-মায়েরা বাঁধিয়ে রেখে দেবে। ফিরব না যে জানিই তো।'

'দেখো,' আরও রেগে উঠল জিনা, 'হাজার বার করে বলছি এটা সত্যিকার লড়াই নয়। খেলা।'

'হ্যা, খেলা! কমাণ্ডোদের মত পোশাক পরে, কোমরে, হাতে অ
বোঝাই করে নিয়ে যেতে হবে, দেখলে র‍্যামবো ছবির অতিবাহাদুর র‍্যামবো
ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে।' নিজের অজান্তেই কিশোরের হাত চলে গে
কোমরে ঝোলানো পিস্তলের ওপর।

'খামোখা ভয় পাচ্ছ তুমি,' রবিন বলল, 'এটা অতি সাধারণ এয়ার গান
কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের ধাক্কায় ছিটকে বেরোবে একটা পেইন্টবল
ভেতরে রঙ ভরা থাকে। তোমার গায়ে লাগলে বলটা ফেটে গিয়ে খানিক
জায়গায় কেবল রঙ লেগে যাবে। আর কিছু না।'

অভয় দিয়ে লাভ হলো না। কিশোরের গোমড়া মুখে হাসি ফুটল না
'কত জোরে ছোটে বলটা?'

'প্রতি সেকেণ্ডে তিনশো ফুট,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ঘুরে তাকাল কিশোর। মোটা একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সোনালি
রঙের চুল। পরনে ক্যামোফ্লেজ স্যুট। কিশোর তাকাতেই ঠোঁট টিপে হাসল

তার হাসি যেন চোখেই পড়ল না কিশোরের। হিসেবে ব্যস্ত। 'সর্বনাশ
ঘণ্টায় দুশো মাইল স্পীড! এত জোরে গায়ে এসে টুথপেস্ট লাগলেও ব্যথা
পাওয়া যাবে।'

'তা লাগবে না। চামড়া এতটা নরম নয় তোমার, বয়েস কম হয়নি
বলল চুল ক্রু-কাট করা আরেকজন লোক। ইস্তিরি করা পোশাকের ধারে
মতই ধারাল চেহারা। সোনালি-চুল লোকটার বাহুতে হাত রেখে বলল
'রিক্রুটদের চেক করেছ, রোডস?'

কালো পুরু গোঁফওয়ালা তৃতীয় আরেকজন এগিয়ে এসে বলল, 'দূর, কি
আর চেক করবে এদের। নতুন নতুন ভয় একটু পাবেই। এই শোনো, আমা
নাম হেনরি ভেগাবল,' হাত বাড়িয়ে দিল লোকটা। সোনালি-চুলকে দেখিয়ে
বলল, 'ও ফিয়ারড রোডস।' মাথা হেলিয়ে ইঙ্গিতে ক্রু-কাটকে দেখাল, 'আ
ও টোনার নরম্যান।'

নিজের আর তিন গোয়েন্দার পরিচয় দিল জিনা।

টারগেট রেঞ্জে লোকের ভিড় জমছে। সেদিকে চলে গেল তিন আগন্তুক

'চলো, আমরাও যাই,' মুসা বলল। 'এই পিস্তল কি করে চালাতে হ
শিখে নেব ওদের কাছ থেকে।'

কমলা রঙের হাতাকাটা রেফারির-কোট পরা একজন দাঁড়িয়ে আছে
টার্গেট রেঞ্জের সামনের দিকটায়। একহাতে বুলহর্ন, আরেক হাতে একটা
পেইন্ট গান। বুলহর্নে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'হাই, সবাই শুনু
আমি জর্জ অ্যাণ্ডারসন। শুধু এনডি বলে ডাকলেই চলবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে
এই পাহাড়ী এলাকার তিন নম্বর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাগতম। আমাদের এই রঙ-যুদ্ধে
সময়সীমা পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে ঘড়িতে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের টাইমার সে
করে রাখল কিশোর। যা-ই ঘটে ঘটুক, ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর এখান থেকে
কেটে পড়বে সে। জিনার খাতিরেই কেবল থাকবে ওই সময়টুকু। খেলার

ওদের নাম লিখিয়ে ফেলেছে জিনা, কি আর করা।
এনডি বলছেন, 'কঠোর আইন এখানে আমাদের। ফীল্ডে না গিয়ে, কিংব
এখানে ফায়ারিঙ রেঞ্জের মধ্যে অস্ত্র ব্যবহার করা চলবে না। ফীল্ডে যাওয়া
সঙ্গে সঙ্গে গগলস পরতে হবে। এর প্রয়োজন আছে। রঙের বল শরীরের অন
কোথাও ফেটে কোন ক্ষতি করতে না পারলেও চোখের সাংঘাতিক ক্ষতি
করতে পারে, অন্ধ হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। কোনভাবে যদি দেখা যায় কারও
চোখে গগলস নেই, সেদিনকার জন্যে বের করে দেয়া হবে তাকে, কো
ওজর-আপত্তি চলবে না। এখন তোমাদের বন্দুক লোড করে নাও...'
বন্দুকের চেম্বারে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্টিজ ঢোকাতে হয়, বি
করে দশটা পেইন্টবলের একটা টিউব পরাতে হয়, শিখিয়ে দিলেন এনডি
নিজের পিস্তল তুলে রেঞ্জের ভেতরে কয়েকটা টার্গেট নিশানা করে ট্রিগা
টিপতে লাগলেন, আর প্রতিটি গুলি বেরিয়ে যাওয়ার পর বোল্ট টানতে
লাগলেন। ঠুস-ঠুস-ঠুস-ঠুস করে শেষ হয়ে গেল দশটা বল।
দূর! বিরক্ত হয়ে ভাবছে কিশোর, শনিবারের দিনটাই মাঠে মারা গেল
এখানে এসে এই ফালতু সময় নষ্ট করার চেয়ে কম্পিউটারে নতুন প্রোগ্রামট
নিয়ে মাথা ঘামালে, কিংবা তার নতুন কেনা গাড়িটা টেস্ট করতে বেরোলে
কাজে লাগত। যুদ্ধ-বিগ্রহ তিন গোয়েন্দার কাজ নয়। আমরা করব রহস
ভেদ, বনের মধ্যে কে যায় মানুষ মারা শিখতে! আসল যুদ্ধ হলেও একটা অ
থাকত, পুরো ছেলেমানুষী। শিশুদের খেলা।
বন্ধুদের দিকে তাকাল সে। গভীর মনোযোগে এনডির কথা শুনছে মুসা
কাজ দেখছে। জিনাও তাকিয়ে আছে ট্রেনারের দিকে। রবিন তাকাচ্ছে
জনতার দিকে। এই খেলা তারও পছন্দ হচ্ছে না। লাইব্রেরিতে গিয়ে বা
পড়লে কাজে লাগত।
খেলার নিয়ম-কানুন বাতলাচ্ছেন এনডি, 'গগলস আর পেইন্টবল ছাড়া
সবাইকে একটা করে লাল কিংবা হলুদ রুমাল দেয়া হবে। সেটা বাঁধা থাকবে
বাম হাতে, তাতে বোঝা যাবে কে কোন দল—লাল, নাকি হলুদ। গায়ে গুলি
অর্থাৎ রঙ লাগার সঙ্গে সঙ্গে রুমাল নেড়ে বোঝাতে হবে সেটা। তাহলে
তাকে আর গুলি করা হবে না।' ঘিরে দাঁড়ানো খেলোয়াড়দের দিকে তাকিয়ে
মাথা নেড়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি, 'ঠিক আছে?'
হুল্লোড় করে জবাব দিল খেলোয়াড়েরা, ঠিক আছে।
'গুড। আমাদের রেগুলার কম্পিটিশন টিমের কয়েকজন এখানে হাজি
আছে, সবাই আসতে পারেনি। তাই প্রফেশন্যাল টুর্নামেন্ট করতে পারছি না
নতুন খেলোয়াড় নিতে হয়েছে। রেগুলারদের বলছি, নতুনদের সঙ্গে অ
সিরিয়াসলি খেলার দরকার নেই। তাদের টিকে থাকার সুযোগ দেবে
শ্রোতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ব্যয় করলেন এনডি। 'লা
দলে থাকবে আমাদের নিজস্ব রেগুলার টিম এনডিফোর্স থ্রি-র কয়েকজ
খেলোয়াড়, সেভেন ড্রাগনের সাতজনই, আর কয়েকজন নতুন খেলোয়াড়।'
রুমাল দেয়া হলো সবাইকে। জিনা আর তিন গোয়েন্দা পড়ল লা

দলে।

'চমৎকার,' খুশি হলো মুসা, 'ড্রাগনদের দলেই পড়লাম তাহলে।'

'হলুদ দলে থাকছে দুটো রেগুলার টিম স্পেস কমাণ্ডো আর বুশ লেপার্ড দলের কয়েকজন এবং বাকি নতুনেরা।'

বাহুতে হলুদ রুমাল বাঁধতে বাঁধতে রোডস বলল, 'খাঁচার ইঁদুর মারার মতই সহজ হবে, বুঝতে পারছি।'

'সেটাও আবার আধমরা ইঁদুর,' বলল টোনার। 'মজা নেই।'

যেখান থেকে শুরু করতে হেবে হেঁটে সেখানে চলে গেল হলুদেরা। চোখে গগলস পরে নিয়ে লাল দলের অন্য সদস্যদের অনুসরণ করল জিনা ও তিন গোয়েন্দা। খোয়া বিছানো পার্কিং লট পেরিয়ে, বালিময়, ঝোপঝাড়ে ঢাকা, লস অ্যাঞ্জেলেস শহরের দিকে মুখ করা একটা পাহাড়ের কাছে চলে এল ওরা।

নিচের তরাই অঞ্চলের দিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বন্ধুদের বলল মুসা, 'এই শোনো, ওই ঝোপগুলোর মধ্যে, কিংবা তার এ পাশের বনের মধ্যে লুকাব আমরা।'

নাকমুখ কুঁচকে কিশোর বলল, 'পচা খেলা! বড় মানুষেরা যে এ সব শিশুমানুষী করে কি মজা পায়, খোদাই জানে!'

'তোমার আজ হয়েছে কি, কিশোর, বলো তো?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'অমন করছ কেন?'

জবাব দিল না কিশোর। দলের পেছনে হাঁটতে শুরু করল। একবার দেখেই বুঝে গেছে কারা অভিজ্ঞ খেলোয়াড়, কারা নতুন। পেশাদারদের বন্দুকের বাঁট নিখুঁত করে হাতে খোদাই করা, উন্নত যন্ত্রপাতি, বেশি পেইন্টবল রাখার উপযোগী করে তৈরি ফিডিং টিউব, নলটাও এই জাতের সাধারণ বন্দুকের চেয়ে লম্বা। একজন মুখে লাগিয়েছে হকি খেলার গোলকিপারের মত মুখোশ, সেটাতে মুখের জায়গায় একটা বিকট মুখ আঁকা। দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর হাসি হাসছে যেন। কালো বেরিট ক্যাপ পরা, অতিউন্নত বন্দুকধারী লোকটাকে লাগছে বেভারলি হিলের কুখ্যাত খুনী ম্যাড মারডারারের মত।

হেনরি ভেগাবল আর এনডিফোর্সের আরেকজন খেলোয়াড় ম্যাপ দেখে আক্রমণের একটা ছক তৈরি করছে।

'সেভেন ড্রাগন আমাদের ফ্ল্যাগ পাহারা দেবে,' হেনরি বলল। 'এনডিফোর্স তৈরি থাকবে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে। নতুনেরা একা কিংবা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ছড়িয়ে পড়বে পাহাড়ের নিচে।'

পেশাদার অন্য খেলোয়াড়দের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল, কি ভাবে আক্রমণ চালাবে লাল দল। সাইরেন বাজিয়ে খেলা শুরুর ঘোষণা দেয়া হলো। জিনা, তিন গোয়েন্দা, আর লাল দলের আরও তিনজন খেলোয়াড় দৌড়ে নামতে লাগল ঢালের নিচের বনের দিকে। খুঁটি আর গাছের গায়ে দড়ি বেঁধে দিয়ে খেলার মাঠের সীমানা নির্দেশ করা

আছে।

'ছড়িয়ে পড়া যাক,' বলল একজন।

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল মুখোশ পরা লোকটা।

সীমানার বাঁ প্রান্তে চলে এল গোয়েন্দারা। ঝোপ আর গাছের আড়ালে পজিশন নিল এমন ভাবে যাতে একে অন্যকে নজরে রাখতে পারে।

'ঘোড়ার ডিমের খেলা···' কথাটা শেষ না করেই 'আঁউ' করে উঠল কিশোর। তার পিঠের ওপর ফেটেছে রঙের বল, গোল হয়ে অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে গেছে রঙ।

হেসে উঠল জিনা, 'বসার আগেই তো মরলে! আর যাই করো, সৈনিক হতে যেয়ো না কখনও।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তার জন্যে এখনকার মত খেলা খতম। আরামসে উঠে চলে যেতে পারে এখন। সুইচ টিপে ঘড়ির অ্যালার্মটা অফ করে দিল, সময়-শেষ সঙ্কেতের আর কোন প্রয়োজন নেই। হাত থেকে রুমাল খুলে নিয়ে মাথার ওপর তুলে নাড়তে লাগল।

'তোমরা মরতে থাকো,' বন্ধুদের বলল সে, 'আমি গেলাম।'

কিশোরের পেছনের ঝোপের দিকে নিশানা করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল রবিন, ওদিক থেকেই গুলি এসেছে সন্দেহ করে।

ছুটে এল একঝাঁক বল। কয়েক সেকেণ্ডও টিকল না রবিন। গুলি খেলো।

'গেলে তো তুমিও!' বলে উঠল জিনা। 'কি একেকজন খেলোয়াড়ই না নিয়ে এলাম, আহা!' বলে ঝোপ লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে গেল সে। পিস্তল জ্যাম হয়ে গেল তার, গুলি বেরোল না। একটা গাছের আড়ালে মাথা নিচু করে বসে পড়ে বার বার বোল্ট টানতে লাগল সে। কিন্তু কিছুতেই কাজ করছে না মেকানিজম। তার চারপাশে কমলা রঙের বল বিস্ফোরিত হচ্ছে একের পর এক।

সাহায্যের জন্যে মুসার দিকে তাকাতে গিয়ে দেখল, নেই সহকারী গোয়েন্দা। চিৎকার করে ডাকল জিনা, 'মুসা, কোথায় তুমি? আমার গুলি বেরোচ্ছে না!'

উদ্যত পিস্তল হাতে তখন গাছের আড়ালে আড়ালে ছুটছে মুসা, শত্রুর সন্ধানে। কোথা থেকে গুলি আসছে বের করতে চায়। দূরে শোনা যাচ্ছে বল ছোঁড়ার ঠুস ঠুস আওয়াজ। কিন্তু নিজেদের লাইন থেকে কোন গুলির আওয়াজ নেই। ব্যাপারটা অবাক করল তাকে।

হাত বাড়িয়ে কয়েক ফুট দূরের ঝোপের গায়ে অকেজো পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে শত্রুর নিশানাকে ধোঁকা দিতে চাইল জিনা। কিন্তু ধোঁকায় পড়ল না হলুদ দলের খেলোয়াড়। জিনার হাঁটুতে বল ফেটে লেপ্টে গেল কমলা রঙ। আরেকটা লাগল কাঁধে।

'হয়েছে, হয়েছে!' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আর মারার দরকার নেই, আমি মরে গেছি!'

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা।

ঠুস করে একটা বল এসে ফাটল বুকে। 'আরি, মারো কেন এখনও...' রেগে উঠতে গিয়ে মনে পড়ল, চেঁচালে হবে না, রুমাল নাড়তে হবে।

রুমাল দেখিয়ে, হাঁটু ডলতে ডলতে দর্শকদের স্টেজ এরিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেল সে।

জিনার চিৎকার কানে যেতেই ঘুরে দৌড় দিয়েছে মুসা। কিন্তু আসতে দেরি করে ফেলেছে। দেখল, জিনাও শেষ। একলা কেবল সে-ই বেঁচে আছে। এক চিলতে খোলা জায়গার ধারে পড়ে থাকা একটা মরা গাছের আড়ালে ডাইভ দিয়ে পড়ল মুসা। পাতার স্তূপ হয়ে আছে গাছটা ঘেঁষে, বান মাছের মত শরীর মুচড়ে মুচড়ে তার মধ্যে ডুবে যেতে লাগল সে। শত্রু কোথায় লুকিয়েছে আন্দাজ করার চেষ্টা করল।

কানে এল পদশব্দ। দৌড়ে চলে যাচ্ছে। তারপর নীরবতা। ব্যাপার কি? লাল দলের কোন সাড়াশব্দ নেই কেন? উপত্যকা ছেড়ে চলে গেছে নাকি ওরা? সে-ও উঠে চলে যাবে কিনা ভাবছে। দূর থেকে আসছে পেইন্টবল ছোঁড়ার ঠুস-ঠুস। অবাক হয়ে ভাবছে, কিশোর, রবিন আর জিনাকে গুলি করার শব্দ কানে এল না কেন তার? দূর থেকে শোনা যাচ্ছে, অথচ অত কাছে থেকে না শুনতে পাওয়ার কথা তো নয়!

গাছের নিচে একজায়গায় খুব সরু একটা ফাঁক দেখতে পেল সে। পাতার স্তূপের আরও নিচে নেমে এল, যাতে ফাঁকটা দিয়ে ওপাশে কি আছে দেখা সম্ভব হয়।

দুই জোড়া পা এগিয়ে আসছে তার দিকে।

পাথর হয়ে গেল সে।

গাছের তিন গজের মধ্যে এসে থেমে গেল পা-গুলো। একজোড়া পায়ের পরনে স্ট্যাণ্ডার্ড আর্মি ক্যামোফ্লেজ—সবুজের ওপর খয়েরী রঙের ছোপ ছোপ, সেনাবাহিনীর লোকেরা সাধারণত যা পরে থাকে। অন্যজোড়ার পরনে ছাই রঙের ওপর ধূসর আর ঘন বাদামী ছোপ।

'দিলাম তাড়াতাড়ি শেষ করে,' হেসে নিচু গলায় বলল ধূসর ছোপ। 'লাইন খতম। বাকি রইল, ফ্ল্যাগ।' হেসে উঠল সে। 'সামনের শুক্রবারেও এ ভাবেই খতম করে দেব।'

'এত হালকা ভাবে নিয়ো না ব্যাপারটাকে,' সাবধান করল খয়েরী। 'সিরিয়াস হও। ভালমত প্র্যাকটিস করো। ডাকাতি যেদিন করতে যাব, সেদিন পেইন্টগান নয়, আসল বন্দুক নিয়ে সেফ পাহারা দেবে গার্ডেরা, আর তাতে থাকবে দশ লক্ষ ডলার।'

দুই

সর্বনাশ, ডাকাতির পরিকল্পনা করছে লোকগুলো! ধরবে নাকি ব্যাটাদের! না, মন বলল—এই কাজও করতে যেয়ো না! বিপদে পড়বে! দু-জন বয়স্ক লোকের সঙ্গে একা পারবে না তুমি।

লোকগুলোর পরিচয় জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেল মুসা। নিচু গলায় কথা বলছে ওরা, কণ্ঠস্বর চেনারও উপায় নেই। ভাবল—চুপ করে পড়ে থাকি, ওরা সরলেই উঠে পিছু নেব।

পাতার নিচে ঢোকায় শরীর চুলকাতে আরম্ভ করেছে। হাঁচি আসতে চাইছে। অনেক কষ্টে দমন করছে ওগুলো। অবশেষে যখন মনে হলো, বেরোনো নিরাপদ; আস্তে মাথা তুলে দেখল লোকগুলো অদৃশ্য হয়েছে।

ধরার জন্যে দৌড় দিল সে। খোলা জায়গাটার দিকে গেছে ওরা। তার ওপাশের বনে ঢুকে পড়বে।

একদৌড়ে খোলা জায়গা পার হয়ে বনে ঢোকার আগে পিস্তল বের করে নিল মুসা। গুলি করে পিঠে চিহ্ন দিয়ে রাখবে। ঘামে ভেজা হাতে এখন অনেক ভারি লাগছে ওটা।

মিনিট পাঁচেক খোঁজাখুঁজি করে হাল ছেড়ে দিল। হারিয়ে ফেলেছে লোকগুলোকে। ঘন ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে এল পাহাড়ের ধারে। তাদের টিমের ফ্ল্যাগ স্টেশনটা কোনদিকে অনুমান করার চেষ্টা করল। উপত্যকায় নেমে বুলডোজার দিয়ে সমান করা চওড়া, সুন্দর একটা রাস্তায় উঠল।

বনের থমথমে নীরবতা এখন অস্বস্তিকর লাগছে। গেল কোথায় সব? হঠাৎ কানে এল পেইন্টবল ছোঁড়ার ঠুস-ঠুস আওয়াজ। সামনে বাঁ দিক থেকে। যথেচ্ছ রঙ ছোঁড়াছুঁড়ি করছে মানুষগুলো।

রাস্তা ধরে কয়েক গজ এগিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৌড়ে উঠতে শুরু করল সে। চূড়ায় উঠে চোখে পড়ল ফ্ল্যাগ স্টেশনটা। পতাকার চারপাশে এমন করে ভিড় করে আছে লাল দলের সদস্যরা, মনে হচ্ছে পিঁপড়েরা গুড় পাহারা দিচ্ছে। আত্মগোপনের জায়গা তেমন নেই ওখানটায়, যেটুকু পেয়েছে তাতেই শরীর আড়াল করে গুলি চালাচ্ছে শব্দ লক্ষ্য করে।

গুলি করতে করতে এগিয়ে আসছে হলুদেরা। লালের প্রায় দ্বিগুণ লোক হবে, চোখে পড়ছে না, ওদের গুলির বহর দেখে আন্দাজ করা যায়। তারমানে নিজেদের হলুদ পতাকা বাঁচানোর জন্যে যোদ্ধা তেমন রেখে আসেনি ওরা।

চট করে ভাবনাটা খেলে গেল মুসার মাথায়। হলুদ পতাকা পাহারায় নেই কেউ, তাহলে আমি গিয়ে নিয়ে আসছি না কেন?

ফুটবল খেলতে গিয়ে এমন সব কাণ্ড করে বসে সে, ঝুঁকি নিয়ে ফেলে,

খেপামিই বলা চলে। তাহলে এখানে নিতে দোষ কি? সে কিছু করতে না পারলে নিশ্চিত জয় হবে হলুদ দলের।

নিঃশব্দে নেমে এল আবার চওড়া রাস্তাটায়। ছুটতে শুরু করল। পথের ওপাশ থেকে দৌড়ে বেরোল আরেকজন। চমকে দিল মুসাকে। সবুজ হকি মাস্ক পরা সেই লোকটা। কাঁধে জড়ানো বড় এক টুকরো হলুদ কাপড়—হলুদ টিমের ফ্ল্যাগ।

খাইছে! মনে মনে বলল মুসা। আমার আগেই নিয়ে এল! গেল কখন?

পাহাড় ডিঙিয়ে অন্য পাশে নেমে ফ্ল্যাগ স্টেশনের দিকে ক্রল করে এগোতে শুরু করল সবুজ মুখোশ। অর্ধেক পথ যাওয়ার পরই হলুদ যোদ্ধাদের চোখে পড়ে গেল।

'হায়-হায়, নিয়ে গেল তো!' চিৎকার করে উঠল একজন হলুদ।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গাছের আড়ালে ঘাপটি মেরে থাকা তিনজন হলুদ। গুলি করতে লাগল সবুজ মুখোশকে।

সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। গুলি করতে করতে পাহাড় থেকে দৌড়ে নেমে এল সে।

ভীষণ চমকে গেল তিন হলুদ। চিৎকার করে উঠল বিস্ময়ে। কিন্তু কিছু করার নেই। মারা গেছে।

ঝট করে হাঁটু গেড়ে বসে পিস্তলে আবার পেইন্টবল ভরে নিল মুসা। ছুটে আসছে আরও কয়েকজন হলুদ, তাদেরকে সই করে গুলি করল।

এদিক থেকে আক্রান্ত হবে কল্পনাও করেনি হলুদেরা। ডাইভ দিয়ে গিয়ে এদিক ওদিক লুকাল ওরা, গুলি করতে লাগল মুসাকে। পাল্টা আঘাত হানার সুযোগ পেয়ে গেল লালেরা, যারা ফ্ল্যাগ রক্ষা করছিল।

এই সুযোগে মাথা নুইয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে বল-বৃষ্টি এড়িয়ে লাল দলের স্টেশনে ফ্ল্যাগ নিয়ে গেল সবুজ মুখোশ। হর্ন তুলে হাঁক দিলেন রেফারি। মার্চ করে স্টেশনে ফিরে এল লাল দল, ওরা জিতেছে।

হাত মেলাতে মেলাতে অস্থির হয়ে গেল মুসা। তার পিঠ চাপড়ে দিতে লাগল দলের লোকেরা। হারতে হারতে এ ভাবে জিতে যাবে ওরা ভাবতে পারেনি। মুখ থেকে মুখোশ খুলে মুসাকে তাজ্জব করে দিল সবুজ মুখোশ। আরি, এ তো একটা মেয়ে! সুন্দর চেহারা। কাঁধে নেমেছে কালো চুল।

সারি দেয়া ওয়াশ বেসিনে দাঁড়িয়ে রঙ ধুচ্ছে জিনা আর তিন গোয়েন্দা। হাত নেড়ে মুসাকে ডাকল জিনা, 'মুসা, আমরা এখানে।'

'নাও, বলের আঘাতের ব্যথা ভোলার ওষুধ,' একটা করে লাল টোকেন বন্ধুদের হাতে তুলে দিল মুসা। লাল দলের বিজয়ের স্মারক-চিহ্ন। তারপর 'কথা আছে,' বলে ওদেরকে সরিয়ে আনল নিরালা জায়গায়।

'শুনলে মাথা ঘুরে যাবে তোমাদের,' বনের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কি শুনেছে জানাল সে।

'দশ লক্ষ ডলার!' মাথা না ঘুরলেও ভুরু কুঁচকে গেছে রবিনের।

কিশোর বলল, 'একজন লোকের ইউনিফর্ম ছিল অস্বাভাবিক, এটা একটা

সূত্র। কোন দেশের ইউনিফর্ম ওটা জানো?' সবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল সে।

'না, জানি না,' হাত নেড়ে বলল মুসা। 'বলে দাও।'

'রোডেশিয়ান বুশ ক্যামি,' সংক্ষেপে ক্যামোফ্লেজকে ক্যামি বলে অনেকে, জানে কিশোর। 'সত্তরের দশকে আফ্রিকার রোডেশিয়ান গেরিলারা ঝোপঝাড়ে আর জঙ্গলে যুদ্ধ করার সময় এই রঙের ইউনিফর্ম পরত। তোমরা যখন শিশুতোষ খেলায় ব্যস্ত, আমি তখন জর্জ অ্যাণ্ডারসনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। এনডি বললেন, রোদে পোড়া শুকনো ঝোপঝাড়ের মধ্যে এই রঙ এমনভাবে মিশে যায়, খুঁজে বের করা মুশকিল। গরম কালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার ঝোপের রঙও অমন হয়ে যায়। তিনিও দেখো একই ইউনিফর্ম পরেছেন।'

ঝট করে তিনজোড়া চোখ ঘুরে গেল পেইন্টবল পার্কের পরিচালকের দিকে। কমলা রঙের কোটের নিচে ধূসর-বাদামী ছোপওয়ালা পোশাক তাঁর পরনে।

'তো এই সূত্র দিয়ে কি করব আমরা?' হালকা গলায় জিজ্ঞেস করল মুসা, 'রোডেশিয়ায় চলে যাব?'

'এখন আর রোডেশিয়া নেই, জিমবাবুই হয়ে গেছে দেশটার নাম। না, ওখানে যাব না আমরা। এখানেই সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। শিশুতোষ পেইন্টবল খেলাটা আর শিশুতোষ রইল না। তিন গোয়েন্দার একটা কেসে পরিণত হয়েছে।'

'এনডি নিশ্চয় ডাকাতির পরিকল্পনা করেননি। তিনি ছাড়া আর কে রোডেশিয়ান ক্যামি পরেছে দেখা দরকার,' রবিন বলল।

রিফ্রেশমেন্ট টেবিলের সামনে গিয়ে লাইন দিয়ে সোডা আর হালকা খাবার কিনছে খেলোয়াড়রা। চারজনের পরনে ওই পোশাক দেখা গেল। দু-জনের সঙ্গে আগেই পরিচয় হয়েছে তিন গোয়েন্দার। একজন হলুদ দলের টোনার নরম্যান, আরেকজন লাল দলের হেনরি ভেগাবল। অন্য দু-জনও পেশাদার খেলোয়াড়, দু-জনেই হলুদ দলের।

মাত্র এক গেম খেলা হয়েছে, আরও হবে। জড় হচ্ছে খেলোয়াড়েরা। তিন গোয়েন্দার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে ভেগাবল। পুরু গোঁফে আঙুল বুলিয়ে বলল, 'এবার আক্রমণের পালা আমাদের। শত্রু এলাকায় ঢুকে হামলা চালাতে চাও?'

'অসুবিধে কি?' কিশোর বলল, 'সত্যি সত্যি তো আর মারা যাচ্ছি না। খানিকটা রঙ মাখাতে হবে শুধু গায়ে।'

রবিন বলল, 'কিশোর, দেখো, ভালই খেলব আমরা।'

'আত্মবিশ্বাস বাড়ছে, তাই না?' মুসাও রবিনের সঙ্গে একমত। 'সহজ খেলা।'

'রঙের বদলে পিস্তল থেকে বুলেট বেরোলেই আর সহজ থাকবে না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'ডাকাতরা যখন আছে আশেপাশে, কি করবে

কে জানে!'

বাঁশি বাজল। লাল দলের যোদ্ধারা বনে ঢুকল।। আবার সবুজ মুখোশ পরেছে মেয়েটা। হেসে মুসার সঙ্গে হাত মেলাতে মেলাতে বলল, 'আমি মারশা টুইটার। আমাকে কভার দেয়ার জন্যে ধন্যবাদ। তুমি পেছনে না থাকলে জিততে পারতাম না, ঠিক আমাকে মেরে ফেলত ওরা।'

শুরু হলো খেলা। বনের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলল। প্রথমবারের মত সহজে পরাজিত হলো না এবারে কেউ। তিন গোয়েন্দা আর জিনার মধ্যে কেবল কিশোর মারা গেল। কোন দলই অন্য দলের ফ্ল্যাগের কাছে যেতে পারল না। পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর বাঁশি বাজালেন রেফারি। সেকেণ্ড গেমে খেলা ড্র।

'ভাল খেললাম কোথায়?' রবিনের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'প্রথমবার এক গুলি খেয়েছিলাম, এবার খেয়েছি দুটো। ওই সোনালি-চুলো রোডস আর তার ক্রু-কাট দোস্ত টোনার, একসঙ্গে গুলি করে মেরেছে আমাকে।' পাঁজরে ডলা দিয়ে গুঙিয়ে উঠল সে।

'বাকি দু-জন রোডেশিয়ান ক্যামির নাম জেনে এসেছি,' রবিন বলল। 'কলসের মত পেটওয়ালা লম্বা লোকটার নাম নীল ওডিমার। স্পেস কমাণ্ডোর ক্যাপ্টেন। লালচুলো, বেঁটে, গাঁট্টাগোট্টা লোকটার নাম জন রাসটি। দলের সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড।'

'বাহ্, ভালই এগোচ্ছি দেখা যায়। পরের খেলায় আর গোলাগুলির মধ্যে যাওয়ার দরকার নেই। শক্তি খরচ করব না আমরা, তদন্ত করতে দরকার হবে।'

থার্ড গেমে তিন গোয়েন্দা আর জিনা ফ্ল্যাগ পাহারায় রয়ে গেল। লাল দলের অন্য খেলোয়াড়রা চলে গেল লড়াই করতে।

কিছুক্ষণ পর বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরোল কয়েকজন হলুদ, কিশোরকে গুলি করে মেরে ফ্ল্যাগটা কেড়ে নিয়ে গেল ওদের কাছ থেকে, জিতে গেল।

'ব্যাটা ক্রু-কাট টোনার, আবার গুলি করল আমাকে!' মুখ কালো করে বলল কিশোর। 'মেরে আবার হাসে কি রকম করে দেখলে?'

'মন খারাপ কোরো না, কিশোর,' সান্ত্বনা দিল মারশা। 'ওরা প্রফেশন্যাল। ওদের সঙ্গে না পারলে লজ্জার কিছু নেই।'

'এই পচা খেলায় হেরে কে লজ্জা পায়? ব্যাটার হাসিটাই ভাল্লাগছে না!'

তিন গেমের মধ্যে এক গেম এক গেম করে জিতেছে দুটো দলই, এক গেমে ড্র করেছে। ফোর্থ এবং শেষ গেম শুরু হলো। এবার যে দল জিতবে, তারাই বিজয়ী হবে। তিন গোয়েন্দা আর জিনাকে বনে গিয়ে আক্রমণ করতে রাজি করিয়ে ফেলল মারশা, কিন্তু কিশোর গোঁ ধরে রইল, যাবে না। 'আমি ফ্ল্যাগই পাহারা দিই,' বলল সে।

মাঠের মাঝামাঝি যেতেই হলুদ দলের গুপ্ত হামলার শিকার হলো লাল দল। কোনমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফ্ল্যাগের কাছে দৌড়ে ফিরে এল মুসা ও মারশা।

হলুদদের কয়েকজনকে গুলি করে মারল। মারা পড়ল মারশা। ছুটন্ত পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে তাড়াতাড়ি লুকিয়ে পড়ল মুসা।

বেরিয়ে এল ক্রু-কাট টোনার, কাঁধে জড়ানো লাল ফ্ল্যাগ।

চোখের পলকে তাকে গুলি করে মারল মুসা। টোনারের বুকের দিকে তাকিয়ে ধক করে উঠল বুক। লাল রঙটাকে লাগছে একেবারে রক্তের মত।

নিরাশ ভঙ্গিতে ফ্ল্যাগটা মুসার হাতে দিয়ে দিল টোনার।

খেলার নিয়ম অনুসারে কাঁধে কাপড়টা জড়িয়ে এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজেদের ঘাঁটিতে ফিরে যেতে হবে মুসাকে। ছুটল সেদিকে। পেছনে দুপদাপ শব্দ কানে আসছে। ঝোপঝাড় ভেঙে যেন ছুটে আসছে হলুদ দলের সমস্ত যোদ্ধা। ফিরেও তাকাল না মুসা। একমাত্র চিন্তা ঘাঁটিতে ফেরা।

গুলি থেকে বাঁচার জন্যে মাথা নিচু করে এঁকেবেঁকে ছুটেছে সে। নিরাপদেই পৌঁছে গেল স্টেশনে, রোপ হোল্ডারে ফেলার জন্যে ছুঁড়ে দিল কাপড়টা। একটানে পিস্তল খুলে নিয়ে ডাইভ দিয়ে পড়ল লুকানোর জন্যে।

বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরোল হলুদেরা। কিন্তু ওরা কাছাকাছি আসার আগেই বাঁশি বেজে উঠল। খেলা শেষ। লাল ফ্ল্যাগটা ওটার জায়গাতেই রয়েছে, হলুদদের ফ্ল্যাগ তাদের ঘাঁটিতে; সুতরাং আবার ড্র হলো খেলা।

খেলার ফলাফল যা-ই হোক, কিশোর এখন মহাখুশি। রঙে মাখামাখি হয়ে আছে। কিন্তু দুঃখ নেই তাতে, দাঁত বের করে হাসছে। 'এবারও মেরে ফেলেছে আমাকে,' বন্ধুদের জানাল সে। 'তবে এবার আর অত সহজে পারেনি। মরার আগে মেরেও নিয়েছি একজনকে।' সোনালি-চুল লোকটাকে দেখাল সে। বুকে লেগে থাকা রঙ ধুয়ে তুলছে। কিশোরের বল ফেটেছে ওখানে লেগে।

রোডেশিয়ান ক্যামি পরা ক্রু-কাট সঙ্গীর কাছে এগিয়ে গেল সোনালি-চুল। তাকে নিয়ে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দার কাছে। প্রশংসা করে বলল, 'নতুন হিসেবে দারুণ খেলেছ তোমরা। সত্যিই ভাল।'

বাঁকা চোখে কিশোরের দিকে তাকিয়ে পিত্তি জ্বালানো হাসি হাসল টোনার, বলল, 'আবার দেখা হবে আমাদের, কি বলো?'

'হবেই,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশোর। টোনার সন্দেহভাজনদের একজন, নিজের হাতে তাকে মারতে পারলে খুশি হবে সে।

টি-শার্ট কেনার জন্যে সাপ্লাই শপে এসে ভিড় করল নতুনেরা। মুসা, রবিন আর জিনা কিনল প্লেন ক্যামোফ্লেজ শার্ট। কিশোর যেটা কিনল সেটার বুকে লেখা ইংরেজি কথাটার মানে করলে দাঁড়ায়: মৃত্যুর আগে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনের চূড়ান্ত আনন্দ ভোগ করে নিতে চাই!

নীল ওডিমারকে হেনরি ভেগাবলের দিকে এগোতে দেখা গেল। বলল, 'ব্যাপার কি হে তোমার, আজকাল শনিবারেও খেলার সময় পাও? গ্যারেজ খোলার পর থেকেই এই অবস্থা দেখছি।'

'ব্যবসা ভাল না,' বিষণ্ন স্বরে জবাব দিল ভেগাবল। 'আমার শালাকে

দোকানে বসিয়ে রেখে এসেছি। দেখাশোনা করবে। একলা থাকতে নাকি ভাল লাগে তার।'

পার্কিং লটের দিকে হাত তুলে কালচে সবুজ রঙের একটা মার্সিডিজ গাড়ি দেখাল ওডিমার। 'ইঞ্জিনটা ট্রাবল দিচ্ছে। নিয়ে যাব ভাবছি। কাল রেখে আসব তোমার গ্যারেজে?'

'এসো। চেনো জায়গাটা? ভেঞ্চুরা বুলভারে, হেভেনহার্স্টের কাছে।'

মাথা ঝাঁকাল ওডিমার।

কান খাড়া করে শুনছিল কিশোর। ঘুরে তাকাল সহকারীদের দিকে। নিচু স্বরে বলল, 'যত শীঘ্রি সম্ভব ওই গ্যারেজটাতে যাওয়া দরকার। কিন্তু আরও জরুরী কাজ আছে কালকে, এখানে, ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-তে।'

তিন

পরদিন ফোর্ড এসকর্ট গাড়িটা ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-র পার্কিং লটে ঢোকাল কিশোর। আগের দিনের মতই ভরে আছে জায়গাটা। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে আদর করে হাত বোলাল স্টিয়ারিঙে। সত্যি, নিজের গাড়ি থাকাটা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

গাড়ির ভাবনা বাদ দিয়ে তদন্তের কথা ভাবল সে। দুই সহকারীকে জিজ্ঞেস করল, 'জর্জ অ্যাণ্ডারসনই ডাকাতদের শিকার নন তো? টাকা-পয়সা ভালই আছে মনে হচ্ছে।'

'কিন্তু থাকার তো কথা না,' বলল রবিন। 'এতগুলো বন্দুক, জায়গার জন্যে নিজের টাকা, ফীল্ড সাজানো, সব মিলিয়ে অনেক খরচ।' প্লাইউডের তৈরি ছাউনিগুলোর দিকে তাকাল সে, ওটা কমাণ্ড সেন্টার—যেখান থেকে পেইন্টবল লড়াইয়ের সব কিছু পরিচালনা করা হয়। 'এত খরচের পরও আরও দশ লাখ টাকা আছে তাঁর কাছে, মনে হয় না।'

'চলো দেখি কি জানা যায়?' গাড়ি থেকে বেরিয়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করল মুসা।

আঁতকে উঠল কিশোর, 'আহাহা, করো কি, আস্তে লাগাও না!'

দাঁত বের করে হাসল মুসা, 'নতুন নতুন অমন আদর সবাই করে। কয়েকদিন চালাও, তুমি এর চেয়ে জোরে দরজা লাগাবে। কি রবিন, ঠিক বলিনি?'

'সবাই এক রকম নয়,' রবিনও হাসল। 'কিপটে মানুষ কি আর থাকে না দুনিয়ায়?'

'এটা কিপটেমি নয়, যত্ন,' গম্ভীরমুখে গাড়ি থেকে নেমে এত আস্তে তার পাশের দরজাটা লাগাল কিশোর, একটু শব্দও হলো না।

কমাণ্ড পোস্টের দিকে এগোল তিনজনে। একটা টেবিলে বসে ক্লিপবোর্ডে

কিছু লিখছেন এনডি। মুখ তুলে তাকিয়ে হাসলেন। 'ও, তোমরা, আবার এসেছ। কিন্তু দেরি করে ফেলেছ তো। আর জায়গা নেই। কোন টিমে ঢোকাতে পারব না।'

'অসুবিধে নেই,' জবাব দিল কিশোর। 'আমরা এসেছি কয়েকটা বন্দুক ভাড়া নিয়ে প্র্যাকটিস করতে। পেইন্টবল সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ছে।'

'তারমানে ধরে ফেলেছে নেশায়,' হেসে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম বাড়িয়ে দিলেন এনডি। 'জানি কি হয়। একাশি সালের দিকে ধরেছিল আমাকে। সবে তখন চালু হতে আরম্ভ করেছে এই খেলাটা। রঙ-পিস্তল নিয়ে বনের মধ্যে ছুটোছুটি করে বেরিয়েছি, কত মজাই না পেয়েছি!'

স্মৃতিচারণ করতে করতে হাসলেন তিনি। 'আমি তখন জমি বেচাকেনার দালালি করতাম। তারপর ঠিক করলাম পেইন্টবল খেলার ব্যবসা করব। মাথায় এল ব্যাটলগ্রাউণ্ড ওয়ানের চিন্তা।'

'এটা তো থ্রী,' রবিন বলল। 'তারমানে তিনটে গ্রাউণ্ড আছে আপনার?'

মাথা ঝাঁকালেন এনডি। 'তবে খেলা শুরু করেছি এটা দিয়েই। এটা প্রথমে রেডি করেছি। জায়গাটা খুব প্রিয় আমার। বনটন আছে প্রচুর। এটা ছাড়াও আরও দুটো ছোট ছোট ফীল্ড আছে। ওগুলোতে নানা রকম স্পেশাল ব্যবস্থা করেছি—দুর্গ, ট্রেঞ্চ, ছাউনি, এমনকি একটা ছোট নকল শহরও তৈরি করেছি।'

কথা বলতে বলতে ফর্মগুলো পূরণ করে দিল তিন গোয়েন্দা।

সেগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এনডি। 'আমার সঙ্গে বকবক করতে ভাল লাগবে না তোমাদের। সময় নষ্ট। এসো বন্দুক আর গুলি নিয়ে যাও।' তালা দেয়া একটা ছাউনির কাছে ছেলেদের নিয়ে এলেন তিনি। ভেতরে ঢুকে তিনজনকে তিনটে পিস্তল দিলেন, আর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র। 'রুমালগুলো রাখো। এগুলো টিকেট। যখনই কিছুর প্রয়োজন হবে, আমাকে দেখালেই জিনিস বের করে দেব।'

'ব্যবসা মনে হয় ভালই হচ্ছে আপনার,' কিশোর বলল।

'সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে অন্য সময় অতটা ভিড় থাকে না। গরমকালে দিন যখন বড় হয়ে যায়, তখন অফিস ছুটির পরও প্র্যাকটিস করতে আসে লোকে।'

গোয়েন্দাদের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন এনডি। 'প্র্যাকটিস করোগে আপাতত। দেখি আরও মজার কিছু পাওয়া যায় কিনা। সম্ভাবনা আছে। পেলে, আসব।'

ফায়ারিং লাইনে এসে দাঁড়াল ছেলেরা। চোখে গগলস পরে পিস্তলে বলের টিউব ভরল। কিশোর বলল, 'তাহলে মজার কিছুও ভেবে রেখেছেন তিনি আমাদের জন্যে! কী? দশ লক্ষ ডলারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো?'

'কি জানি,' হাত ওল্টাল মুসা। 'আসুন তো আগে, বোঝা যাবে।' প্লাইউড কেটে তৈরি একটা মানুষের ডামি বানানো হয়েছে, টার্গেট, ওটার বুকে গুলি করল সে।

তারপর গুলি করল রবিন। লাগল ডামিটার হাতে। 'আমাদের আগ্রহ বাড়াতে চেয়েছেন হয়তো। ব্যবসায়ী বুদ্ধি।'

'দেখা যাক অপেক্ষা করে, থলে থেকে কোন বেড়াল বেরোয়।' টার্গেট সই করে গুলি করল কিশোর, পুরোপুরি মিস করল। 'ধূর!'

একের পর এক গুলি করে চলল ওরা। সঙ্গে করে আনা সব বল ফুরিয়ে গেল। আবার গিয়ে নতুন টিউব কিনে আনল কিশোর। ফায়ারিং লাইনে ঢোকার মুখে 'আরও মজার কিছু' নিয়ে হাজির হলেন এনডি।

পাশে এসে দাঁড়াল আরেকজন লোক, সোনালি-চুল সেই লোকটা, ফিয়ারড রোডস।

হেসে ছেলেদের বললেন এনডি, 'কালকের শোধ নেবে নাকি? ওকে তো চেনই, বুশ লেপার্ডের ক্যাপ্টেন। তার তিনজন লোক নিয়ে এসেছে প্র্যাকটিস করার জন্যে। জ্যান্ত নিশানা চায়। লড়বে? ডামিকে গুলি করার চেয়ে অনেক বেশি মজা পাবে।'

গায়ের পরিষ্কার পোলো শার্টটার দিকে তাকাল রবিন। বলল, 'তাহলে এই পোশাকে হবে না। ক্যামোফ্লেজ স্যুট ভাড়া করতে হবে।'

'চারজন পেশাদারের বিরুদ্ধে আমরা তিনজন নবিস,' কিশোর বলল, 'ফুঁ দিলেই তো উড়ে যাব।'

'স্পেশাল ফীল্ডে খেলবে,' এনডি বললেন, 'অত সহজে মারতে পারবে না তোমাদের। লুকানোর প্রচুর জায়গা পাবে।'

'মনে যাতে জোর পাও, তার জন্যে পিস্তলের বদলে এই জিনিস দেয়া হবে,' হাতের বন্দুকটা তুলে দেখাল রোডস। কালো রঙের অস্ত্রটা দেখতে অনেকটা রাইফেলের মত। গোয়েন্দাদের হাতের পিস্তলের চেয়ে অনেক বড়।

মুসা লক্ষ করল, নলের নিচে বোল্ট কিংবা রিলোডিং পাম্প নেই জিনিসটার। 'পেইন্টবল মেশিনগান নাকি?'

মাথা ঝাঁকালেন এনডি। 'ফীল্ডে এগুলো ব্যবহার করতে দেয়ার জন্যে সমিতির সঙ্গে অনেক তর্কাতর্কি করেছি আমি। প্র্যাকটিসের জন্যে বাইরে ভাড়া দিতেও রাজি। পরীক্ষামূলক ভাবে সে-জন্যেই কয়েকটা কিনলাম।'

'আমার কাছে তো দারুণ লাগছে,' বলে ফায়ারিং লাইনে গিয়ে দাঁড়াল রোডস। ঝটকা দিয়ে মেশিনগান তুলে টার্গেট সই করে ট্রিগার টিপে দিল। কড়কড় করে অদ্ভুত আওয়াজ তুলে পাশাপাশি দাঁড় করানো চারটে ডামির গায়ে রঙ ছিটাল একঝাঁক বল।

ঘাড় বাঁকা করে গোয়েন্দাদের দিকে তাকাল রোডস, চোখে চ্যালেঞ্জের হাসি, 'কি বুঝলে?'

'কিছুই বুঝলাম না,' সত্যি কথাটা বলে দিল কিশোর। গোয়েন্দাগিরি থেকে অস্ত্রবাজিতে সরে যাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই তার। এ সব শিশুতোষ খেলা খেলে সময় নষ্ট করার চেয়ে দশ লক্ষ টাকার ডাকাতি ঠেকানোর চেষ্টা করাটা অনেক জরুরী।

কিন্তু অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে হাসিতে দাঁত বেরিয়ে গেল মুসার।

'আমাদেরও দেয়া হবে? দিন।'

পোশাক আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রওনা হলো ওরা। বোলডোজার দিয়ে সমান করা আরেকটা পথ ধরে—আগের দিন যেটা দিয়ে এসে পাহাড়ে উঠেছিল মুসা সেটা নয়—নিয়ে চললেন এনডি। রোডসের টিমের অন্য তিনজনের সঙ্গে দেখা হলো গোয়েন্দাদের। একজনকে চেনে, ক্রু-কাট চুল টোনার নরম্যান। অন্য দু-জনের সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। একজনের চারকোণা মুখ, কালো এলোমেলো চুল মাথার ফ্যাটিগ ক্যাপের নিচ দিয়ে যেন উপচে পড়ছে। নাম জনি বিয়াগুা। আরেকজন ডিক ফ্র্যান্সিস, ছোটখাটো একজন মানুষ, চেপে কঠিন করে রাখে চোয়াল, বুনি হ্যাটটা টেনে দিয়েছে চোখের ওপর। বুশ লেপার্ডদের সবাই খয়েরী রঙের ছোপওয়ালা স্ট্যাণ্ডার্ড আর্মি ইউনিফর্ম পরেছে, টোনার বাদে। তার পরনে রোডেশিয়ান ক্যামি।

একজায়গায় নির্দেশক ফলকে লেখা রয়েছে 'হ্যামবারগার হিল'। মোড় নিয়ে সেদিকে এগোলেন এনডি। সরু একটা পায়েচলা পথ ধরে এগোল দলটা একটা বনে ছাওয়া পাহাড়ের দিকে। গোড়ায় খানিকটা খোলা জায়গায় কয়েকটা প্লাইউডের তৈরি ছাউনি আছে। তার ওপাশে পাহাড়ের উপত্যকাটা যেখানে উঁচু হতে আরম্ভ করেছে, সেখানে কতগুলো ট্রেঞ্চ খনন করা। কিনারে বালির বস্তা ফেলে কভারও তৈরি হয়েছে।

'কি করতে হবে শোনো,' বুঝিয়ে দিল রোডস, 'তোমরা এই ছাউনিতে থাকবে। আমরা নেমে আসতে থাকব পাহাড় থেকে। ট্রেঞ্চটা হলো একটা দুর্গ, এতে ঢোকার চেষ্টা করব। তোমাদের কাজ আমাদের ঠেকানো। একটা দল পুরোপুরি না মরে যাওয়া পর্যন্ত লড়াই চালাব আমরা।'

পাহাড়ের দিকে মুখ করা দুটো ছাউনি আছে। তৃতীয় ছাউনিটা বেশ খানিকটা দূরে, পাহাড়ের দিকে আড়াআড়ি করে তৈরি। প্রতিটি ছাউনিরই সামনে এবং পেছন দিয়ে ঢোকার দরজা আছে, কোমর সমান উঁচু দরজা, ওপরের অংশটা খোলা রাখা হয়েছে গুলি করার সুবিধের জন্যে। তৃতীয় ছাউনিটাতে মুসাকে রেখে এসে অন্য দুটোর সামনের দরজার কাছে পজিশন নিল কিশোর আর রবিন।

পেইন্টবল কতগুলো আছে দেখে নিল মুসা। সামনের দরজা দিয়ে সাবধানে উঁকি দিয়ে দেখল পাহাড়ের চূড়ায় কি ঘটছে।

চোখে পড়ল কেবল এনডিকে। চিৎকার করে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'রেডি?'

'রেডি,' জবাব দিল কিশোর।

'গো!' যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দিয়েই গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এনডি।

মুহূর্ত পরেই বনের ভেতর থেকে ছুটে বেরোল টোনার। খোলা জায়গা ধরে দৌড় দিল একটা ঝোপের দিকে। কড়কড় করে উঠল গোয়েন্দাদের মেশিনগান। বল ছুঁড়তে লাগল তাকে লক্ষ্য করে। ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল

সে। মাথা থেকে উড়ে গেল হ্যাট, বেরিয়ে পড়ল ক্রু-কাট চুল।

শরীর মুচড়ে মুচড়ে ক্রল করে ঝোপটার কাছে পৌঁছে গেল সে। ঢুকে পড়ল তার মধ্যে।

এক এক করে বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এল রোডস, জনি আর ডিক। ছাউনির দিকে গুলি করতে করতে ট্রেঞ্চের দিকে আসার চেষ্টা করল। কিন্তু মেশিনগানের বল-বৃষ্টির কারণে পিছু হটতে বাধ্য হলো।

'টোনার!' চিৎকার করে রোডসকে বলতে শুনল মুসা, 'যাও এখন!'

আবার দেখা দিল তার তিন সঙ্গী। সামনের দুটো ছাউনির দিকে গুলি করতে করতে ছুটল। টোনারকে কভার দিচ্ছে ওরা, ওকে বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি করতে চাইছে, বুঝতে পারল মুসা। ছাউনির দরজায় উঁকি দিয়ে যে ঝোপটাতে টোনার লুকিয়েছে সেটা লক্ষ্য করে কয়েকটা বল ছিটাল। দারুণ মজা পেতে আরম্ভ করেছে সে।

ঠুস করে একটা বল এসে ফাটল তার দরজায় লেগে। ঝট করে মাথা নামিয়ে ফেলল সে।

এলোপাতাড়ি গুলি করেও কভার দিতে না পেরে এবার নিশানা করে গুলি লাগানোর চেষ্টা চালাল বুশ লেপার্ডরা। কয়েক মিনিট ধরে চলল এ ভাবে লড়াই। কেউ কাউকে লাগাতে পারল না, একজনও মরল না কোন দলের। পাহাড়ের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে মুসা। কাউকে দেখলেই···

পেছনে ঠিক তার দরজার বাইরে কড়কড় করে উঠল মেশিনগান। ঠুস করে একটা বল ফাটল তার পিঠে লেগে।

চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল সে। হাঁ হয়ে গেল জনি আর ডিককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। কি আর করবে? মারা পড়ে গেছে। এত সহজে ফাঁকিতে পড়ব কল্পনাই করতে পারেনি। সামনের দিকটাতেই শুধু নজর ছিল ওদের তিনজনের, এই সুযোগে দু-জনকে পেছনে কভার করতে পাঠিয়ে দিয়েছে রোডস।

মুসাকে মেরে পা টিপে টিপে অন্য দুটো ছাউনির দিকে এগোল শত্রুরা। চিৎকার করে সাবধান করে দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গিয়েও বন্ধ করে ফেলল সে। কারণ মৃত যোদ্ধার চিৎকার করার নিয়ম নেই। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিছু করতে পারল না মুসা। ছাউনির পেছনে গিয়ে দরজার ওপর দিয়ে দুটো গুলি, ব্যস, খতম হয়ে গেল কিশোর আর রবিনও। খেলা শেষ।

চোখমুখ কুঁচকে পিঠ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

হাসতে হাসতে পাহাড় থেকে নেমে এল টোনার। 'ভালই খেলেছ।'

ক্যাপ্টেন রোডস বলল, 'টোনার, খুব স্লো খেলেছ তুমি। কভার নিয়েছ পচা একটা ঝোপে। আরও ভাল কভার নেয়া উচিত ছিল, যাতে নিজেও গুলি লাগাতে পারতে। নিজে অসহায় হয়ে গিয়ে আমাকে ফেলে দিয়েছ বিপদে।'

ডিক আর জনির দিকে ফিরল সে। 'তোমরাও অনেক সময় নিয়েছ। দু-জনে একসঙ্গে মুসার কাছে না গিয়ে একজন তার কাছে আরেকজন কিশোরের কাছে যেতে পারতে। ওদের দু-জনকে শেষ করে রবিনকে

আক্রমণ করলেই হত।'

'বেশি সিরিয়াস,' বিড়বিড় করে কিশোরকে বলল রবিন।

'হ্যাঁ,' একমত হলো গোয়েন্দাপ্রধান। 'প্র্যাকটিস করতে এসে অত খেপা কেন?'

ওদের কথায় কান নেই মুসার, লেপার্ডদের কথা শুনছে। বলল, 'তবে অনেক ভাল খেলেন আপনারা। একেবারে আসল কমাণ্ডো। আর্মির লোক নাকি?'

খকখক করে হেসে উঠল রোডস। 'আর্মি? ধারেকাছেও না। টোনার অ্যাকাউন্টেন্ট। জনি বীমা কোম্পানির দালাল, ডিক বেচে গাড়ি। তবে স্কুলে পড়ার সময় বয় স্কাউট ছিল জনি।'

অস্বস্তি দেখা গেল অন্য তিন লেপার্ডের মধ্যে।

গোয়েন্দাদের দিকে সরাসরি তাকাল রোডস। 'খেলার জন্যে ধন্যবাদ। আশা করি আবার খেলতে পারব, কি বলো?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে আবার তিন সঙ্গীর সমালোচনা শুরু করল।

চোখ সরু সরু করে রোডসকে দেখছে কিশোর। খানিকটা সরে এসে দুই সহকারীকে বলল, 'বুঝলে, ডাকাতির পরিকল্পনা করলে ঠিক এ রকম মানুষদেরই বেছে নিতাম আমিও। রোডস লোকটা করে কি আসলে? নিজের কথা তো বলল না।'

জবাব দিতে পারল না দুই সহকারী।

ঘড়ি দেখল রোডস। সঙ্গীদের বলল, 'আজ এ পর্যন্তই। রাতে ডিউটি আছে। প্র্যাকটিস করতে থাকো। মঙ্গলবার বিকেলে দেখা হবে।'

হাঁটতে লাগল বুশ লেপার্ডরা। পেছনে চলল পরাজিত তিন গোয়েন্দা। অস্ত্রশস্ত্র আর পোশাক এনডির কাছে জমা দিয়ে যখন পার্কিং লটে পৌঁছল ওরা, দেখে গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে রোডস।

তাড়াতাড়ি দরজার তালা খুলে দিয়ে কিশোর বলল, 'জলদি গাড়িতে ওঠো! মুসা, জোরে দরজা বন্ধ করবে না।'

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল মুসা ও রবিন।

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে গেল রোডস। পিছু নিল কিশোর। সান্তা মনিকা বুলভার ধরে চলার সময় অনেকটা পেছনে থেকে অনুসরণ করল। তারপর যানবাহনের ভিড় বাড়লে কাছে চলে এল, লেগে রইল লোকটার ঝরঝরে ক্যামারো গাড়িটার পেছনে।

'কিশোর, কি করছ?' জানতে চাইল রবিন।

'বুঝতে পারছ না? রোডসকে অনুসরণ করছি। কাল মুসা যে দু-জনকে দেখেছে, তাদের একজন কিনা সে জানতে হবে। শুনলে না, বলল, রাতে ডিউটি আছে। কি কাজ করে দেখার এটাই সুযোগ।'

বুলভার ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎ ডানে মোড় নিয়ে বেভারলি ড্রাইভে উঠে গেল রোডস। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কিশোর। বেভারলি হিলের ভেতর দিয়ে একবার এ রাস্তা একবার ও-রাস্তা করে করে ওকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল

রোডস, যেন অকারণে ঘুরিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশেষে ঢুকল একটা বাড়ির পার্কিং লটে।

কিশোরও ঢুকল। বাড়িটার পাশ কাটিয়ে সামনে গিয়ে দেখার ইচ্ছে কিসের অফিস। কিন্তু এগোতে গিয়ে আটকা পড়ল দুটো গাড়ির মাঝখানে। আরও দুটো গাড়ি এসে থামল সামনে আর পেছনে। চারটে গাড়ির আটজন পুলিশ অফিসার ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল তার দিকে। ছেলেরা কেন ঢুকেছে এখানে যেন বোঝার চেষ্টা করছে।

হেঁটে এগিয়ে এল রোডস। জ্বলন্ত চোখে তাকাল গোয়েন্দাদের দিকে।

মুসা দেখল বাড়িটার পেছনে একটা সাইনবোর্ডে লেখা:

বেভারলি হিলস পি. ডি.

'চমৎকার,' নাকমুখ বিকৃত করে বলল রবিন, 'পুলিশ! বেভারলি হিলস থানার পুলিশ।'

তার কথা শুনে ফেলল রোডস। 'হ্যাঁ, পুলিশ।' কিশোরের জানালার পাশে ঝুঁকে দাঁড়াল। 'এবার আমার প্রশ্নের জবাব দাও। পিছু নিয়েছ কেন?'

চার

ধাক্কাটা হজম করে নিল কিশোর। মগজের বিয়ারিংগুলো চালু হয়ে গেছে পুরোদমে। জবাব খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

'ইয়ে,' পুলিশ অফিসারের পাথর-কঠিন চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল সে, 'একটা বাজি হেরে গেলাম।'

'কি বাজি?'

'আপনাদের লড়াই দেখে রবিনের সঙ্গে বাজি ধরেছিলাম, আপনি সেনাবাহিনীর লোক। সে আমার কথা মানল না।' পকেট থেকে দোমড়ানো দুটো নোট বের করে রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিল কিশোর। 'নাও, তুমিই জিতলে।'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে রোডস। যেন কিশোরকে বিশ্বাস করবে কিনা বুঝতে পারছে না। অনেকটা নরম হয়ে এল দৃষ্টি। 'একেবারে ভুল হয়নি তোমার, কিশোর। দুই বছর আগেও সেনাবাহিনীতে ছিলাম, মিলিটারি পুলিশ।'

'আর এমন আচরণ করে,' গাড়ি থেকে নেমে এসেছে আরেকজন অফিসার, 'যেন এখনও আর্মিতেই রয়েছে।' তার কণ্ঠে সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ কান এড়াল না কিশোরের।

চট করে সহকর্মীর দিকে তাকাল রোডস, কঠিন হয়ে গেল দৃষ্টি। কিশোরকে বলল, 'যাই হোক, বোকার মত পিছু নেয়ার শিক্ষা তো পেলে। আক্কেল হয়েছে আশা করি। যাও এখন।'

এই দুটো শব্দ শুনে এত খুশি আর কখনও হয়নি তিন গোয়েন্দা। পালাতে পারলে বাঁচে ওরা।

রকি বীচে ফিরে চলল কিশোর।

রবিন বলল, 'মুসা, কি বলো, টাকাটা ফেরত দেয়ার আর দরকার আছে? জিতেই তো নিলাম।'

'রেখে দেয়াই উচিত, স্যুভনির হিসেবে। বোকামি করে নগদ টাকা গচ্চা দিয়েছে কিশোর পাশা, এটা পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। টেলিভিশনে দেয়া দরকার।'

গাড়ি চালাতে চালাতে আনমনে বলল কিশোর, 'লোকটা কি কাজ করে দেখতে চেয়েছিলাম আমি।'

'দেখা তো হলো,' বলল রবিন, 'তবে এমন বেকায়দায় পড়ব কল্পনাও করিনি। 'রোডস পুলিশ। তাকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দেয়া যায়।'

'কিন্তু তার সহকর্মীরা তাকে পছন্দ করে না, লক্ষ করোনি?'

'করেছি। কিন্তু তাতে প্রমাণ হয় না ডাকাতির প্ল্যান সে-ই করেছে।'

'আবার গোড়া থেকে ভেবে দেখা যাক,' বলল কিশোর। 'দু-জন পেইন্টবল খেলোয়াড়কে দশ লাখ ডলার ডাকাতির প্ল্যান করতে শুনেছে মুসা। একজন পরেছিল স্ট্যাণ্ডার্ড আর্মি ক্যামোফ্লেজ। আরেকজন রোডেশিয়ান বুশ ক্যামোফ্লেজ। রোডেশিয়ান ক্যামি পরেছিল সেদিন টোনার নরম্যান, জর্জ অ্যাণ্ডারসন, নীল ওডিমার…'

'কলসের মত পেট,' মুসা বলল।

'এবং লাল-চুল জন রাসটি,' যোগ করল রবিন।

'আর,' কিশোর বলল, 'হেনরি ভেগাবল। পুরু গোঁফ আছে যার, একটা গ্যারেজের মালিক।'

'মোট পাঁচজন,' মুসা বলল।

'টোনার বুশ লেপার্ডের লোক। নীল আর রাসটি স্পেস কমাণ্ডো দলের। হেনরি হলো সেভেন ড্রাগন। আর জর্জ অ্যাণ্ডারসন তো ব্যাটল থ্রি-র মালিকই।'

'দূর, জট পাকিয়ে যাচ্ছে সব! অত মনে রাখতে পারি না।'

'আমার আছে।'

'তোমার তো থাকবেই, কম্পিউটারের ব্রেন।'

'তা তো বুঝলাম।' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করব?'

'বাড়ি ফিরে যাব,' জবাব দিল কিশোর। 'নিকিভাইকে জিজ্ঞেস করব হেনরি ভেগাবলকে চেনে কিনা। গ্যারেজের মালিক যখন, গাড়ি মেকানিকরা চিনতে পারে।'

'ভেগাবলকে টানাহেঁচড়া কেন?' মুসার প্রশ্ন। 'ভাল লোকই তো মনে হলো। তা ছাড়া আমাদের দলে খেলেছিল।'

'তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। ফ্ল্যাগ স্টেশন থেকে সরে গিয়েছিল সে। বনে

ঘোরাফেরা করেছে, তুমি যখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলে। আজকে প্র্যাকটিস করার সময় বল ফুরালে যখন আবার টিউব কিনতে গেলাম, তখন জেনেছি। কারও সঙ্গে দেখা করতেই হয়তো বনে ঢুকেছিল। গোপন আলোচনা করার জন্যে বনের চেয়ে ভাল জায়গা আর কি হতে পারে?'

'উঁম্!' ভেগাবল খারাপ লোক, মেনে নিতে পারছে না মুসা। 'ঠিক আছে, দেখা যাক নিকিভাই কি বলে?'

ইয়ার্ডে ঢুকল কিশোর। নিকির গ্যারেজের সামনে গাড়ি রাখল। ন্যাকড়া দিয়ে হাতের কালি মুছছে নিকি। মুখ তুলে বলল, 'এসেছ। ব্যাপার কি? কিছু হয়েছে মনে হচ্ছে?'

ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথায় এল কিশোর, 'কাল পেইন্টবল খেলতে গিয়ে একটা লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, হয়তো চিনবে। তার নাম হেনরি ভেগাবল। মোটর গাড়ির গ্যারেজ আছে।'

মাথা ঝাঁকাল নিকি, 'হ্যাঁ, চিনি। খুব ভাল মেকানিক। শুনেছি পেইন্টবলও ভাল খেলে, কোন একটা টিমে। কিন্তু শনিবারে খেলতে গেল কি করে? সেদিন তো কাজের জ্বালায় দম ফেলার ফুরসত থাকে না।'

'যা শুনলাম, গ্যারেজ ভাল চলছে না।'

'ও, তাহলে ঠিকই শুনেছি। আমার কানেও এসেছে এ রকম কথা। এ শহরের সবচেয়ে ভাল মেকানিকদের একজন হেনরি। কিন্তু আজকাল গ্যারেজ করতে গেলে অনেক টাকা লাগে। গাড়ির ইঞ্জিনে এমন সব আধুনিক কলকজা ভরে দেয়, টেস্ট করতে দামী দামী যন্ত্র লাগে। তাই গ্যারেজ করতে গেলে হয় তোমার অনেক টাকা থাকতে হবে, নয়তো কোন বড় গাড়ি কোম্পানির সঙ্গে খাতির থাকতে হবে। হেনরির কোনটাই নেই। ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে শিগগিরই।'

'টাকার জন্যে চুরিদারি করবে না তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'মরিয়া হলে?'

'চুরি করবে? হেনরি?' হেসে উঠল নিকি। 'গাড়ির ইঞ্জিনে গোলমাল করে দিয়ে পয়সা আদায় করতে যে লোকের বাধে, সে করবে টাকা চুরি…' সন্দিহান চোখে তার দিকে তিন গোয়েন্দাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে থেমে গেল সে। 'ও, বুঝলে না? অনেক মেকানিকেরই একটা বদস্বভাব আছে। ইচ্ছে করে ভাল ইঞ্জিনে জটিল গোলযোগ করে রাখে। যাতে বার বার তার কাছে আসতে হয় মালিককে। যত বেশিবার ইঞ্জিন ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তত বেশি বিল হবে। এই সাধারণ চালাকিটাও করতে যায় না হেনরি। গ্যারেজের ব্যবসায় সে মরবে না তো কে মরবে?'

'তবু, আমি ভেগাবলের ব্যাপারে শিওর হতে চাই,' কিশোর বলল। 'নিকিভাই, তুমি আমার গাড়িটায় কিছু কাজ করে দিতে পারো?'

অবাক হলো নিকি। 'কাজ! আর কি বাকি? সবই তো করে দিয়েছি।'

'জানি, ভাল করে দিয়েছো। এবার খারাপ করতে হবে। তখন ভেগাবলের কাছে মেরামত করাতে নিয়ে যাব।'

. ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল নিকির সারা মুখে। 'তাই বলো। টাইমিঙের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি, গত হপ্তায় যেটা টিউনিং করতে গিয়ে ঘাম ঝরিয়েছি। চাকার অ্যালাইনমেন্ট গড়বড় করে দিতে পারি আবার।'

হাসি চওড়া হলো তার। 'মুসা, সাহায্য করো তো আমাকে।' গ্যারেজের কোণে রাখা একটা কাটা ড্রাম দেখিয়ে বলল, 'ওটাতে খুঁজে দেখো, ছয়টা স্পার্ক প্লাগ পাবে। কিশোরের গাড়িটা থেকে খুলে রেখেছিলাম। দেখলেই চিনবে। জঘন্য। এই জিনিস দিয়ে কি করে চালাত লোকটা খোদাই জানে। অমন কিপটে আর দেখিনি,' আগের মালিকের কথা বলল সে। 'একটা পচা ব্যাটারিও লাগবে। সবই করতে পারব, কেবল এগজস্টের মুখ জ্যাম করাটাই কঠিন হবে।'

ইঞ্জিনের হুড তুলল নিকি। 'প্রথমেই টাইমিং।' ইঞ্জিনের সামনের ক্র্যাঙ্কশ্যাফট ড্রাইভ পুলিতে হাত দিল সে, যেখানে ইগনিশন টাইমিঙের ডিগ্রি চিহ্নিত করা আছে। এত কষ্ট করে যে টিউনিংটা করেছিল, পয়েন্টারে দু-চারটা চাপ দিয়েই দিল সেটার সর্বনাশ করে।

'গেল। স্পার্ক টাইমিঙের বারোটা বাজল। নক করতে থাকবে এখন ইঞ্জিন।' ভাল প্লাগগুলো খুলে নিয়ে বাতিলগুলো আবার লাগিয়ে দিল নিকি।

দুই আঙুলে চুটকি বাজাল সে। ইঞ্জিন ভাল করতে যেমন মজা পায়, খারাপ করতেও তেমনি মজা পাচ্ছে। ইগনিশন কয়েল থেকে যে তারগুলো ডিস্ট্রিবিউটর আর স্টার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে, সেগুলোতে হাত দিল। কয়েক মিনিট পর সোজা হয়ে বলল, 'দিলাম পজেটিভ-নিগেটিভ উল্টোপাল্টা করে। এমনিতেই বাতিল প্লাগ, এখন শুরু হবে কারেন্টের গণ্ডগোল। অর্ধেক কমে যাবে ইঞ্জিনের শক্তি।'

এগজস্ট মেইনফোল্ড খুলল সে। বড় বড় কয়েক চামচ পোড়া মবিল ফেলে দিল তার মধ্যে। চাকার অ্যালাইনমেন্ট এলোমেলো করল। তারপর হাসিমুখে ঘোষণা করল—ধুঁকতে ধুঁকতে এখন ভেগাবলের গ্যারেজে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে কিশোরের গাড়ি।

গাড়ির সঙ্গে যেন লড়াই করতে করতে ভেঞ্চুরা বুলভার ধরে এগোল কিশোর। সাংঘাতিক বেয়াড়াপনা করছে সামনের একটা চাকা। খালি এদিক ওদিক সরে যেতে চায়।

'এত সুন্দর ইঞ্জিনটা ছিল!' কালো এসকর্ট গাড়ির হুডের নিচ থেকে আসা ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে শুনতে বলল মুসা, 'কি করে এ কাজ করতে দিলে! শেষ হয়ে গেছে তো!'

'আমি তো ভাবছি অন্য কথা,' রবিন বলল। 'এই জিনিস চালাচ্ছে কি করে? বাপরে বাপ, কিং শব্দ!'

একশো গজ যেতে না যেতেই ব্যাকফায়ার করে বসে এগজস্ট, যেন পিস্তলের গুলি ফোটে। থমকে দাঁড়ায় পথচারীরা। কেউ ভুরু কুঁচকে, কেউ বা বিস্মিত চোখে তাকিয়ে থাকে গাড়িটার দিকে। তাদের চোখে যাতে চোখ না পড়ে সে-ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে কিশোর। ব্যাকফায়ার করার সঙ্গে সঙ্গে

মাথা নিচু করে ফেলে রবিন। এমন একটা গাড়িতে বসে থাকতেও লজ্জা লাগছে।

'আল্লাহরে, হেভেনহার্স্টে পৌঁছতে পারলাম দেখা যাচ্ছে!' মুসা বলল, 'আমি তো ভাবছিলাম জিন্দেগীতেও আসতে পারব না। গ্যারেজটা এখানেই কোথাও হবে।'

একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল কিশোরের:

এইচ. ভেগাবল
অটো রিপেয়ার্স

গাড়ি ঘোরাল সে। চাকার ওপর মাতালের মত টলোমলো করে উঠল বডিটা। ঢুকে পড়ল গ্যারেজের ড্রাইভওয়েতে। একঝলক নীলচে ধোঁয়ার মেঘ উগড়ে দিয়ে, গুঙিয়ে উঠে, সমস্ত শরীরে ভয়ানক কাঁপুনি তুলে অবশেষে স্তব্ধ হয়ে গেল এসকর্টের ইঞ্জিন।

মেকানিকের পোশাক পরা ভেগাবলকে অন্য রকম লাগছে। অনেক রোগা-পাতলা। তবে হাসি আর গোঁফ একই রকম আছে। 'শব্দ শুনে তো মনে হলো...' কিশোরের ওপর চোখ পড়তেই বড় বড় হয়ে গেল চোখ, 'আরি, তোমরা?'

'কাল শুনলাম আপনার একটা গ্যারেজ আছে,' কিশোর বলল, 'তাই নিয়ে এলাম। গাড়িটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড কিনেছি। ভুল করলাম কিনা বুঝতে পারছি না। একেবারেই চলতে চাইছে না। সারানোর অনেক চেষ্টা করেছে আমার বন্ধু,' নিরীহ ভঙ্গিতে আঙুল তুলে মুসাকে দেখাল সে। ঝট করে আরেক দিকে মুখ ঘুরিয়ে ফেলল মুসা, দেখে যদি বুঝে ফেলে ভেগাবল কিশোর মিথ্যে বলছে, এই ভয়ে। বলে চলেছে কিশোর, 'কিছুই করতে পারল না। আরও খারাপ হয়ে গেছে।'

'সরো, দেখি কি হয়েছে?'

'আপনার জরুরী কাজের ক্ষতি করে দিচ্ছি না তো?' শূন্য গ্যারেজে চোখ বোলাল কিশোর। আর একটা মাত্র গাড়ি আছে, সবুজ মার্সিডিজ, নিশ্চয় নীল ওডিমারের গাড়িটা। যেটা দিয়ে যাবে বলেছিল।

'জরুরী? কোন কাজই নেই।' মার্সিডিজটা দেখিয়ে বলল ভেগাবল, 'ওটারও তেমন কিছু হয়নি। কেবল কয়েকটা নাট-বল্টু টাইট দিতে হবে। বসে থাকতে ভাল্লাগছিল না, তোমার গাড়িটা এনে বরং বাঁচালে।'

হুড তুলে ইঞ্জিনে একবার নজর দিয়েই মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'কার কাছ থেকে কিনেছ? অত খামখেয়ালি মানুষ জীবনে দেখিনি! মেকানিকের চেহারাও দেখেনি মনে হচ্ছে ইঞ্জিনটা। চলছে কি করে?' তিরিশ সেকেণ্ড হাতাহাতি করার পর বলল, 'মনে হচ্ছে ইচ্ছে করে করা হয়েছে এ সব গোলমাল! আশ্চর্য!'

মুসার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল রবিন।

যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজে লাগল মেকানিক। যতই এটা-ওটা টাইট করে, ততই বেশি মাথা নাড়ে, বিড়বিড় করছে আপনমনে।

করুক কাজ। অনেক সময় লাগবে। এই সুযোগে আস্তে আস্তে গ্যারেজের পেছন দিকে সরে যেতে শুরু করল কিশোর।

দ্রুত চোখ বোলাল গ্যারেজের অফিসে। ডেস্কের কাছে এসে দেখল কয়েকটা বিল পড়ে আছে—মুদী দোকান আর গাড়ি মেরামতের টুকিটাকি যন্ত্রপাতির—পরিশোধের শেষ তারিখও পেরিয়ে গেছে, টাকা পরিশোধ হয়নি। এতটাই খারাপ অবস্থা? অবাক হলো কিশোর।

ঘরের কয়েকটা শূন্য জায়গায় দাগ দেখে বোঝা গেল, ওখানে কিছু মেশিন-টেশিন ছিল। হয় টাকার অভাবে বিক্রি করে দিতে হয়েছে, কিংবা যারা বিক্রি করেছিল, টাকা না পেয়ে ফেরত নিয়ে গেছে।

পেছন দিকে একটা ধাতব দরজা আছে। বন্ধ। নব মোচড় দিয়ে খোলার চেষ্টা করল কিশোর, পারল না, তালা দেয়া। কি করে খোলা যায়? পকেটে হাত দিল সে। প্লাস্টিকের আইডেনটিটি কার্ডটা দিয়ে···

পেছন থেকে একটা ছায়া পড়ল দরজায়। ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর।

হাতে ইয়াবড় এক রেঞ্চ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হেনির ভেগাবল। কুঁচকে রেখেছে ভুরু।

'কি করছ?' কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

পাঁচ

বরফের মত জমে গেছে যেন কিশোর। কাঁধে ঝাঁকুনি খেয়ে সংবিৎ ফিরল। 'ইয়ে···বাথরুম!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল ভেগাবল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'এটা বাথরুম নয়, প্রাইভেট ওঅর্কশপ। বাথরুম বাইরে। এসো, তালা খুলে দিচ্ছি।'

কিশোরকে নিয়ে অফিসে ফিরে এল ভেগাবল। হুক থেকে চাবি নামিয়ে কিশোরের হাতে দিয়ে বাইরে বেরোল। 'ওই যে, বাঁয়ের দরজাটা।'

দীনহীন একটা বাথরুমে এসে ঢুকল কিশোর। ময়লা বেসিন। মুখে পানির ছিটে দিয়ে দুই মিনিট পর বেরিয়ে এসে অভিযোগের সুরে বলল, 'একটা তোয়ালেও নেই যে মুখ মুছব।'

আছাড় দিয়ে দড়াম করে হুড লাগিয়ে দিয়ে ভেগাবল বলল, 'ওঠো, স্টার্ট দাও।'

ড্রাইভিং সীটে উঠে বসল কিশোর। ইগনিশনে মোচড় দিয়ে সামান্য একটু এক্সিলারেটর দাবাতেই গুঞ্জন করে উঠল ইঞ্জিন। শব্দ শুনে অবাক হলো সে। 'আরি, দারুণ তো!'

'আরও কাজ আছে,' মেকানিক বলল। 'চাকাগুলোর অ্যালাইনমেন্ট

করতে হবে। এগজস্টও পরিষ্কার করা লাগবে। যার কাছ থেকে কিনেছ, তার কানটা ধরে মুচড়ে দাও গিয়ে। একটা জিনিস চালাবে, তো এত অযত্ন কেন?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হাসল।

'সব সারাতে সময় লাগবে,' ভেগাবল বলল। 'রেখে গেলে ভাল হত। পারবে?'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'বাড়ি যাব কি করে? পরে নিয়ে আসব।'

'আচ্ছা। কয়েকটা পার্টস লেগেছে। আর আমার খরচ···দাঁড়াও, কত হয়েছে বলি।'

দ্রুত একটা কাগজে হিসেব করে নিতে লাগল সে। তারপর কাগজটা বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

একবার চোখ বুলিয়েই ঢোক গিলল কিশোর।

অনেকটা কৈফিয়তের সুরেই ভেগাবল বলল, 'পেইন্টবল-পার্টনার তুমি, যতটা সম্ভব কম রাখার চেষ্টা করেছি। এর চেয়ে কম আর পারলাম না।'

আবার মাথা ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত দিল কিশোর।

ফেরার পথে রবিন বলল, 'আগের চেয়ে ইঞ্জিনের শব্দ ভাল হয়ে গেছে। নিকিভাই যা করেছিল, তার চেয়েও।'

'আমার মনে হয় টাকা খরচটা তোমার পুষিয়ে গেছে, কিশোর,' খোঁচা দিয়ে বলল মুসা।

তিক্ত দৃষ্টিতে দু-জনের দিকে তাকাল কিশোর। 'সিনেমায় নেমে পড়ো। ভাঁড়ামির অভিনয় করলে অনেক টাকা পাবে। আমি তো ফতুর। লাভের মধ্যে পেলাম একটা বন্ধ দরজা। একমাত্র সূত্র।'

'কেন, আরেকটা পাওনি?' রবিন বলল, 'হেনরি ভেগাবল অনেক বড় মেকানিক।'

'কিন্তু সে যে ভাল লোক, তা তো জানতে পারলাম না। তার ব্যবসার অবস্থা খুবই খারাপ। তাইলে কি এমন মূল্যবান বস্তু আছে ঘরটায় যে তালা মেরে রাখতে হবে?'

জবাব দিতে পারল না কেউ।

'কেসের ভাবনাটা আপাতত বাদ দিলে হয় না?' রবিন বলল। 'মুসা, ঘটনাটা কি তোমার? এখনও খাওয়ার কথা বলছ না যে?'

'বলে কি হবে? ও শুনবে নাকি?' কিশোরকে দেখাল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। বাপরে বাপ! এই জন্যেই পেটে গুড়গুড় করছে। সাড়ে চারটে বাজে। 'চলো, কোন স্ন্যাকস শপে ঢুকে পড়ি।'

'সামনেই হাউজ অভ কুকিজ। স্পেশাল ওট-ব্র্যান মাফিন বানাচ্ছে, বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। খেয়ে দেখি।'

কিছুদূর এগোতেই একটা মল পড়ল পথের পাশে। তাতে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। খাবারের ফ্লোরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পেছনে শোনা গেল চিৎকার, 'চোর! চোর! মানিব্যাগ নিয়ে গেল!'

হাতে ব্যাগটা নিয়ে শাঁ করে গোয়েন্দাদের পাশ দিয়ে চলে গেল একটা

ছেলে।

'ধরো ওকে, ধরো!' চিৎকার করে বলল আবার মহিলা।

দৌড় দিল মুসা আর রবিন। অনেক আগে চলে গেছে ছেলেটা। প্রাণপণে ছুটছে। ধরতে পারত না ওকে, হঠাৎ হাউস অভ কুকিজ দোকানটার ভেতর থেকে একটা ধাতব ট্রে উড়ে এসে মুখে লাগতে থমকে গেল ছেলেটা। উফ করে মুখ চেপে ধরেছে।

তার পা সই করে ডাইভ দিল মুসা। পড়ে গেল ছেলেটাকে নিয়ে। রবিন এসে কাঁধ চেপে ধরল। দৌড়ে এল মহিলা, একজন সিকিউরিটি গার্ড আর কিশোর।

'আমার মানিব্যাগ নিয়ে পালাচ্ছিল!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল মহিলা।

উপুড় হয়ে থাকা ছেলেটাকে চিত করল গার্ড। বুকের কাছে মানিব্যাগ আঁকড়ে ধরে আছে ছেলেটা।

গার্ডের মুখের দিকে চোখ পড়তেই তাকে চিনে ফেলল মুসা। রকি বীচের একজন পুলিশ। ডিউটি নেই, তাই মলে পার্ট-টাইম কাজ করছে।

গোয়েন্দাদেরও চিনল লোকটা। হেসে বলল, 'বাহ্, তিন গোয়েন্দা যে। ঢুকেই ঠেকিয়ে দিলে অপরাধীকে। তোমাদের জ্বালায় আর চুরি-ডাকাতিও করতে পারবে না লোকে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল।

'ট্রে-টা যে ছুঁড়েছে সে-ই আসল কাজটা করেছে,' মুসা বলল। 'নইলে ধরতে পারতাম না।'

কে ছুঁড়েছে দেখার জন্যে দোকানের ভেতর উঁকি দিল সে। দেখে থমকে গেল। ওকেও চেনে, মারশা টুইটার। হাতে আরেকটা ট্রে, বোধহয় ছোঁড়ার জন্যেই নিয়েছিল। ক্যামোফ্লেজ আর মুখোশের বদলে আজ পরেছে জিনসের প্যান্ট আর সোয়েট শার্ট। কালো চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধে।

সে-ও চিনে ফেলল ওদেরকে। 'আরে, তোমরা, তিন গোয়েন্দা!' মুসার প্রতি আগ্রহ বেশি মেয়েটার। 'কাল কি করে জিতেছ বুঝে গেছি। যে ডাইভটা দিলে না, সুপার! খুব প্র্যাকটিস করো বুঝি?'

'এটা তো কিছুই না মুসার জন্যে,' বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো কিশোর। 'ওর সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র, মাথা। ওর নিগ্রো খুলির গুঁতো যে একবার খেয়েছে পেটে, জীবনে ভুলবে না। ওর সঙ্গে হাত মিলিয়ে পেইন্টবল খেলতে গেলে শিওর জিতে যাবে।'

কিশোরের কথায় অবাক হলো মুসা, এমন করে বলছে কেন? চোখ বড় বড় করে তাকাল তার দিকে। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'মেয়েটার সঙ্গে খাতির করে ফেলো। এনডির ব্যাপারে জানার একটা সুযোগ পাওয়া গেছে। বের করতে পারো নাকি দেখো।'

মুসার দিকে তাকিয়ে আছে মারশা।

কিশোর বলল, 'মুসা, তুমি কথা বলো। আমি আর রবিন একটু হার্ডওয়্যারের দোকানটায় যাচ্ছি, একটা জিনিস কিনতে হবে। এসো, রবিন।'

'তুমিও কি খেতে ঢুকেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ। তুমি?'
'আমারও পেট খালি। চলো, কোণের টেবিলটায় বসি।'
খাবারের অর্ডার দিল মারশা। তারপর মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'পেইন্টবল কেমন লাগল তোমার?'
'দারুণ!'
'আমারও খুব ভাল লাগে। গোয়েন্দাগিরিও নিশ্চয় খুব মজার। কখনও করার সুযোগ পাইনি। তুমি তো দুটোই করেছ। কোনটা বেশি রোমাঞ্চকর, গোয়েন্দাগিরি, নাকি পেইন্টবল?'
'কোনটাই কম মজা না।' এনডির কথা কি করে তুলবে, বুঝতে পারছে না মুসা। জিজ্ঞেস করল, 'সেদিনের পর আর ব্যাটলগ্রাউণ্ডে গিয়েছ নাকি?'
'না। কেন?'
'আমরা গিয়েছিলাম। পরদিন। টার্গেট প্র্যাকটিস করতে।'
'তাই! তারমানে ধরে ফেলেছে। সবাই গেছিলে, চারজনেই?'
'না, জিনা যায়নি। আমরা তিনজন।'
'কিশোরও? ও যাবে ভাবিনি। সেদিন যা বিরক্তি দেখাল।'
'এ সব খেলাটেলার চেয়ে অবশ্য রহস্যের তদন্ত করা বেশি পছন্দ কিশোরের। গিয়ে কিন্তু লাভই হয়েছে। এনডির সঙ্গে কথা বললাম। একটা স্পেশাল ফীল্ডে আমাদের খেলতে নিয়ে গেলেন তিনি। প্রচুর টাকা খরচ করেছেন ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-র পেছনে।'
'প্রচুর আসছেও। তাঁর জমি বেচাকেনার ব্যবসাও ভাল।' হাসল মারশা। 'মানুষের কপাল যখন ভাল হয়, সবদিকেই হতে থাকে। তাঁর টিম এনডিফোর্সও ভাল খেলছে। সেখান থেকেও টাকা আসে। জোরেশোরে প্র্যাকটিস করছে এখন, আগামী রোববার ম্যাচ খেলবে। অনেক টাকার খেলা।'
'অনেক কত?'
'চল্লিশ হাজার ডলার।'
অনেকই, তবে দশ লাখের তুলনায় অনেক কম।
চুপচাপ খেতে লাগল দু-জনে।
হঠাৎ বলল মারশা, 'পেইন্টবলে নাম লেখানোর ইচ্ছে আছে নাকি?'
'উঁম্! নাম লেখাব মানে?'
'পেশাদার হতে চাও?'
'নাহ্। ফুটবল বেশি পছন্দ আমার। তবে মাঝেসাঝে পেইন্টবল খেলতেও খারাপ লাগবে না।'
'আমার খুব ভাল লাগে। প্র্যাকটিস করার জন্যে সঙ্গী দরকার হয়। প্রতিপক্ষ। ডামিকে গুলি করে মজা নেই। আমার সঙ্গে প্র্যাকটিস করবে?'
'কোথায়? ব্যাটলগ্রাউণ্ডে?'
'ওখানে খরচ বেশি। আমাদের বাড়িতে আসতে পারো। বন্দুক-টন্দুক সব আছে আমার।'

হাসল মুসা। 'তার মানে প্রফেশন্যাল হওয়ারই ইচ্ছে?'
মাথা ঝাঁকাল মারশা। 'দেখি, কতখানি ভাল হতে পারি।'
'পারবে। তোমার যা ট্যালেন্ট, কোন একদিন চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেলেও অবাক হব না।'
ঘড়ি দেখল মারশা। 'এখনও অনেক সময় আছে। চলো, প্র্যাকটিস করলে।'
'এখনই!' দ্রুত ভাবনা চলেছে মুসার মাথায়। এত তাড়াতাড়ি এই খাতির কেন? একেবারে বাড়িতে দাওয়াত? মনে পড়ল কিশোরের কথা। এনডির ব্যাপারে জানতে আগ্রহী।
সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না মুসা। একবার দ্বিধা করে উঠে দাঁড়াল, 'চলো। দাঁড়াও, খাবারের বিলটা আমিই দিচ্ছি।' টাকা বের করে টেবিলে কাপচাপা দিয়ে রাখল সে।
হার্ডওয়্যারের দোকানটা পাশ কাটানোর সময় রবিন আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল মুসা। মারশার অলক্ষ্যে চোখ টিপল রবিন, মুচকি হাসল।
দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার মিডল-ক্লাস পরিবারের মেয়ে মারশা। ওখানে মিডল-ক্লাসদের যা থাকে, বাড়িটা সেই রকম করেই তৈরি। মুসাকে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলার ঘরে নেমে এল সে।
বিশাল ঘরটাকে নিজের মত করে সাজিয়ে নিয়েছে মারশা। অর্ধেকটা জুড়ে তৈরি হয়েছে শুটিং গ্যালারি। এক প্রান্তের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড় করানো হার্ডবোর্ড কেটে বানানো মানুষের প্রতিকৃতি, রঙে মাখামাখি হয়ে আছে ওগুলো।
ঘরটার অন্য প্রান্তে মুসাকে নিয়ে এল মারশা। সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখেছে তার ক্যামোফ্লেজ পোশাক, দেয়ালে ঝোলানো সবুজ মুখোশটা। তাকে সাজানো দুটো ট্রফি, পাশে রাখা পেইন্টবলের ওপর কিছু বই আর কয়েকটা ভিডিও ক্যাসেট। তার পেছনের দেয়ালে কয়েকটা ছবি, লস অ্যাঞ্জেলেসের বড় বড় পেইন্টবল খেলোয়াড়দের। খেলার দৃশ্য, খেলার পর বিজয়ের দৃশ্যের ছবিও আছে।
বিশাল টেবিলটার ওপর চোখ পড়তেই দৃষ্টি আটকে গেল মুসার। তিনটে পেইন্টগান পড়ে আছে। চকচক করছে। মুছে তেল দেয়া হয়েছে খানিক আগে। চতুর্থ গানটা পড়ে আছে টুকরো টুকরো হয়ে। মোছার জন্যে খোলা হয়েছে।
'খাইছে!' বলে উঠল সে, 'অতটাই যে সিরিয়াস, তখন তোমার কথা শুনেও কিন্তু ভাবিনি। অনেক বন্দুক কিনেছ।'
হাসল মারশা। 'কিনেছি আসলে একটা। কাল যেটা দিয়ে খেলেছি। বাকি তিনটে পুরস্কার, খেলায় জিতে পেয়েছি। ভাগ্যটা ভালই আমার, কি বলো?'
'রীতিমত ভাল।'

'এগুলো দিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিস করি আমি, মাঝে মাঝে খেলতে নিয়ে যাই।' এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে লম্বা নলওয়ালা একটা পিস্তল তুলে নিয়ে এল মারশা। মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'এটার নিশানা খুব ভাল, তবে একটু ভারি।' বাঁটটা মুসার হাতে ধরিয়ে দিল সে।

'দারুণ জিনিস,' দেখতে দেখতে বলল মুসা।

'গুলি করবে এটা দিয়ে?' মুসার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে বাঁট খুলে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্টিজ ভরল মারশা। দুই টিউব পেইন্টবল বের করে দিল। বলল, 'একটা পরাও, আরেকটা পকেটে রেখে দাও। ওই যে গগলস, পরে তৈরি হয়ে নাও। আমি ততক্ষণে গ্যালারিটা রেডি করে ফেলি।'

রঙ লেপটে থাকা দেয়ালের কাছে গিয়ে দুটো সুইচ টিপল সে। ঝটকা দিয়ে দিয়ে উঠতে-নামতে শুরু করল ছয়টা টার্গেট, কোন ধরনের ইলেকট্রিক বেল্টের সাহায্যে নড়ানো হচ্ছে ওগুলোকে, আন্দাজ করল মুসা। দুটো ডামিও একই ভঙ্গিতে নড়তে শুরু করল। একটার গায়ে র‍্যামবোর পোস্টার সাঁটানো, আরেকটাতে ইনডিয়ানা জোনস। যেন এতে চলছিল না, তাই আরও ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। চালু হয়ে গেছে একটা খুদে এয়ার কমপ্রেশর। ফক ফক করে বাতাস ছাড়ছে। অদৃশ্য বাতাসের ফোয়ারার মাথায় লাফাতে বাধ্য করছে ছয়টা পিং-পং বলকে।

'ওই বলে লাগাব? অসম্ভব,' বাতাসের অদৃশ্য ফোয়ারার ওপরে নাচতে থাকা বলগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল মুসা।

'প্রথমবারেই কি আর সবাই পারে। প্র্যাকটিস করতে হয়।' আরেকটা পিস্তলে বল ভরে নিল মারশা। একহাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল গুলি ছোঁড়ার কায়দায়। হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিল সামনে।

র‍্যামবো ডামিটা উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল ওটাকে। বুকে লাগল। দ্রুত গুলি করতে থাকল একের পর এক, প্রতিটি লক্ষ্য ভেদ করল নিখুঁত ভাবে। তারপর নজর দিল সবচেয়ে কঠিন টার্গেটগুলোর দিকে। ফোয়ারার ওপর থেকে ফেলে দিল তিনটা বল।

মুখ ফেরাল মুসার দিকে। হেসে বলল, 'তোমার পালা।'

শুটিঙে এতই মগ্ন হয়ে আছে মুসা, গোয়েন্দাগিরির কথাও ভুলে বসে আছে। দুটো ডামিকে লাগিয়ে দিল। চলমান টার্গেটগুলো কিছুটা দ্বিধায় ফেললেও একটা বাদে সব ক'টাতেই লাগাতে পারল।

টিউবে আর মাত্র তিনটে বল আছে। ওই কয়টা নিয়েই তৈরি হলো সবচেয়ে কঠিন লক্ষ্যগুলো ভেদ করার জন্যে। পিস্তল তুলে নিশানা করল সে। পেছনে এসে দাঁড়াল মারশা। মুসার হাত ধরে কি করে আরও ভাল নিশানা করতে হয় শিখিয়ে দিল। ধীরে ধীরে বলল, 'এখানে এক চোখ বন্ধ করলে চলবে না, দুই চোখই খোলা রাখতে হবে। তাতে ভাল করে দেখতে পাবে। আস্তে দম নাও, নিশানা ঠিক করো, ট্রিগার দাবাও।'

অক্ষরে অক্ষরে পালন করল মুসা। অবাক হয়ে দেখল একটা বল পড়ে গেছে।

'ভাল, সাংঘাতিক ভাল হাত তোমার!' উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল মারশা। 'আমার টিমে তোমার মত খেলোয়াড়ই দরকার।'

'তোমার টিম?' পরের টার্গেটটায় নিশানা করতে করতে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'খুলেই বলি তোমাকে। একমাস ধরে আমি আমার নিজের একটা টিম গড়ার চেষ্টা করছি। ছয়টা মেয়েকে পেয়েছি, যাদেরকে দিয়ে হবে। প্রথমে ভেবেছিলাম শুধু মেয়েদের টিম হবে এটা, কিন্তু পরে বুঝলাম, ছোটাছুটি আর বেশি পরিশ্রমের কাজগুলোর জন্যে ছেলেদের প্রয়োজন আছে, নইলে বড় দলের সঙ্গে জেতা কঠিন হয়ে যাবে।'

এতক্ষণে বুঝতে পারল মুসা, তার প্রতি মেয়েটা কেন আগ্রহী হয়েছে। দুর্বলতাটা কোথায় বুঝতে পেরে কাজে লেগে গেল সে, কথা আদায়ের এটাই সুযোগ। গুলি করতে গিয়ে কেঁপে উঠল হাত, ঝাঁকি খেয়ে ওপরে উঠে গেল পিস্তলের নল, ছাতে গিয়ে লাগল বল। ইচ্ছে করে করল এ কাজ। ঘুরে তাকাল মুসা। 'সরি, হাতটা হঠাৎ কেঁপে গেল।' রাগিয়ে দেয়ার জন্যে বলল, 'কিন্তু মেয়েদের দলে ঢুকতে যাব কেন? গেলে স্পেস কমাণ্ডোর মত টিমে যাওয়া উচিত। নীল ওডিমারের সঙ্গে কথা বলতে পারি...'

রেগে গেল মারশা, 'হ্যাঁ, যাও! কত নেয়ার জন্যে বসে আছে তোমার মত আনাড়িকে! পটাতে পারলে বাড়ি করার জন্যে লোনও দিয়ে দিতে পারে!'

'পেইন্টবলের সঙ্গে বাড়ি করার লোনের কি সম্পর্ক?' বুঝতে পারছে না মুসা।

'কি আবার। বুঝতে পারছি ওডিমার কি করে জানো না। কোস্টাল ম্যারিন ব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট।'

ছয়

'ওডিমার ব্যাংকে কাজ করে?' বিস্মিত হয়েছে মুসা। 'হুঁ, ব্যাপার তাহলে এই!' বলেই জিভ কাটল। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে।

কথাটা ধরে ফেলল মারশা, 'কিসের ব্যাপার?' পরক্ষণেই উজ্জ্বল হয়ে গেল চেহারা। 'ও, বুঝেছি, কোন কেসে কাজ করছ, যার সঙ্গে ওডিমারের সম্পর্ক আছে! ভাল, আর না বলে পারবে না আমাকে! জলদি বলো ঘটনাটা কি?'

বোকা হয়ে মারশার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। নিজেকে লাথি মারতে ইচ্ছে করছে। কিছু একটা বলতেই হবে মেয়েটাকে, অন্তত মুখ বন্ধ রাখার জন্যে হলেও। 'বলতে রাজি আছি, তবে এ ব্যাপারে কাউকে একটা বর্ণও বলবে না, কথা দিতে হবে।'

'দিলাম। শুধু তাই না, আমার সাহায্য চাইলে তা-ও পাবে। আর

টেনশনে না রেখে এবার বলে ফেলো দয়া করে।'

সংক্ষেপে সব জানাল মুসা।

চুপচাপ শুনল মারশা। একটি প্রশ্নও করল না, বাগড়া দিল না। মুসার কথা শেষ হলে খসখস করে একটা কাগজে ফোন নম্বর লিখে তাকে দিয়ে বলল, 'এই নাও। দরকার হলেই ফোন করবে।'

'থ্যাংকস।' বলে সিঁড়ির দিকে রওনা হলো মুসা।

'মুসা?'

ফিরে তাকাল মুসা। 'কি?'

'টিমের কথাটা ভেবে দেখো।'

'আচ্ছা।'

বাড়িতে ফিরেই আগে কিশোরকে ফোন করল মুসা।

ওডিমার কি করে শুনে চুপ হয়ে গেল কিশোর। কল্পনায় তাকে নিচের ঠোঁটে ঘনঘন চিমটি কাটতে দেখতে পাচ্ছে মুসা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে গোয়েন্দাপ্রধান।

অবশেষে টেলিফোনে ভেসে এল তার কণ্ঠ, 'মীটিঙে বসতে হবে আমাদের। আলোচনা করে ঠিক করব কি করা যায়। আজ সন্ধ্যায়ই এসো না?'

'আজ পারব বলে মনে হয় না। মা একজায়গায় পাঠাবে বলেছে।'

'যাওয়ার সময়ই নাহয় হয়ে যাও। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেব। রবিনকেও খবর দিয়ো।'

সুতরাং সন্ধ্যায় হেডকোয়ার্টারে মীটিঙে বসল তিন গোয়েন্দা। রবিনেরও কাজ আছে। যে কোম্পানিটায় পার্ট-টাইম কাজ করে সে, সেটার বস্ মিস্টার বার্টলেট লজ যেতে বলেছেন। নিশ্চয় কোন জরুরী কাজ দেবেন।

দ্রুত আলোচনা সারার জন্যে শুরুতেই কাজের কথায় চলে এল কিশোর, 'দুটো কাজ করতে হবে আমাদের। নীল ওডিমারের সম্পর্কে আরও খোঁজখবর করা, এবং তার সঙ্গে কথা বলা। মুসা, চমৎকার ভাবে কথা আদায় করে এনেছ মারশার কাছ থেকে। তোমাকে তার দরকার। সুযোগটা কাজে লাগাতে পারো ইচ্ছে করলে।'

টেবিলে রাখা কাগজের দিকে তাকাল গোয়েন্দাপ্রধান। নোট করে রেখেছে। মুখ তুলে আচমকা বলল, 'এই, তোমাদের কাজগুলো সারতে কতক্ষণ লাগবে?'

'কেন?' মুসা আর রবিন দু-জনেই অবাক হলো, একসঙ্গে প্রশ্ন করল।

'ওডিমারের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতাম,' বলল কিশোর। 'যে ফীল্ডে ডাকাতির কথা শোনা গেছে, সেখানে ব্যাংকের একজন ভাইস প্রেসিডেন্টের পেইন্টবল খেলাটা বেশি কাকতালীয় লাগছে না? মনে হচ্ছে না ডাকাতির সঙ্গে তারও একটা যোগাযোগ থাকতে পারে?'

'আমার কাজ সারতে দেরি হবে না,' মুসা জানাল। রবিনের দিকে তাকাল, 'তোমার?'

'লজ যাচ্ছেন বেড়াতে। কি কাজ দিয়ে যাবেন বুঝতে পারছি না। না দিয়ে গেলে আসতে পারব। আগামী বিষ্যুৎবার পর্যন্ত তাহলে ছুটি।'

'রবিন,' কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'আংকেল আজ রাতে বাড়ি থাকবেন? তাঁর কাছ থেকে তথ্য পাওয়া যেতে পারে।' আংকেল মানে রবিনের বাবার কথা বলছে ও, খবরের কাগজে চাকরি করেন তিনি।

'থাকবে।' উঠে দাঁড়াল রবিন। 'যাই। কাজ না থাকলে চলে আসব।'

'দেরি হলে অন্তত একটা ফোন কোরো। আমি আছি।'

মুসা আর রবিন দু-জনেই বেরিয়ে গেল।

হেডকোয়ার্টারে বসে বসে ভাবতে লাগল কিশোর।

মুসার ফিরতে দেরি হলো না। ভাগ্য ভাল, যার খোঁজে গিয়েছিল, তাকে পেয়ে গেল। ফলে আধঘন্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারল সে।

নিজের গাড়িটাতে চড়ার ভরসা করতে পারল না কিশোর। চাকার অ্যালাইনমেন্ট আর এগজস্টের অবস্থা খারাপ। তাই মুসার গাড়িতে করে রবিনদের বাড়িতে চলল।

'নীল ওডিমার?' কিশোরের প্রশ্ন শুনে ভ্রূকুটি করলেন রবিনের বাবা মিস্টার মিলফোর্ড। কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। 'কোস্টাল ম্যারিন সম্পর্কে একটা প্রেস রিলিজ পেয়েছি, বলা হয়েছে, দিন কয়েক আগে প্রমোশন দেয়া হয়েছে তাকে। বোসো, দুটো ফোন করে আসি।'

কয়েক মিনিট পর ফিরে এলেন তিনি। 'ব্যাংকে ওডিমারের খুব সুনাম, রীতিমত স্টার হয়ে গেছে। এত অল্প বয়েসে এত বড় পোস্ট ওই ব্যাংকে আর কেউ পায়নি। ব্যাংকের তরফ থেকে নতুন নতুন ব্যবসা নাকি খুলতে আরম্ভ করেছে সে। অনেকেরই পছন্দ হচ্ছে না সেটা। বলছে, এর মধ্যে ঘাপলা থাকতে পারে। যারা বলছে, তারা সবাই অবশ্য তার শত্রু।'

এর বেশি কিছু জানাতে পারলেন না মিস্টার মিলফোর্ড। তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে আবার হেডকোয়ার্টারে ফিরল দুই গোয়েন্দা। ইয়ার্ডে ঢুকতেই দেখে, রবিন এসে বসে আছে। হাসিমুখে খবর দিল, 'আগামী বিষ্যুৎবার পর্যন্ত ছুটি।'

নীল ওডিমার সম্পর্কে যা যা জেনে এসেছে রবিনকে জানাল কিশোর।

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'তাহলে এই লোককে তো আর ডাকাত ভাবা যাচ্ছে না।'

'কাল সকালেই সেটা বোঝা যাবে। তাড়াতাড়ি চলে এসো।'

মুসার গাড়িতে করে কোস্টাল ম্যারিন ব্যাংকে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। এখন রাশ আওয়ার, রাস্তায় যানবাহনের খুব ভিড়, গতি বাড়াতে পারছে না মুসা। ব্যাংকে পৌঁছতে সময় লাগল।

মেইন ব্যাংকিং ফ্লোরে ওডিমারের অফিস। সুতরাং তার সেক্রেটারিকে পাকড়াও করতে অসুবিধে হলো না কিশোরের।

খুব ভদ্র করে বিনীত গলায় বলল সে, 'মিস্টার ওডিমারের সঙ্গে কথা বলতে চাই, প্লীজ।'

কড়া চোখে তিন কিশোরের দিকে তাকাল মাঝবয়েসী মহিলা। 'কার রেফারেন্সে এসেছ?'

'কারও রেফারেন্সে নয়। ব্যাপারটা তাঁর ব্যক্তিগত। পেইন্টবল খেলার ব্যাপারে একটা জরুরী খবর তাঁকে দিতে হবে।'

কিশোরের মুখের দিকে পুরো দশ সেকেণ্ড একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল মহিলা। তারপর ইন্টারকমের দিকে হাত বাড়াল।

কিন্তু বোতাম টেপার আগেই খুলে গেল পেছনের দরজা। বেরিয়ে এল নীল ওডিমার। 'আমি আর ডি-র সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি, নতুন ব্যবসাটার ব্যাপারে,' সেক্রেটারিকে বলতে বলতেই চোখ পড়ল গোয়েন্দাদের ওপর। থমকে গেল। চিনতে পেরেছে চোখ দেখেই বোঝা যায়। তাড়াতাড়ি মহিলার পাশ কাটানোর সময় বলল, 'ফিরতে দেরি হবে আমার, ক্যারোলিন। কখন আসব বলতে পারছি না।'

'মিস্টার ওডিমার...' শুরু করল কিশোর।

কিন্তু দাঁড়াল না ব্যাংকার। চলে গেল।

ছেলেদের দিকে তাকিয়ে যেন দুঃখই হলো মহিলার, বলল, 'শুনলে তো কি বললেন? এক কাজ কোরো বরং, বিকেলে একটা ফোন কোরো আমাকে। দেখি দেখা করানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

ব্যাংক থেকে বেরিয়ে কিশোর বলল, 'ওডিমারকে কেমন নার্ভাস মনে হলো না?'

'হলো,' রবিন বলল। 'আমাদের দেখেই ভয় পেয়ে পালাল। কি এমন করলাম আমরা?'

মুসা বলল, 'আজ বিকেলেই সেটা জানতে পারব।'

বিকেলে ফোন না করে সরাসরি ব্যাংকে চলে এল আবার তিন গোয়েন্দা। ওদের দেখে মাথা নাড়তে লাগল মহিলা, 'সরি, হলো না। একটা ফোন করলে পারতে, তাহলে আর আসা লাগত না। ফিরেছিলেন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেলেন আবার। খুব জরুরী কোন কাজ।'

'আমাদের কথাটাও জরুরী,' কিশোর বলল। 'কিছু মনে না করলে তাঁর বাড়ির নম্বরটা যদি দেন?'

'না। সেটা ব্যাংকের নীতি বিরুদ্ধ। কোন কর্মচারীর বাড়ির নম্বর দেয়ার আমাদের নিয়ম নেই।'

'কাল দেখা করা যাবে?'

'বোধহয় না,' কিশোরের চোখের দিকে আর তাকাতে পারছে না মহিলা, অস্বস্তি বোধ করছে। কাটানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'আসলে, পুরো হপ্তাটাই বুক হয়ে আছে। নতুন কোন অ্যাপয়েন্টমেন্ট আর দিতে পারছি না।'

শক্ত হয়ে একটার ওপর আরেকটা চেপে বসল কিশোরের ঠোঁট। 'ও। ঠিক আছে। পরে ফোন করব আপনাকে। চলি।'

বাইরে বেরোতেই বলে উঠল মুসা, 'ঘটনাটা কি?'

'আসলে খুব ভদ্রভাবে আমাদের তাড়ানো হলো,' তিক্তকণ্ঠে বলল

কিশোর। 'ওরা আমাদের ছাগল পেয়েছে, ভেবেছে ছাইভস্ম যা বলবে বিশ্বাস করব।'

দু-আঙুলে চুটকি বাজাল মুসা, 'জানার একটা সহজ উপায় আছে। এসো।' গাড়ির দিকে না গিয়ে দু-জনকে নিয়ে পার্কিং লটের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল সে। চলে এল অফিসের গণ্যমান্যদের গাড়ি রাখার জন্যে যে জায়গাটা রিজার্ভ রাখা হয় সেখানে।

মার্সিডিজ ছাড়া আর কোন গাড়িই নেই সেখানে। তবে একটার রঙ কেবল কালচে-সবুজ। পার্কিং স্পেসগুলোতে চারকোণা ফলক লাগিয়ে নাম লিখে ঠিক করে দেয়া হয়েছে কোনটা কার জায়গা, যাতে গাড়ি রাখতে গিয়ে ঝামেলা না বাধে। নীল ওডিমারের নাম দেখে বিস্মিত হলো না ওরা।

'তারমানে মিথ্যে বলেছে, বেরিয়ে যায়নি ওডিমার,' রবিন বলল। 'অপেক্ষা করতে পারি আমরা। এক সময় না এক সময় বেরোবেই অফিস থেকে। তখন ধরব।'

'ধরলে যাতে এড়াতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করব,' হাসছে মুসা। 'আটঘাট বেঁধে তৈরি হয়ে থাকি।'

বুদ্ধি খুলে গেছে যেন আজ মুসার। কাছের একটা ফোন বুদে এসে পকেট থেকে মারশার লিখে দেয়া ফোন নম্বরটা বের করে তাকে ফোন করল। 'মারশা? মুসা আমান···হ্যাঁ, ভাল। গোয়েন্দাগিরি সত্যি করতে চাও?' ওপাশের কথা শুনে দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে মাথা ঝাঁকাল। 'মারশা, শোনো, কিছু জিনিস দরকার আমাদের। একমাত্র তুমিই ওগুলো ধার দিয়ে সাহায্য করতে পারো।'

কি জিনিস চায় জানাল সে। মারশা দিতে রাজি হলে বলল, যত দ্রুত সম্ভব গিয়ে নিয়ে আসবে। তারপর হাঁ হয়ে থাকা দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'প্রথমে একটা আর্মি-নেভি স্টোরে থামব। তারপর যাব মারশাদের বাড়ি।'

মহাখুশি মুসা। কিশোর পাশাকেও কৌতূহলী করে ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছে, যেমন করে সে ওদেরকে প্রায়ই রাখে।

ব্যাংকিং আওয়ার শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসেই রইল ওরা। এক এক করে বেরিয়ে গেল বেশির ভাগ গাড়ি। তারপর শেষ হলো বিজনেস আওয়ার, ক্লার্ক আর ব্যাংকের নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীরা বেরিয়ে গেল। রিজার্ভ এরিয়ায় এখনও অনেক গাড়ি রয়েছে, ওডিমারেরটা সহ।

দশ মিনিট পেরোল। রবিন বলল, 'ভুল করছি না তো আমরা? এমনও তো হতে পারে, অন্য গাড়িতে করে ওডিমার চলে গেছে। তার গাড়িটা মেরামত করে এনে এখানে রেখে গেছে ভেগাবল।'

'দেরি করছে বলে বলছ তো?' কিশোর বলল, 'বড় অফিসারেরা কখনও কাঁটায় কাঁটায় ঘড়ি ধরে বেরোয় না। দেরি করেই। নতুন প্রমোশন যারা পায় তারা তো আরও করে। কাজ না থাকলেও শুধু শুধু আটকে রাখে

অ্যাসিসটেন্টদের।'

কিশোরের কথাই ঠিক। আধঘন্টা পর দরজা খুলে দিল দারোয়ান, বেরিয়ে এল ওডিমার। নীল রঙের স্ট্রাইপ স্যুট পরনে, হাতে ব্রিফকেস। ক্যামোফ্লেজ পরা অবস্থায় তাকে লেগেছে কমাণ্ডো যোদ্ধার মত, এখন লাগছে ঠিক তার উল্টো, অতি নিরীহ একজন ভদ্রলোক।

'এসো,' বলে গিয়ে গাড়িতে উঠল মুসা। সে বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে, কিশোর ড্রাইভিং সীটে আর রবিন পেছনে।

স্টার্ট দিল কিশোর। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিতে লাফ দিয়ে এগোল গাড়ি, ছুটল পার্কিং লট ধরে। শাঁই করে স্টিয়ারিং ঘোরাল সে। চাকার আর্তনাদ তুলে ডানে ঘুরল গাড়ি। আড়াআড়ি এনে দাঁড় করিয়ে দিল ওডিমারের গাড়ির পেছনে।

গাড়ি বের করতে পারবে না ওডিমার। সামনে দেয়াল, পেছনে গাড়ি। কোন দিকেই জায়গা নেই আর। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল সে। রেগে গেছে। 'এ সব কি? খেপে গেছ...'

থমকে গেল সে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে কিশোর। মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল ওডিমার। তারপর আরও রেগে গিয়ে বলল, 'দেখো, কাজটা ঠিক করোনি!'

মুঠো পাকিয়ে দুই পা এগোল ওডিমার।

ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল কিশোর, গাড়িতে আরও দু-জন আছে। সাবধান করল।

দরজার দু-পাশ দিয়ে মাথা বের করল দুই সহকারী গোয়েন্দা। পরনে দুটো আনকোরা নতুন ক্যামোফ্লেজ শার্ট। দু-জনের হাতে মারশার দুটো পেইন্টগান, পুরোটা বের করল না, ওডিমারের চিনে ফেলার ভয়ে। নলের মুখ দুটো কেবল বের করে পেট সই করল।

এক পা পিছিয়ে গেল ওডিমার। অস্থির দৃষ্টি একবার সরছে পিস্তলের দিকে, আবার ব্যাংকের দরজার দিকে। হিসহিস করে বলল, 'পাগল নাকি! দেখো, জানালা দিয়ে দারোয়ান চেয়ে আছে। তোমাদের হাতে পিস্তল দেখলেই ভাববে ডাকাতি করতে এসেছ। পাঁচ সেকেণ্ডে পুলিশে ছেয়ে যাবে এখানটা।'

সাত

'ডাকাতি করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই, মিস্টার ওডিমার,' শান্তকণ্ঠে বলল কিশোর। 'আপনার কয়েকটা মিনিট সময় নষ্ট করতে চাই কেবল। প্রশ্ন করলে জবাব দেবেন?'

'দেব দেব! ওগুলো সরাও! পেলে কোথায় ওই ভয়ানক জিনিস?'

প্রশ্নের জবাব দিল না রবিন ও মুসা, তবে পিস্তল সরিয়ে নিল। হাঁপ ছাড়ল ওডিমার। কিশোরের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও? যদি ভেবে থাকো কমাণ্ডো অ্যাটাকের অভিনয় করে আমার মন জয় করে স্পেস কমাণ্ডোতে ঢুকবে, তাহলে দুঃসংবাদ আছে তোমাদের জন্যে। এ মাসের শেষ নাগাদ দল ভেঙে দেয়া হচ্ছে।'

'ভেঙে দেয়া হচ্ছে?' মুসা অবাক। 'কেন?'

মাথা নাড়ল ওডিমার, 'পেইন্টবল টিম চালানোর সময় আর আমার নেই। এখন আমি ভাইস-প্রেসিডেন্ট, অফিসের কাজ করেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। খেলতে যাব কখন? ওরকম একটা শিশুতোষ খেলা আমার ইমেজও নষ্ট করবে। তাই পেইন্টবল ছেড়ে গলফ ধরব। ওটা বড়দের খেলা।'

'আপনার ইমেজ আরও নষ্ট হবে, যদি আপনার ব্যাংকে একটা বড় ধরনের ডাকাতি হয়ে যায়,' কিশোর বলল।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে রইল ওডিমার। 'কি বলতে চাও?'

'আমার এই বন্ধুটি গত শনিবারে ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-তে খেলছিল,' মুসাকে দেখিয়ে বলল কিশোর। 'তখন একটা গোপন কথা শুনে ফেলেছে। মুসা, মিস্টার ওডিমারকে বলবে নাকি?'

বলতে শুরু করল মুসা, 'প্রথমবার খেলতে গিয়ে আমার সব বন্ধুরা যখন মারা গেল, আমি লুকিয়ে পড়লাম। কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল দু-জন লোক, ডাকাতির কথা বলল আমার সামনেই। লুকিয়ে ছিলাম যে দেখতে পায়নি।'

ব্যাংকারের মুখ থেকে রক্ত সরে যেতে দেখল কিশোর। জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বুঝলেন?'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল ওডিমার। 'নাহ্।' মুসাকে প্রশ্ন করল, 'লোকগুলোকে চিনতে পেরেছ?'

মাথা নাড়ল মুসা। 'শুধু পা দেখেছি। তা-ও নিচের অংশ। একজনের পরনে ছিল সাধারণ ক্যামোফ্লেজ, আরেকজনের রোডেশিয়ান ক্যামি…'

'আমি যেমন পরেছিলাম!' মুসার কথাটা শেষ করে দিল ওডিমার। অস্বস্তি বাড়ছে তার। 'কিন্তু ওই পোশাক আমি একাই পরিনি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আরও চারজন পরেছিল। টোনার নরম্যান, হেনরি ভেগাবল, জর্জ অ্যাণ্ডারসন আর আপনার টিমের আরেকজন।'

'জন রাসটি। স্পেস কমাণ্ডোর সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড সে। নৌবাহিনীতে ছিল, সার্জেন্ট। আমাদের ট্রেনিং দেয়ার জন্যে নিয়েছিলাম তাকে। একটা ভাল দল গড়ার খুব ইচ্ছে ছিল।'

'কিন্তু এখন ভেঙে দিচ্ছেন।'

'উপায় নেই। আমার কথা বাদ দিলেও সমস্যা আছে। দলের অন্যেরাও বিরক্ত হয়ে গেছে রাসটির ওপর। ওদের কেউ বড় ব্যবসায়ী, কেউ ম্যানেজার, কেউ কোন বড় অফিসার—বেশির ভাগই বড় বড় লোক, ট্রেনিঙের সময় রাসটির ব্যবহার ওদের পছন্দ নয়। নৌবাহিনীর সাধারণ নতুন রিক্রুটদের সঙ্গে

যে ব্যবহার করে এসেছে, এখানেও সেটা চালানোর চেষ্টা করেছিল। ওরা মানবে কেন?'

'সুতরাং আপনি সরে যাবেন বলার সঙ্গে সঙ্গে তারাও সুযোগ পেয়ে গেছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'আপনার বিরুদ্ধে রাসটির ক্ষোভ জন্মানো স্বাভাবিক। ব্যাংকে ডাকাতি করলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে—আপনার ওপর প্রতিশোধও নেয়া হলো, টাকাও পেল। জোরাল মোটিভ।'

'না, যতই রাগুক, এমন কাজ রাসটি অন্তত করবে না। লোক সে খারাপ নয়।' বলল বটে, কিন্তু ভঙ্গি দেখে মনে হলো না রাসটিকে সামান্যতম বিশ্বাস করে সে।

'এমনিতে সে কি কাজ করে? চলে কি করে? স্পেস কমাণ্ডোকে ট্রেনিং দিয়ে তো আর জীবিকা চলে না।'

'বারব্যাংকে একটা দোকান আছে। সামরিক বাহিনীর বাতিল জিনিসপত্র, ছুরি, জঙ্গলে টিকে থাকার জরুরী জিনিসপত্র, পেইন্টবল খেলার সরঞ্জাম, এ সব পাওয়া যায় দোকানটাতে।'

নোটবুক বের করে দোকানের নাম-ঠিকানা লিখে নিল রবিন।

ওডিমার বলল, 'দেখো, তোমাদের এই রূপকথার একটা অক্ষরও আমি বিশ্বাস করলাম না। তবে নতুন কিছু জানলে দয়া করে এসে জানাবে। কথা দিচ্ছ?'

'বিশ্বাসই যদি না করো তোমাকে জানানোর দরকার কি?' বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। বলল না। বরং 'ঠিক আছে, জানাব,' বলে গিয়ে গাড়িতে চড়ল। ওডিমারকেও গিয়ে তাড়াহুড়ো করে গাড়িতে ঢুকতে দেখল।

'লোকটার কিছু একটা হয়েছে,' আনমনে বিড়বিড় করল সে। এত অস্থিরতা কেন?

এবার ড্রাইভিং সীটে বসেছে মুসা। গাড়ি চালাতে চালাতে বলল, 'হয়তো ভেবেছে শয়তানি করে আমরা তার কাপড়ে রঙ ছিটিয়ে দিতে পারি। তাই পালিয়েছে।'

'কি জানি, পিস্তল চিনেছে বলে তো মনে হলো না। তাহলে অত ভয় পেত না। আমার মনে হয় প্রমোশনটা অস্থির করে তুলেছে তাকে,' কিশোর বলল। 'মুখে যতই না না করুক, ডাকাতির কথা শুনে ভয় পেয়েছে। শুনতেই চেহারাটা কেমন হয়ে গেল, দেখলে না? যেন বাড়ি পড়ল মাথায়। মুসা, কাল সকালে উঠে তোমার প্রথম কাজ হলো রাসটির দোকানে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করা।'

'আমাকে এতটা ভাগ্যবান বানিয়ে দেয়ার কারণ?'

'তোমাকে সত্যি সত্যি পেইন্টবল খেলোয়াড় মনে হয়। খেলার সরঞ্জাম কিনতে দোকানে ঢুকেছ বললে বিশ্বাস না করে পারবে না।'

'হুঁ, বুঝলাম।' বিড়বিড় করে কিছু বলল মুসা। বোঝা গেল একা একা যাওয়ার কথাটা ভাবতে তার ভাল লাগছে না।

পরদিন সকালে বারব্যাংক অ্যাভিনিয়্যুতে এনে গাড়ি রাখল মুসা। রাসটির দোকানটা থেকে এক ব্লক দূরে। বড় একটা সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে: রাসটি'জ শ্যাক, যার বাংলা করলে দাঁড়ায় রাসটির কুটির। লেখাটার দুই প্রান্তে বড় বড় করে নোঙর আঁকা, এককালে নৌবাহিনীতে ছিল যে, যেন সেটাই জাহির করার জন্যে।

ভেতরে ঢুকে অসংখ্য সরু সরু গলি দেখতে পেল মুসা। বিচিত্র সব জিনিস সাজানো সে সব গলিতে, যেন একটা মেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমেরিকা এবং আরও ছয়টা দেশের সশস্ত্র বাহিনীর যত রকম পোশাক আছে, সবগুলোর নমুনা রাখা আছে ওখানে। আছে নানা রকম বড়শি, ছুরি, আধুনিক তীর-ধনুক, রাইফেলে লাগানোর টেলিস্কোপ।

দোকানের পেছন দিকের একটা গলিতে ঢুকে হেলমেট, উলের পোশাক, আর জঙ্গলে বাস করার জন্যে প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিস দেখতে পেল সে। এমন করে ফেলে রাখা হয়েছে, অযত্নই বলা চলে, মনে হলো সেলসম্যানও নেই এখানে। তারপর হঠাৎ করেই পোশাকের স্তূপের আড়াল থেকে মাথা তুলল একজন লোক, হাতে পিস্তল।

লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেল মুসা। তারপর চিনতে পারল লোকটাকে। জন রাসটি। হাতের পিস্তলটা বুলেট ছোঁড়ার অস্ত্র নয়, পেইন্টগান।

মুসার মতই রাসটিও অবাক হয়েছে। বলল, 'সরি! আমি ভেবেছিলাম দোকানে কেউ নেই।'

এই সময় কাউন্টারের পেছনে একটা দরজার ওপাশে শব্দ হলো। সেদিকে ঘুরে তাকাল রাসটি। তারপর মুসার দিকে ফিরে বলল, 'এক মিনিট, অ্যাঁ? দেখে আসি কে এল। বোধহয় কাস্টোমার।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যান। আগে ব্যবসা। আপনার পিস্তলটা কিন্তু দারুণ।'

'এটা একটা স্পেশাল কমপিটিশন মডেল। এই দেখো না, নতুন একটা স্কোপ লাগিয়েছি।' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে এগিয়ে এল এক পা, কাউন্টারে হাত রাখল। 'ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-তে দেখেছি তোমাকে, তাই না? নতুনদের মধ্যে ছিলে। মারশা যখন ফ্ল্যাগ নিয়ে দৌড়াচ্ছিল, তাকে কভার দিয়েছিলে।'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল মুসা। 'হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছেন।'

রাসটি হাসল। 'দাঁড়াও, আসছি, এক সেকেণ্ড। ও দাঁড়িয়ে আছে।'

পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। সামনের দিকের আরেকটা দরজা খুলে গেল। যাকে দেখল, এই সময় তাকে এখানে দেখতে পাবে কল্পনাই করেনি মুসা। হাসিমুখে চিৎকার করে উঠল মারশা, 'হাল্লো, মুসা! তুমি এখানে কি করছ? পিস্তল কিনতে এসেছ নাকি?'

মুসাও হাসল। 'না, তুমি যেগুলো দিয়েছ, যথেষ্ট। কাজ হয়ে গেছে।'

'ইস্, আমি থাকতে পারলাম না। এতই জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছিল কাল বিকেলে...যাক, দেখা হয়ে ভালই হলো।'

'তুমি কেন এসেছ?'

হাসল মারশা। 'পেইন্টবল খেলোয়াড়দের রোজ অন্তত একবার ঢুঁ মেরে যেতেই হয় রাসটির দোকানে। খেলার সরঞ্জাম সব পাওয়া যায় এখানে। পিস্তল মেরামতে তার জুড়ি নেই। মেজাজ ভাল থাকলে দু-একটা পরামর্শও পাওয়া যায়, পেইন্টবল খেলার ব্যাপারে তার পরামর্শ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। পেইন্টবলের বিশেষজ্ঞ সে। কত লোক যে শুধু কায়দা-কানুন শেখার জন্যে তেল মাখে তাকে। চমৎকার একটা ব্যক্তিগত ফায়ারিং রেঞ্জও আছে তার।'

কাস্টোমার বিদেয় করে ফিরে এল রাসটি। 'আরি, তুমিও এসেছ। মুসাকে দেখিয়ে হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে নতুন আরেকজন রিক্রুট পেয়ে গেলাম।'

'আমি তাকে আগে জোগাড় করেছি,' মারশা বলল। 'কেড়ে নিতে চান?'

হেসে ফেলল রাসটি। 'ও, দখল করে ফেলেছ। ভাল খেলবে কিন্তু ছেলেটা।'

এই সরাসরি প্রশংসায় লজ্জা পেল মুসা।

রাসটি বলল, 'দখল আর করব কি? আমাকেই এখন জায়গা খুঁজতে হবে। স্পেস কমাণ্ডো ভেঙে দিচ্ছে ওডিমার।'

'তা কি করে হয়! এত ভাল একটা দল…এত কষ্ট করে গড়লেন। আপনি কিছু বললেন না?'

'কি বলব? দলটা তো আর আমার নয়। আমি কেবল ট্রেনার ছিলাম। কতগুলো কলম-পেষা দুদু খাওয়া বুড়ো খোকাকে বোঝানো আমার সাধ্যের বাইরে। ট্রেনিং দিতে গেলে কড়া হতেই হয়, এটা সহ্য হচ্ছিল না ওদের। করতে গেলাম ভাল, হয়ে গেল উল্টো। আমাকে খেদানোর তাল করেছে।'

'আশ্চর্য!'

মুখ বাঁকাল রাসটি। 'প্রমোশন হওয়ার পর ওডিমার নিজেকে যে কি ভাবতে আরম্ভ করেছে, যেন ব্যাংকের মালিক হয়ে বসেছে সে। হাতে ধরে ধরে তাকে, তার দলের লোককে খেলা শিখিয়েছি আমি। আমাকেই এখন কাঁচকলা দেখায়।'

'এই ট্রেনিং নিশ্চয় আর কোন কাজে লাগবে না কারও,' সুযোগ পেয়ে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করল মুসা। হালকা স্বরে যেন কথার কথা বলছে, এমনি ভঙ্গিতে বলতে গেল, 'যেমন এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে একটা ব্যাংক ডাকাতি করে ফেলল…'

'থামো!' ধমকে উঠল রাসটি। চুপ করে থাকল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর বলল, 'তোমাকে আর দোষ দেব কি? পেইন্টবল খেলোয়াড়দের সম্পর্কে অনেকেরই এ রকম ধারণা। যেন এটা শিখলেই চরিত্র শেষ, স্বভাব খারাপ হয়ে যাবে, চুরি-ডাকাতি শুরু করবে লোকে। ওসব যারা করে, তারা আলাদা জিনিস। এটা একটা খেলা, আর সব খেলার মতই। মানুষকে আমি খেলা শেখাই, শুধুই খেলা, আনন্দ পাওয়ার জন্যে; ব্যাংক ডাকাতির ট্রেনিং

দিই না, মনে রেখো কথাটা।' শেষ দিকে রাগের সঙ্গে যেন খানিকটা অভিমানও ঝরে পড়ল ভূতপূর্ব সার্জেন্টের কণ্ঠ থেকে।

'সরি, কিছু ভেবে বলিনি কথাটা,' লজ্জিত হয়ে বলল মুসা। কেটে পড়তে চাইছে এখন। 'একটা জরুরী কাজ আছে। পরে দেখা করব।' রাসটির রাগ পড়লে আবার এসে কথা বলার চেষ্টা করা যাবে, ভাবল সে। 'মারশা, চলি। দেখা হবে।'

মাথা ঝাঁকাল মারশা।

দোকান থেকে, বিশেষ করে রাসটির দৃষ্টির সামনে থেকে প্রায় ছুটে সরে গেল মুসা। দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে চাপল। রওনা হলো স্যালভিজ ইয়ার্ডে।

ইয়ার্ডে পৌঁছে, তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওঅর্কশপে ঢুকে দেখল কিশোর আর রবিনের সঙ্গে জিনাও বসে আছে। মুসাকে দেখেই বলে উঠল সে, 'কি জেনে এলে?'

'জেনে এলাম মানে?'

'রাসটির ওখানে গিয়েছিলে তো, কিশোরের কাছে শুনলাম। তা কি জেনে এলে...'

মুসা 'উফ্' করে উঠতেই থেমে গেল সে। পেছন দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ, 'সর্বনাশ! মেরে ফেলা হয়েছে তোমাকে!'

আট

চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'পেইন্টবল! গুলি করেছে তোমার পিঠে!'

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার বদলে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে গেল মুসার 'মৃত' শরীর। বন্দুকের গুলির মত ছিটকে বেরোল খোলা দরজা দিয়ে। 'ওই তো ব্যাটা! জেব্রাটার কাছে ঘাপটি মেরে ছিল!'

শুধু পুরানো আর বাতিল মালই নয়, জন্তু-জানোয়ারের ব্যবসাও করেন কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। গোটা পঁচিশেক জানোয়ার সারি দিয়ে রাখা হয়েছে জঞ্জালের স্তূপের পাশে। তবে এগুলো জ্যান্ত জানোয়ার নয়, বন থেকে সদ্য ধরে আনা হয়নি, সব কাঠের তৈরি। একটা নাগরদোলা ভেঙে পড়েছিল, বাতিল জিনিসগুলো বিক্রি করে দিয়েছে পার্ক কর্তৃপক্ষ। সুতরাং সে-সব জিনিস রাশেদ পাশা ছাড়া আর কে কিনবে?

কাঠের জানোয়ারগুলোর আড়ালে একটা ছায়ামূর্তিকে লুকিয়ে পড়তে দেখল মুসা। সেদিকে দৌড় দিল সে। পেছনে ছুটে এল কিশোর, রবিন আর জিনা।

পুরানো একটা কাঠের বাড়িকে ভেঙে এনে স্তূপ করে রাখা হয়েছে এক জায়গায়, সেটার ওপাশে চলে গেল মূর্তিটা। ওটার কাছে যেতেই আড়াল

থেকে ছুটে এল কাঠের আড়ার একটা মোটা কাঠ। ঝট করে মাথা নুইয়ে ফেলল মুসা। নইলে মাথায়ই লাগত। তাড়াহুড়ো করে আর এগোতে সাহস করল না। লোকটা বেপরোয়া। স্তূপের ওপাশে যাওয়ার জন্যে সাবধানে পা টিপে টিপে এগোল সে, এতে খানিকটা সময় পেয়ে গেল লোকটা।

পায়ের শব্দ শোনা যেতে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'কিশোর, গেট! গেট আটকাও!'

দেরি করে ফেলেছে ওরা। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট নিল। টায়ারের কর্কশ আর্তনাদ তুলে মোড় নিল গাড়িটা। গেটের দিকে দৌড় দিল মুসা। চোখ পড়ল কিশোরের কালো এসকর্টটার দিকে, গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। চিৎকার করে বলল সে, 'কিশোর, চাবি! জলদি!'

পকেট থেকে চাবি বের করে ছুঁড়ে দিল কিশোর।

লুফে নিল মুসা। একটানে দরজা খুলে উঠে পড়ল ড্রাইভিং সীটে। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গীয়ার দিতে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গাড়ি। বিকট শব্দে টায়ার ফাটল।

দুলে উঠল গাড়ি। ঘুরে গেল নাক। সামলাতে হিমশিম খেয়ে গেল মুসা। স্টিয়ারিং চেপে ধরে কোনমতে সোজা করল গাড়িটাকে, এই সময় ফাটল আরেকটা টায়ার।

'হায় হায়রে, আমার গাড়িটা শেষ!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল মুসা, মরিয়া হয়ে ব্রেক পেডালে চাপ দিতে লাগল। দেখতে পাচ্ছে দ্রুত এগিয়ে আসছে স্যালভিজ ইয়ার্ডের বেড়া।

চোখ বুজতে চাইল, কিন্তু সম্মোহন করে ফেলেছে যেন তাকে বেড়াটা।

সোজা বেড়া ভেদ করে ঢুকে পড়ল এসকর্ট। ভেঙে চুরচুর হলো উইণ্ডশীল্ড। গুঁতো মারল পুরানো বাড়ি ভেঙে আনা মার্বেলের একটা স্তম্ভে। দুলে উঠল ওটা, ভেঙে খসে গেল ওপরের অংশ, আর পড়বি তো পড় একেবারে গাড়ির ছাতে। হুডটাকে ভর্তা বানাল স্তম্ভের বাকি অংশটা।

দৌড়ে এল কিশোররা। বিস্ময়কর ভাবে বেঁচে গেল মুসা, গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। কিশোর, রবিন আর জিনা মিলে গাড়ি থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করল তাকে।

থরথর করে কাঁপছে জিনা। কথা বলতে পারছে না। ও ভেবেছিল, মুসা শেষ।

এসকর্টের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। সর্বনাশ হয়ে গেছে গাড়িটার। বাঁকাচোরা শরীরের পাশ দিয়ে বেকায়দা ভঙিতে বেরিয়ে আছে সামনের চাকা। অ্যাক্সেল ভেঙে গেছে।

'আমার গাড়ি!' বিড়বিড় করতে লাগল সে, 'কত মাস ধরে টাকা জমিয়ে কিনলাম! আমার হবে না, কোনদিনই হবে না! কত চেষ্টা করে কিনি, দু-দিনও চালাতে পারি না, ধ্বংস হয়ে যায়! কেন এমন হয়?'

'গাড়ির ব্যাপারে তোমার ভাগ্যই খারাপ,' রবিন বলল। 'কিছু কিছু মানুষ আছে, যাদের বেলায় কিছু জিনিস সয় না। যত ভাল জিনিসই দেয়া যাক

তাদের, সেটা টিকবে না। যাবেই যাবে, কোন না কোনভাবে। যাই হোক, গাড়িটার সঙ্গে মুসাও যে মারা পড়েনি সেটা আমাদের ভাগ্য।'

শূন্য দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকাল কিশোর।

রাস্তা থেকে একটা জিনিস কুড়িয়ে নিল জিনা। 'অ্যাই দেখো, এটা ছুঁড়েছিল শয়তানটা।'

এক ফুট লম্বা একটা কাঠের টুকরো তার হাতে। অতি সাধারণ একটা লাঠি, কিন্তু তাতে তিন সারি লোহার কাঁটা বসিয়ে ভয়ানক অস্ত্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে, গাড়ির চাকার জন্যে। যে কোন গাড়ির চাকা মুহূর্তে ফাঁসিয়ে দিতে যথেষ্ট।

'এগুলোকে বলে ক্যালট্রপ,' কিশোর বলল। 'ওই দেখো, আরও আছে। সরানো দরকার। নইলে আরও গাড়ির সর্বনাশ হবে।'

রাস্তা থেকে ক্যালট্রপগুলো সরিয়ে ফেলল ওরা। তারপর অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে ইয়ার্ডের ভেতরে নিয়ে এল গাড়িটা। বেড়ার ফোকরে কাঠ লাগিয়ে ভাঙাটা মেরামত করে দিতে লাগল।

হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে আর মনে মনে গাড়িটার জন্যে আফসোস করছে কিশোর। শেষে মনকে বোঝাল, দুঃখ করলে তো আর ফেরত আসবে না। তার চেয়ে যে কাজটা বেশি জরুরী—কেসের সমাধান—সেইটাই করা উচিত।

'একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করেছ?' মুসাকে বলল সে, 'তোমাকে যে গুলি করল, কোন শব্দ শোনা যায়নি কিন্তু।'

ঝট করে মাথা সোজা করল মুসা। 'তাই তো! প্রথম দিন যখন খেলতে গেলাম, তোমাদের গুলি করে মেরে ফেলল, তখনও কিন্তু শব্দ শোনা যায়নি!'

'ঠিক,' তুড়ি বাজাল জিনা। 'আজকেও তাই হলো, শব্দ ছিল না।'

'শব্দ নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে কে করল কাজটা সেটা নিয়ে ভাবা উচিত,' রবিন বলল। 'রাসটির দোকানে গেল মুসা। তাকে ডাকাতির কথা জিজ্ঞেস করল। তারপর ইয়ার্ডে ফিরেই গুলি খেল।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'ভাল কথা বলেছ। চলো আবার রাসটির দোকানে গিয়ে খোঁজ নিই, মুসা বেরিয়ে আসার পরের সময়টা সে কোথায় ছিল?'

মুসার গাড়িতে চড়ে বারব্যাংকে রওনা হলো ওরা।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রাসটি। ওরা নামতেই হেসে স্বাগত জানাল, 'পুরো একঝাঁক কাস্টোমার, এসো এসো। কি মনে করে?'

'কয়েকটা প্রশ্নের জবাব চাই,' খড়খড়ে গলায় বলল কিশোর। 'আপনার সঙ্গে কথা বলে বাড়ি যাওয়ার পর পরই এই অবস্থা করা হয়েছে ওর,' মুসাকে দেখিয়ে বলল সে। 'মুসা, ঘোরো, দেখাও।'

মুসার শার্টে লেগে থাকা রঙের দিকে তাকিয়ে রইল রাসটি। কিশোর কি বলতে চাইছে বুঝে লাল হয়ে গেল মুখ। 'তুমি ভাবছ আমি করেছি? তোমার বন্ধুর কথায় রেগে গিয়ে? লোকের কথায় কান দিয়ে এ রকম যখন তখন রেগে

গেলে প্রতি পাঁচ মিনিটে একজনকে গুলি করতে হত আমাকে। ব্যবসা আর করা লাগত না।'

চোখ জ্বলছে রাসটির। 'দেখো, রাগ আমারও হয়। তবে আমার প্রতিশোধটা অন্য রকম। বেশি রেগে গেলে, বেয়াদবি মনে হলে ঘুসি মেরে বত্রিশটা দাঁত ফেলে দেব। চোরের মত পেছন পেছন গিয়ে রঙ মেরে আসব না।'

'তাহলে বলুন আধঘন্টা আগে কোথায় ছিলেন?' জানতে চাইল রবিন।

রেগে উঠল রাসটি, 'এখানেই!'

'কি প্রমাণ আছে?'

'আমি,' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

একটা গলি থেকে বেরিয়ে এল মারশা। হাতে একগাদা সান হেলমেট।

ঢোক গিলল মুসা।

'আমার টিমের জন্যে জিনিসপত্র কিনতে এসেছি আমি,' মারশা বলল। 'আমাকে সাহায্য করছিল রাসটি। একটা মিনিটের জন্যে আমার কাছ থেকে সরেনি।'

কিছুটা লজ্জিত হয়েই রাসটির দিকে তাকাল কিশোর, রাগ এখনও পড়েনি ভূতপূর্ব সার্জেন্টের। 'একটা কথা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে। মুসাকে গুলি করার সময় শব্দ হয়নি। কেন বলতে পারেন?'

চোখ সরু সরু হয়ে এল রাসটির। 'শব্দ হয়নি? এ ব্যাপারে একটি লোকই বলতে পারে তোমাকে, হেনরি ভেগাবল...'

চোখ যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসবে মারশার, 'একটু আগেই তো গেল এখান থেকে!' মুসার দিকে তাকাল, 'তুমি বেরোনোর পর পরই ঢুকল। একটা পরামর্শের জন্যে এসেছিল রাসটির কাছে। বেরিয়ে গেল তাড়াহুড়ো করে। আমার মনে হয় তোমাকে চিনতে পেরেছিল।'

'তাহলে কি সে-ই মুসার পিছু নিয়ে ইয়ার্ডে গিয়েছিল?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল কিশোর।

'কিন্তু গুলি করবে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

'সেটা তাকেই জিজ্ঞেস করা দরকার।'

মারশা বলল, 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। নেবে?'

দ্বিধা করতে লাগল মুসা। কিশোরের দিকে তাকাল। আলতো মাথা ঝাঁকাল গোয়েন্দাপ্রধান। দ্বিধা চলে গেল মুসার। মারশার দিকে ফিরল, 'চলো।'

হেনরি ভেগাবলের গ্যারেজে এল ওরা। সামনের চত্বরে কেউ নেই। দুই বার হর্ন টিপল কিশোর। ভেতর থেকে নেকড়ায় হাত মুছতে মুছতে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ভেগাবল।

'আপনার কাজে মুগ্ধ হয়ে গিয়ে আমার গাড়ির সঙ্গে তার গাড়িটা বদল করে ফেলেছে আমার বন্ধু,' মুসার গাড়িটা দেখিয়ে কৈফিয়ত দিল কিশোর।

কিশোরের গাড়িটা কি অবস্থায় পড়ে আছে এখন ভেবে দম আটকে এল

রবিনের।

'এটা চালাতে ভালই লাগছে,' আবার বলল কিশোর। 'আপনি কি একবার দেখবেন, জিনিসটা কেমন?'

হুড তুলল ভেগাবল। ইঞ্জিন পরীক্ষা করতে লাগল নীরবে। তার পাশে দাঁড়িয়ে রইল কিশোর।

নিঃশব্দে ওখান থেকে সরে গিয়ে ঘরে ঢুকল রবিন। অফিসের দিকে গিয়ে সময় নষ্ট করল না, কোথায় দেখতে হবে জানা আছে।

বাড়ির পেছনের ধাতব দরজাটার কাছে চলে এল। এখন খোলাই আছে। ভেতরে উঁকি দিল সে। ছোট ঘর। দেয়ালে রঙ লেগে আছে। একধারের দেয়ালে ছোট একটা দেয়াল আলমারি বসানো। পাল্লা খোলা। তাকগুলোতে নানা রকম টুলস, কাজের যন্ত্রপাতি। নিচে একটা কাজ করার টেবিল। তাতে একটা পেইন্টগান রাখা, নলের মাথায় আরেকটা নলের মত জিনিস লাগানো।

সিনেমায় পিস্তলের মাথায় সাইলেন্সার লাগাতে দেখেছে সে। এই জিনিসটাও সাইলেন্সারের মত, তবে আরেকটু বড়।

'এখানে কি করছ?' ধমকে উঠল একটা কণ্ঠ।

চমকে গিয়ে ঘুরে তাকাল রবিন।

রাগত গলায় ভেগাবল বলল, 'বাথরুম খুঁজছ বলবে না! ও কথা বলা হয়ে গেছে একবার! আর বোকা বনছি না!' পুরু গোঁফের নিচে পাতলা ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট চেপে বসেছে।

পেছনে এসে দাঁড়াল মুসা, কিশোর, মারশা আর জিনা। ইঞ্জিন থেকে হঠাৎ মাথা তুলে ভেগাবলকে বাড়ির দিকে এগোতে দেখেই পিছু নিয়েছিল ওরা।

শব্দ শুনে ফিরে তাকাল মেকানিক। জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি বলো তো? আমার পেছনে লেগেছ কেন?'

'একই প্রশ্ন তো আমাদেরও,' কিশোর বলল। 'আপনি মুসার পেছনে লেগেছেন কেন? মুসা, পিঠ দেখাও।'

চুপ করে মুসার শার্টের রঙের দিকে তাকিয়ে রইল ভেগাবল।

কিশোর বলল, 'ঘণ্টাখানেক আগে তাকে পেইন্টগান দিয়ে গুলি করা হয়েছে। গানটার কোন শব্দ হয় না।'

'আমি গুলি করেছি ভাবছ?' ছোট ঘরটাতে ঢুকল ভেগাবল। 'কোনভাবে তোমরা জেনেছ আমি সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল ব্যবহার করি,' ভেগাবল বলল। 'তাই আমার ওপর দোষ চাপাতে এসেছ।' এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল সে। 'তোমাদের ভুল আমি ভেঙে দিচ্ছি।'

এক থাবায় টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে নিশানা করল সে।

লাফ দিয়ে সরে গেল মুসা। পেইন্টগানের গুলিতে মানুষ মরে না, তবে চোখে লাগলে সর্বনাশ।

কিন্তু তাকে নিশানা করেনি ভেগাবল। করেছে দেয়ালে। বল বেরোনোর শব্দ খুবই কম হলো, কিন্তু একেবারে নিঃশব্দ নয়। মৃদু ফুট করে উঠল, শব্দটা সবাই শুনতে পেল।

তিক্ত হাসি হেসে পিস্তলটা টেবিলে নামিয়ে রাখল ভেগাবল। 'শব্দ কম হয়, তবে একেবারেই হয় না তা নয়।'

'হ্যাঁ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর। 'মুসাকে যেটা দিয়ে গুলি করা হয়েছে, সেটা একেবারেই শব্দ করে না। ব্যাটলগ্রাউণ্ডে আমাদের মেরেছিল যেটা দিয়ে, সেটাও শব্দহীন।'

'ও, তোমাদেরও করেছে? কয়েক মাস ধরেই বিরক্ত করছে আমাদের, জ্বালিয়ে মারছে। ওই ফিল্ডে যারা খেলেছে কেউ রেহাই পায়নি তার হাত থেকে। সে-জন্যেই একটা সাইলেন্সার বানানোর চেষ্টা করছি আমি, বোকা বানিয়ে তাকে ফাঁদে ফেলে ধরার জন্যে।'

'লোকটা কে আন্দাজও করতে পারেন না?'

'না। সবাই সবার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে উঠছে। একটা ব্যাপার অবশ্য লক্ষ করেছি, বুশ লেপার্ডদের কেউ কখনও ওই নীরব বন্দুকের শিকার হয় না। তারমানে ওটা ওদের কারও কাছেই আছে। কার কাছে, জানি না। প্রমাণও করতে পারব না ওদেরই কেউ গুলি করে। সে-জন্যে চাইছি এক এক করে ওদেরকে আমি গুলি করব, যার কাছে আছে জিনিসটা সে অবাক হবে, চমকেও যেতে পারে, তখন তাকে ধরব।'

'এক্সকিউজ মি, মিস্টার ভেগাবল,' দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে একজন মোটা লোক। পাতলা চুল, অতিরিক্ত চওড়া টাই বেঁধেছে গলায়। গোয়েন্দাদের ওপর চোখ বুলিয়ে আবার তাকাল মেকানিকের দিকে, 'খুব ব্যস্ত?' জবাবের আশায় না থেকে বলল, 'পার্টসটা হয়ে গেছে।'

যাওয়ার জন্যে লোকটা ঘুরতেই ভেগাবল ডাকল, 'এক মিনিট, হোজার। আমি যে গত দেড়টি ঘন্টা তোমার সঙ্গে বসে কাজ করেছি, এই গ্যারেজ ছেড়ে নড়িনি, দয়া করে এই ছেলেগুলোকে বলবে?'

অবাক হলো হোজার। কি ঘটছে বুঝতে পারল না। তবে বলল, 'এক মিনিটের জন্যেও গ্যারেজ থেকে বেরোননি মিস্টার ভেগাবল। একটা পার্টস বানিয়েছি দু-জনে বসে।'

'থ্যাংকিউ, হোজার।'

বিস্ময় কাটল না হোজারের। কোন প্রশ্ন না করে বেরিয়ে গেল।

ভেগাবলকে আর সন্দেহ করতে পারল না গোয়েন্দারা। দেড় ঘণ্টা ধরে যদি এখানেই থেকে থাকে ভেগাবল, তাহলে ইয়ার্ডে যেতে পারেনি, মুসাকে গুলিও করেনি।

হোজার যে মিথ্যে বলেনি, সেটা তার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছে কিশোর। বলল, 'মিস্টার ভেগাবল, যাই। কে এই শয়তানী করছে জানতে পারলে অবশ্যই জানাব আপনাকে।'

যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল সে।

ভেগাবল ডাকল, 'দাঁড়াও। তোমার বন্ধুর গাড়িটা যে দেখে দিয়েছি তার ফি দেবে না?' খসখস করে কাগজে একটা বিল লিখে দিল মেকানিক।

টাকার অঙ্কের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর।

অন্য সময় হলে মুচকি হাসত মুসা আর রবিন। এখন হাসল না, কিশোরের গাড়িটার কথা ভেবে।

ইয়ার্ডে ফিরে এল গোয়েন্দারা।

রবিন বলল, 'সন্দেহের তালিকা থেকে দু-জন বাদ, ভেগাবল এবং রাসটি। ওডিমারের সঙ্গে কে কথা বলবে?'

'আমি বলব,' জিনা বলল। তার মনে হলো, হাত গুটিয়ে বসে না থেকে কিছু একটা করা দরকার। ফোন করল কোস্টাল মেরিন ব্যাংকে। ওডিমারকে চাইল। জানা গেল, লাঞ্চে গেছে ওডিমার। কোথা থেকে করেছে জানতে চাওয়া হলে বানিয়ে একটা নাম বলে দিয়ে, পরে আবার ফোন করবে বলে রিসিভার রেখে দিল। বন্ধুদের জানাল, 'দুপুরের আগে থেকেই গায়েব। ব্যাংকের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লাঞ্চে গেছে।'

'হুঁ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। 'গোড়া থেকে দেখা যাক, কি কি জেনেছি আমরা। ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-তে রোডেশিয়ান ক্যামি পরেছিল টোনার নরম্যান, হেনরি ভেগাবল, নীল ওডিমার, জন রাসটি এবং জর্জ অ্যানডারসন। ভেগাবল, রাসটি আর ওডিমারকে সন্দেহ থেকে বাদ দিতে হচ্ছে, জোরাল অ্যালিবাই রয়েছে তাদের।'

'কিসের সন্দেহ?' মুসার প্রশ্ন।

'তোমার পিঠে কে বল ছুঁড়েছে,' জবাবটা দিল রবিন। 'বনের মধ্যে সেদিন রোডেশিয়ান ক্যামি পরেছিল যে লোকটা, সে-ও গুলি করে থাকতে পারে তোমাকে। তাকে চিনে বের করতে পারলে তার সঙ্গীকেও পাওয়া যাবে।'

'খাইছে! কি করে চিনবে? লোক তো কম ছিল না সেদিন মাঠে...'

'সবার ব্যাপারে খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ সবার পরনে রোডেশিয়ান ক্যামি ছিল না। ছিল পাঁচজনের পরনে। অকাজটা ওদেরই কেউ করেছে। রোডসকেও সন্দেহ করা যেতে পারে। রবিবার দিন তার আচরণ আমার ভাল লাগেনি। কেমন অদ্ভুত আচরণ করেছিল লোকটা।'

'আরে দূর, কি বলো? রোডস ব্যাংক ডাকাতি করবে না। সে পুলিশের

লোক।'

'কতদিন পুলিশ থাকবে বলা যায় না,' বলল মারশা। 'ওর অনেক বদনাম শুনেছি। অনেকেই বলেছে বেশিদিন আর ওই চাকরিতে থাকতে পারবে না। সহকর্মীরা দেখতে পারে না। এমনও হতে পারে ডাকাতির পরিকল্পনাটা তারই, প্রচুর টাকা জোগাড় করে একটা প্রাইভেট সিকিউরিটি টিম গড়বে।'

'তারপরেও তাকে ডাকাত বলতে বাধছে আমার,' মুসার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'তবে বলা যায় না কিছুই। পুলিশের মধ্যেও খারাপ লোক থাকে।'

'টোনারকে কেমন মনে হয় তোমার?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'ভাল না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'কুচুটে ধরনের। কিন্তু কে চোর কে ভাল শুধু চেহারা আর আচরণ দেখে বলা মুশকিল।'

'তার অ্যালিবাইটা দেখা হলো না। মুসা যখন গুলি খেল, তখন সে কোথায় ছিল জানা দরকার।' ফোনের দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেল রবিন, 'কোথায় কাজ করে জানব কি করে?'

'আমি জানি,' মারশা বলল। 'আমার বাবার অফিসে চাকরি করে, অ্যাকাউনটেন্ট।' হ্যাণ্ডব্যাগ হাতড়ে একটা দোমড়ানো কার্ড বের করল সে। লাল রঙ লেগে আছে তাতে।

'এই অবস্থা করে কার্ড দেয় মানুষকে,' হাসল কিশোর।

'না, একটা রঙের বল ফেটেছিল এটার ওপর। আমার টেবিলে।' ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল মারশা, 'হায় হায়, সর্বনাশ! একখানে যাওয়ার কথা। দেরি করে ফেললাম।' উঠে দাঁড়াল সে, 'তোমরা গোয়েন্দাগিরি করতে থাকো। খবর-টবর জানিয়ো আমাকে।'

হাতে নিয়ে কার্ডটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'ভাবছি টোনারের অফিসে ঢুকব কি করে? ডেলিভারি বয়ের ছদ্মবেশে যাওয়া যায়, কিন্তু আমি পারব না, আমাকে চেনে সে।' রবিনের দিকে তাকাল, 'কি করা যায় বলো তো?'

আলোচনা চালাল ওরা।

পনেরো মিনিট পর গাড়িতে করে টোনারের অফিসে রওনা হলো তিন গোয়েন্দা। জিনা আর থাকতে পারেনি, মা বলে দিয়েছেন তাড়াতাড়ি যেতে, কাজ আছে, তাই চলে গেছে সে।

পথে একটা স্ন্যাকস শপে থেমে কিছু খাবার কিনল কিশোর। ব্যাগটা এনে দিল রবিনকে।

ঠিকানা দেখে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামাল মুসা। ইন করে প্যান্ট পরেছে রবিন, নিচের অংশটা প্যান্টের ভেতর থেকে টেনে বের করল। আঙুল চালিয়ে এলোমেলো করে দিল চুল। খাবারের ব্যাগটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে হবে মনে আছে তো?'

মাথা কাত করে রবিন বলল, 'আছে। কফি আর ডোনাট সরবরাহ করতে হবে টোনারকে।'

অফিসে ঢুকল সে। এগিয়ে গেল ডেস্কের ওপাশে বসা এক মহিলার দিকে। কি জন্যে এসেছে জানাল। অবাক হয়ে গেল মহিলা। 'কফি! এ সময়ে তো কফি খান না মিস্টার নরম্যান!'

হাত নেড়ে নিরাশার ভঙ্গি করল রবিন। 'আমি কি করে জানব সেটা? দোকানের ম্যানেজার আসতে বলল, নিয়ে এসেছি।'

'দেখি, দাঁড়াও,' উঠে গিয়ে একটা ঘরের দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল রিসিপশনিস্ট মহিলা। 'মিস্টার নরম্যান?···কই, নেই তো। গেলেন কোথায়?'

মহিলার পেছন পেছন অফিসে ঢুকল রবিন। সাবধানে হাত সরিয়ে আনল ব্যাগের নিচ থেকে ওপর দিকে। 'খাবারের দামটা দেবে কে? টাকা দরকার। ম্যানেজার নিয়ে যেতে বলেছে।'

মহিলার অলক্ষে তরল কফির প্লাস্টিক প্যাকেটে খোঁচা মারল রবিন। ঠুস করে ফেটে গেল ওটা। কাগজের ব্যাগ ভিজে ছিঁড়ে কফি ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে।

'ইসসি, দিলাম তো সর্বনাশ করে!'

'দেখি, দাঁড়াও,' ছুটে বেরিয়ে গেল মহিলা, মোছার জন্যে ন্যাকড়া আনতে।

কয়েক মিনিট ঘরে একা থাকার সুযোগ পেয়ে গেল রবিন।

এসে দাঁড়াল টোনারের টেবিলের সামনে, ডেস্ক ক্যালেণ্ডারটা দেখার জন্যে। লাঞ্চের দাওয়াত পেয়েছে অ্যাকাউনটেন্ট, ভুলে যাওয়ার ভয়ে লিখে রেখেছে। সত্যি যদি দাওয়াতে গিয়ে থাকে সে, তাহলে মুসাকে গুলি করার সময় পায়নি।

দ্রুত সারা ঘরে চোখ বোলাল রবিন। সাধারণত যা থাকে একজন অ্যাকাউনটেন্টের অফিসে, তাই আছে—ফাইলপত্র, ট্যাক্সের আইন-কানুনের বই, ক্যালকুলেটর, সব। তবে ফাইল ফোল্ডারের নিচে চাপা দেয়া এমন কিছু বই আর পত্রিকা পাওয়া গেল যা হিসাব-রক্ষকের কাজকর্মের সঙ্গে মেলে না। দুটো বইয়ের নাম দেখল সে—সিকিউরিটি টু-ডে, আর করপোরেট কাউন্টার এসপিওনাজ। শিকার ও বন্দুকের ওপর লেখা কয়েকটা ম্যাগাজিন, সেনাবাহিনীর ট্রেনিঙ সম্পর্কে কিছু পুস্তিকাও আছে।

একটা বইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে একটুকরো ভাঁজ করা কাগজ, বোধহয় কোন অধ্যায়ের চিহ্ন দিয়ে রাখা হয়েছে। বই খুলে দেখল সে। অধ্যায়টার হেডিং পড়ল। চুরি করে কি ভাবে শত্রু এলাকায় ঢোকা যায়, তার ওপরে লেখা।

ভাঁজ করা কাগজটাও খুলে দেখল সে। একটা নকশা আঁকা রয়েছে পেন্সিল দিয়ে।

সময় খুব কম। যে কোন মুহূর্তে চলে আসতে পারে মহিলা। টেবিলে নকশাটা বিছিয়ে পকেট থেকে ছোট পকেট রেডিওর আকারের একটা জিনিস

বের করল। কিশোর দিয়েছে এটা। নিজের হাতে বানিয়েছে, একটা পকেট ফটোকপিয়ার। পাঁচটা বিভিন্ন বাতিল মাল থেকে পার্টস খুলে নিয়ে তৈরি করেছে জিনিসটা।

কাজ করলেই হয় এখন, ভাবল রবিন। খুদে মেশিনের কাঁচের চোখটা ধরল কাগজের ওপর। সুইচ টিপতেই একটা আলো জ্বলে উঠল, মৃদু গুঞ্জন করে রেকর্ড হয়ে গেল নকশার ছবি।

যন্ত্রটা পকেটে রেখে কাগজটা ভাঁজ করে আবার বইয়ে ঢুকিয়ে বন্ধ করে রেখে দিল আগের মত। সবে সরে এসে দাঁড়িয়েছে কফি যেখানে পড়েছে সেখানটায়, এই সময় ঘরে ঢুকল মহিলা।

'আছ এখনও,' বলল সে। 'শোনো, মিস্টার নরম্যানের সঙ্গে দেখা হয়েছে, হলরুমে আছেন তিনি। কফির অর্ডার নাকি দেননি।'

'তবে কি ম্যানেজার ভুল শুনেছেন? অন্য কেউ কফি চেয়েছিল? কি জানি। দিন কাপড়টা,' হাত বাড়াল রবিন, 'মুছে দিই।'

তাড়াতাড়ি মেঝে মুছে, ন্যাকড়াটা ওয়েস্টবাস্কেটে ফেলে, মহিলাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে, ডোনাটের ছেঁড়া ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এল।

হাসিমুখে বাড়িটা থেকে বেরোল রবিন। টোনারের সঙ্গে দেখা হয়নি, মুসাকে গুলি করার সময় কোথায় ছিল—সত্যি সত্যি লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল কিনা, সেটাও জানা হয়নি; তবে অফিসে ঢোকাটা ব্যর্থ হয়নি। আরেকটা কাজ করে আসতে পেরেছে।

'কাজ হলো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হ্যাঁ,' গাড়িতে উঠে বসে পকেট থেকে কপিয়ারটা বের করে দিল রবিন। 'নাও। প্রিন্ট করে দেখলেই চমকে যাবে।'

দশ

হেডকোয়ার্টারে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। নকশাটা দেখে মানে বের করার চেষ্টা করছে।

'এই যে আঁকাবাঁকা লাইন দুটো,' নকশায় আঙুল রেখে বলল রবিন, 'এ দুটো দিয়ে হয় নদী, নয়তো রাস্তা বুঝিয়েছে।'

'আর এই গিঁটটা দিয়ে বুঝিয়েছে এখানে পুকুর বা ডোবা আছে, যেখানে পানি এসে জমা হয়। কিংবা খাঁড়ি,' কিশোর বলল। দুটো ত্রিভুজে টোকা দিয়ে বলল, 'এগুলো পাহাড়। তাহলে দুটো পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী পেয়ে গেলাম আমরা।'

'বাকি থাকল বড় এই প্রায় চারকোণা জায়গাটা,' বলল মুসা, 'আর এই যে ভেতরের তিনটে খুদে বর্গক্ষেত্র।' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিড়বিড় করল, 'চেনা চেনা লাগছে।' মুখ তুলে তাকাল হঠাৎ। 'কোথায় দেখলাম? আচ্ছা, ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-র তিনটে ছাউনি নয় তো?'

'হুম্‌ম্‌!' কাগজটা নিজের দিকে আরেকটু টেনে নিয়ে নকশার দিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে শুরু করল কিশোর। 'ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-র পাহাড়গুলো এত উঁচু নয়। কোন খাঁড়ি বা নদীও নেই ওখানে। কিন্তু পাহাড় আর ছাউনির অবস্থানের সঙ্গে মিল আছে অনেক। কিন্তু কেন…?' নকশার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কুঁচকে গেল ভুরু। তারপর উজ্জ্বল হলো চোখ। 'আসল জায়গাটার নকল নয় তো!'

'প্র্যাকটিস করার জন্যে, বলতে চাইছ? ডাকাতির মহড়া?'

'ঠিক। তাই হবে।' চারটে রেখার মাথায় চারটে তীর চিহ্ন আঁকা, সেগুলো দেখিয়ে রবিন বলল, 'এই রেখাগুলো দেখো, মনে হয় চারকোণা এই জায়গাটায় যাওয়ার পথ। ছাউনিগুলোকে এড়িয়ে গেছে।'

'নিরাপদে এখানে ঢোকার জন্যে,' কিশোর বলল। 'এই চারকোণা জায়গাটা দিয়ে কোন বিল্ডিং বোঝাতে চেয়েছে।' নকশার নিচে ইংরেজিতে লেখা নোটটা পড়ল সে:

First op.

F-Sec.

মুখ তুলে প্রশ্ন করল, 'মানে কি এর?'

'অপ দিয়ে হয়তো অপারেশন বুঝিয়েছে,' মুসা বলল। 'মিলিটারি মিলিটারি গন্ধ পাচ্ছি। আর এফ সেক দিয়ে বুঝিয়েছে এফ-সেকশন।'

'কিংবা ফার্স্ট সেকশন,' বলল রবিন।

'সেকশন মানে বিভাগ। তাহলে কিসের প্রথম বিভাগ?' আবার প্রশ্ন করল কিশোর।

'তা কি করে বলব!'

'তারমানে কিছুই বুঝলাম না। জায়গাটা খুঁজে বের করতে পারলে হয়তো বুঝতে পারতাম। একটা পাহাড় হতে হবে দু-শো বিশ ফুট উঁচু, আরেকটা তিনশো দশ, এই যে এখানে যা লেখা আছে। মাঝখানে একটা নদী থাকতে হবে, যার কোন একটা জায়গায় খাঁড়ি আছে।'

'তা তো আছে,' মুখ বাঁকাল রবিন। 'কিন্তু খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার চেয়েও কঠিন হবে সেটা। লস অ্যাঞ্জেলেসটা তো আর ছোট নয়, পাহাড়-পর্বতেরও অভাব নেই। চারশো পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকা থেকে কি করে খুঁজে বের করব আসল জায়গাটা?'

সেদিন এবং পরদিনের বেশির ভাগ সময় নকশাটা নিয়ে গবেষণা করে কাটাল ওরা। ম্যাপ দেখে দেখে লস অ্যাঞ্জেলেসের শহরতলির অনেক জায়গা বাতিল করে দিল কিশোর, তারপরেও প্রচুর বুনো আর পাহাড়ী এলাকা রয়ে গেল আশেপাশে। শুধু সান্তা মনিকা ও স্যান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালায়ই পাহাড়, নদী আর গিরিপথের বহর দেখে মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়।

আতশ কাঁচ দিয়ে ম্যাপ দেখতে দেখতে গুঙিয়ে উঠল কিশোর, 'নাহ্‌, কোথাও কিছু দেখছি না!'

'উফ্‌, সাড়ে ছ'টা বাজে!' বলল রবিন। 'সেই কখন থেকে ম্যাপ নিয়ে

পড়ে আছি. টোপাঙ্গা ক্যানিয়নও পেরোতে পারলাম না এখনও। এই হারে চলতে থাকলে ডাকাত আর ধরা লাগবে না। আমরা খোঁজে পাওয়ার আগেই কাজ সেরে পগাড় পার।'

হাই তুলল মুসা। আড়মোড়া ভাঙল। চোখ ডলে ডলে লাল করে ফেলল। বাইরে থেকে যখন ডাক শোনা গেল. লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। বেরোনোর একটা সুযোগ পেয়ে লুফে নিল সেটা।

জিনা ডাকছে। মুসাকে দেখেই বলে উঠল. 'কি ব্যাপার? কাঁদছিলে নাকি? চোখ লাল কেন?'

'একসঙ্গে ক'টা প্রশ্ন করলে?'

'করছিলে কি. সেটা শুনি আগে?'

'ম্যাপ দেখছিলাম। ডাকাতেরা কোথায় ডাকাতি করবে. সেই ম্যাপ।'

'মানে?'

'এসো ভেতরে. তাহলেই বুঝবে।'

জিনাকে নিয়ে আবার ট্রেলারে ঢুকল মুসা।

'ও. সবারই দেখি এক অবস্থা.' জিনা বলল। 'ঘটনাটা কি?'

টৌনারের অফিস থেকে কি ভাবে নকশাটা এনেছে খুলে বলল রবিন।

নকশাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জ্বলজ্বল করে উঠল জিনার চোখ। 'শোনো. বললে বিশ্বাস করবে না. আমি বোধহয় চিনতে পেরেছি জায়গাটা!'

কিশোরের হাত থেকে কাঁচটা খসে পড়ে গেল। 'কি বললে?'

কিশোরকে চমকে দিতে পেরে মনে মনে খুশি হলো জিনা। 'সিক্সথ গ্রেডে পড়ার সময় মিসেস হারবিংসন ম্যাপ আর নকশা আঁকা শেখাতেন আমাদের। আমি আর লিলি বেভারলি হিলের স্টারদের বাড়ির আশপাশের নকশা আঁকতাম। ডেভ হুফারের বাড়ির কাছে এ রকম জায়গা দেখেছি আমি। খাঁড়িটা অবিকল এই নকশার মত।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকা তিনজোড়া চোখের দিকে চেয়ে হাসল জিনা। 'জায়গাটা ঠিক বেভারলি হিলে নয়, আরেকটু উত্তরে। হুফারকে আমার পছন্দ। সেজন্যে মনে আছে। খুব ভাল রক গায়।'

'ওই হাঁদাটাকে তোমার পছন্দ!' ভুরু কোঁচকাল মুসা। 'দেখতে তো ডাকাতের মত লাগে, গান গাইতে গেলে মনে হয় ষাঁড়ের মত চেঁচায়...'

'গানের তুমি কি বুঝবে? খারাপ হলে তার অত ভক্ত কেন?'

'ও সব জানি না। তবে লোকটা যে একটা বলদ, তাতে কোন সন্দেহ নেই...'

রেগে উঠতে যাচ্ছে জিনা। লেগে যাবে ঝগড়া। তাড়াতাড়ি থামানোর জন্যে কিশোর বলল, 'আমাদের নিয়ে যাবে সেখানে? কোনখানে, বলো তো?'

'বেনেডিক্ট ক্যানিয়ন ড্রাইভে, বেলা ড্রাইভের কাছাকাছি।' মনে করার চেষ্টা করতে গিয়ে কপাল কুঁচকে গেল জিনার, 'রাস্তার নামটা যেন কি? দূর,

মনে নেই। অনেক আগের কথা তো।'

ততক্ষণে ম্যাপ ওল্টাতে শুরু করে দিয়েছে কিশোর। আবার তুলে নিয়েছে আতশ কাঁচটা। 'বেনেডিক্ট ক্যানিয়ন ড্রাইভ,' বিড়বিড় করতে লাগল সে। 'গ্রীন একরস ড্রাইভ···ডেল রেসটো···বেভারলি এস্টেট···এই যে বেলো ড্রাইভ, সিয়েলো ছাড়িয়ে।' মুখ তুলে জিনার দিকে তাকাল, 'ঠিকই বলেছ। বেভারলি হিলসেই, তবে একেবারে শেষ মাথায়। অনেক জায়গা নিয়ে একেকটা বাড়ি।'

'যাক, অনেক সময় বাঁচল,' চেয়ারে শরীরটাকে টানটান করে দিল রবিন। 'ভাবছি বাড়িটাতে এখন কে থাকে? ডেভ হুকার বহু আগেই দেশে চলে গেছে।' জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তার বাড়ি সুইডেনে, জানো বোধহয়?'

মাথা নাড়ল জিনা, জানে না।

গায়কের গবেষণায় আগ্রহ নেই কিশোরের। 'কে কে যাবে আমার সঙ্গে? এখনই গিয়ে দেখতে চাই নকশার সঙ্গে জায়গাটা মেলে কিনা।'

'যদি মেলে?' মুসার প্রশ্ন।

'তাহলে যে বাস করে তাকে সাবধান করে দেব—ডাকাতের চোখ পড়েছে আপনার ওপর।'

বেভারলি হিলসের পথ ধরে যখন গাড়ি চালাল মুসা, তখন সন্ধ্যা নামছে। আঁকাবাঁকা কতগুলো পথের ভেতর দিয়ে যাওয়ার জন্যে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে কিশোর। একটা পাহাড়ের ভেতর অর্ধেক ঢুকে পড়েছে, হঠাৎ ম্যাপ থেকে মুখ তুলে চিৎকার করে উঠল কিশোর, 'থামো, থামো!'

ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল মুসা। সীট বেল্ট বাঁধা না থাকলে উইণ্ডশীল্ডে গিয়ে মাথা ঠুকে যেত কিশোরের।

পেছনের সীট থেকে আঁউ করে উঠল রবিন।

হাত তুলে দেখাল কিশোর। একটা ছোট উপত্যকা। বাঁকা হয়ে সরু নদী বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে একটা পাহাড়ের ধার ঘেঁষে। ওপাশে বেরিয়ে সোজা এগিয়েছে গিরিখাত ধরে।

নদীর ওপাশে বেড়া, তারপরে বিশাল এক বাড়ির সীমানা। কয়েক একর জায়গা নিয়ে বাগান।

'হ্যাঁ, এই বাড়িটাই,' জিনা বলল।

সামনের গেটটা দেখা যাচ্ছে। গার্ডহাউস আছে তিনটে। গেটের দিকে মুখ করা দুটো, আর তৃতীয়টা ড্রাইভওয়ের একটা বাঁকের মধ্যে।

'একেবারে ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-র নকল। কিংবা ব্যাটলগ্রাউণ্ডটা এটার অনুকরণে তৈরি,' কিশোর বলল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'তারমানে কোথায় ডাকাতি করতে আসবে জেনে গেলাম আমরা!'

'কার বাড়ি সেটা জানা দরকার এখন,' বলল রবিন।

'দেখি, জেনে আসি।' সঙ্গে আনা দূরবীনটা বের করে নিয়ে গাড়ি থেকে

নামল কিশোর। মলিন হয়ে আসছে গোধূলীর আলো। ইশারায় অন্য তিন গোয়েন্দাকে আসতে বলে পা বাড়াল বাড়িটার দিকে।

গাছপালায় ছাওয়া ঢাল বেয়ে নিচে নামল সে, নদীটা পেরোল, তারপর অন্য পাশের ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল বেড়ার দিকে।

পুরানো ধাঁচের লোহার গেটের কাছে এসে দূরবীনে চোখ লাগিয়ে বাড়ির দিকে তাকাল।

'অদ্ভুত কিছু ঘটছে মনে হয় গার্ডহাউসের কাছে,' বলল সে। 'একজন গার্ড আসছে।'

'কিশোর, ওরা এদিকে...' চিৎকার করে উঠল মুসা।

দেরি করে ফেলেছে। পেছনের ঝোপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দু-জন গার্ড। হাতে মেশিন-পিস্তল। এগুলো পেইন্টগান নয়, আসল অস্ত্র।

এগারো

'চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো!' আদেশ দিল দু-জনের মাঝে বিশালদেহী লোকটা। পিস্তল তাক করে রেখেছে গোয়েন্দাদের দিকে।

তাকিয়ে আছে কিশোর। ভাষা হারিয়ে ফেলেছে যেন।

গেটের ভেতর থেকে আরও গার্ড বেরিয়ে এল।

'কি দেখছিলে?' ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল বিশালদেহী লোকটা, সে-ই যে গার্ডদের সর্দার, হেডগার্ড, বোঝা গেল।

'দেখুন স্যার,' বিনীত স্বরে বলল কিশোর, 'আমরা একটা ক্লাব করেছি, ডেভ হুফার ফ্যান ক্লাব। আমরা তাঁর ভক্ত। কেমন জায়গায় থাকেন তিনি দেখতে এসেছি।'

ধীরে ধীরে নিচু হয়ে গেল উদ্যত পিস্তলের মুখ।

'এই ডেভ হুফারটা কে?' একজন গার্ড আরেকজনকে জিজ্ঞেস করল নিচু স্বরে।

'গান গাইত,' জবাব দিল একজন। 'বিদেশী। সম্ভবত স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বাড়ি চলে গেছে বহুদিন আগে।'

হেডগার্ড বলল কিশোরকে, 'দেখা তো হয়েছে। এবার যাও।'

'এত কষ্ট করে এলাম, অথচ জানতামই না তিনি আমেরিকায় নেই। বর্তমান মালিক যদি আমাদের আচরণে মাইণ্ড করে থাকেন, মাপ চাইব। দেখা করে মাপ চাওয়ার সুযোগ না দিলে চিঠিতে চাইব। দয়া করে তাঁর নামটা যদি বলেন...'

'মালিকের নাম ফাঁস করার জন্যে বেতন দিয়ে রাখেনি আমাদের। রাখা হয়েছে তোমাদের মত নাক গলানো স্বভাবের প্রাণীদের তাড়ানোর জন্যে। আর মাপ চাওয়ার প্রশ্ন আসছে কেন? তোমরা যে এসেছ এটাই তো জানেন

না সাহেব।' আঙুল তুলে ধমক দিল হেডগার্ড, 'যাও এখান থেকে!'

পাহাড় পার করে এনে গোয়েন্দাদের গাড়িতে তুলে দিল দু-জন গার্ড।

'ভাগ্য ভাল তোমাদের, আলো থাকতে থাকতে এসেছ,' হেডগার্ড বলল। 'অন্ধকার হলে কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়। গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢোকালেও কামড়ে কেটে নিত। বিশেষ ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওগুলোকে, যাতে চোর-ডাকাত দেখলে চিৎকার না করে। কামড়ে দেয়।'

'সত্যি?' দূরবীনে হাত বোলাচ্ছে কিশোর। 'তাহলে তো ভাগ্যই বলতে হবে আমাদের। একটা কথা, আমরা চোর-ডাকাত যে নই, দয়া করে বিশ্বাস করতে পারেন কথাটা।'

'না হলেই ভাল।'

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল মুসা। গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে চলল। পেছনে তাকিয়ে দেখল রবিন, এখনও দাঁড়িয়ে আছে দুই গার্ড। তাকিয়ে আছে এদিকে।

'একটা ব্যাপারে শিওর হওয়া গেল,' বলল রবিন, 'কোস্টাল ম্যারিন ব্যাংকে ডাকাতি হবে না। হবে এখানে। দেখলে না কি কড়া পাহারা বসিয়েছে। তার মানে বাড়ির মালিক ডাকাতির আশঙ্কা করছে।'

'অত টাকা থাকলে সব সময়ই ডাকাতির আশঙ্কা থাকে। দুর্গ বানিয়ে ফেলেছে,' আনমনে মন্তব্য করল কিশোর।

'নামও একটা রেখে দিতে পারি দুর্গটার,' জিনা বলল। 'ফোর্ট বেভারলি হিলস।'

'কিন্তু মালিকটা কে তা-ই জানা হলো না,' পথের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল মুসা।

'একটা তথ্য অবশ্য ফাঁস করে দিয়েছে হেডগার্ড,' কিশোর বলল, 'মালিক একজন পুরুষমানুষ, মহিলা নয়, তাহলে সাহেব বলত না।'

'আরও জানি,' বলল জিনা, 'প্রচুর টাকা আছে তার। নইলে এত বড় বাড়ির খরচ, এত লোকজন পুষতে পারত না। কিন্তু তার নাম জানব কি করে?'

মনে মনে সেই বুদ্ধি করে ফেলেছে কিশোর। মৃদু হেসে বলল, 'সেই কাজটা তোমাকেই করতে হবে, জিনা।'

কিশোরের পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন সকালে আবার বেভারলি হিলসে পৌঁছল মুসা আর জিনা। রহস্যময় বাড়িটার কাছে গাড়ি রাখল। পেছনের সীটে বসে কিশোরের দূরবীন চোখে লাগিয়ে দেখছে। জিনা বসে আছে ড্রাইভিং সীটে।

'আসছে,' মেইন রোড ধরে ছোট একটা ট্রাক আসতে দেখে বলল মুসা। সাদা রঙের গাড়িটার ছাত নীল রঙের, দরজা দুটো লাল। ডাক বিভাগের গাড়ি।

ইঞ্জিন স্টার্ট দিল জিনা। বাড়ির দিকে মোড় নিতে যাবে ট্রাকটা, এই সময় ওটার নাকের সামনে গাড়ি নিয়ে এল সে। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল ট্রাক। বাম্পারে বাম্পারে ঠোকর লাগল।

পেছনের সীটের পায়ের কাছে লুকিয়ে আছে মুসা। সামনের সীটের ফ্রেমে বাড়ি লাগল কাঁধ। ব্যথা পেয়ে চিৎকার করতে গিয়েও সামলে নিল। শুনতে পাচ্ছে জিনার কথা, 'এহ্হে, দিলাম তো লাগিয়ে! সরি!'

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' বলল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'ভাঙেনি কিছু।' জিনা মেয়ে বলেই রাগটা সামলে নিল সে. পুরুষ হলে অন্য রকম আচরণ করত। সেটা ভেবেই সহজে কাজ সারার জন্যে জিনাকে পাঠিয়েছে কিশোর।

'কিন্তু আপনার চিঠিপত্র তো সব ট্রাকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দাঁড়ান, গুছিয়ে দিই,' জিনা বলল।

কাজ সেরে, লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে এসে আবার গাড়িতে বসল জিনা। ফিরে চলল পাহাড়ী পথ ধরে। কিছুদূর এসে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'নাও, ওঠো।'

উঠে বসল মুসা। কাঁধ ডলতে ডলতে বলল, 'পেলে?'

'কাঁধে কি? ব্যথা পেয়েছ?' জবাবের অপেক্ষায় না থেকে হেসে বলল জিনা, 'পুরো এক বাণ্ডিল চিঠি। খামের ওপর ঠিকানায় নাম লেখা ওনিয়ন রীড।'

•

নাম জানা হয়েছে। এখন ভদ্রলোকের ব্যাপারে খোঁজখবর করতে হয়। রবিনকে পত্রিকা ঘাঁটতে পাঠাল কিশোর। বাবার অফিসে গিয়ে পুরানো খবরের কাগজের বাণ্ডিল ঘেঁটে এল রবিন। বেশি ঘাঁটতে হয়নি, কয়েকটা কাগজে বেভারলি হিলের খবর ঘাঁটতেই পেয়ে গেছে ওনিয়ন রীডের ব্যাপারে অনেক তথ্য। সেগুলো নোট করে নিয়ে ফিরে এল। হেডকোয়ার্টারে ঢুকে দেখে তার অপেক্ষায়ই বসে আছে জিনা, মুসা আর কিশোর।

'তারপর?' রবিনকে দেখেই জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'কিছু জানতে পারলে?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন। পকেট থেকে একপাতা কাগজ বের করল। নোট লিখে এনেছে। 'ওয়াল স্ট্রীটের জুয়াড়ি নাম দেয়া হয়েছে ভদ্রলোকের। বড় বড় ঝুঁকি নিয়ে বসেন। কখন কোন কোম্পানি লাল বাতি জ্বালে সেই অপেক্ষায় থাকেন। তারপর চুক্তি করে নিয়ে প্রচুর টাকা ধার দেন সেই কোম্পানিকে। কখনও লাভের অংশ চান, কখনও মালিকানার শেয়ার কিনে নেন। এই তো কিছুদিন আগে গোল্ডেন ডল নামে একটা খেলনা কোম্পানি ফতুর হয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে কোটি কোটি টাকা ধার দিলেন রীড। ছোট একটা কোম্পানি বিশাল আকারে আবার প্রোডাকশন শুরু করল। অল্প দিনের মধ্যেই লালে লাল।'

'ওদের একটা খেলনা ভালুক আমার কাছে আছে,' জিনা বলল।

'তারমানে বড় দানের জুয়াই খেলেন রীড,' কিশোর বলল। 'এত টাকা যখন করেছেন, নিশ্চয় জুয়ার ভাগ্য খুব ভাল। জেতেনই বেশি।'

'আর বেশি টাকার মালিক হলে অনেকেরই যা হয়,' রবিন বলল, 'মাথায় গড়বড় হয়ে যায়। আরেকটু ভদ্র করে বললে, খামখেয়ালি। কয়েক বছর ধরে

আছেন বেনেডিক্ট ক্যানিয়নের বাড়িটায়, একবারের জন্যেও বাড়ি ছেড়ে বাইরে কোথাও যাননি। জুয়া খেলতে পছন্দ করেন বলে একটা ঘরকে প্রাইভেট ক্যাসিনো বানিয়ে নিয়েছেন। যখনই ইচ্ছে করে লোকজনকে দাওয়াত করে জুয়ার পার্টি দেন।'

'দারুণ মজা তো,' বলল কিশোর।

'হ্যাঁ, ইন্টারেস্টিং,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'কিন্তু আমার যে হঠাৎ করে কাজ পড়ে গেল? নজ ফিরে এসেছেন। কাজে যেতে বলেছেন আমাকে। যাই। কি হয় না হয় জানিয়ো।'

মাথা কাত করল কিশোর, 'আচ্ছা।'

রবিন বেরিয়ে গেলে ফোনবুক টেনে নিল কিশোর। কিন্তু রীডের নামটা পেল না। আনলিসটেড কিনা জানার জন্যে ডিরেক্টরি অ্যাসিসট্যান্সকে ফোন করল।

'হ্যাঁ, আনলিসটেড,' রিসিভার রেখে দিয়ে বলল কিশোর, 'মুশকিল হয়ে গেল। টেলিফোনে সাবধান করতে পারব না রীডকে। চিঠি দিলে অনেক দেরি হবে পেতে। গার্ড আর কুত্তা পার হয়ে সামনাসামনি গিয়ে যে বলব, তারও উপায় দেখছি না।'

'কিন্তু কিছু একটা করা দরকার,' মুসা বলল। 'আমি শিওর, কাল রাতে আমার গাড়ির নম্বর রেখে দিয়েছে ব্যাটারা। পুলিশকে জানিয়ে রেখেছে। ডাকাতি হলে সোজা আমাদের কাছে আসবে পুলিশ। জেরা শুরু করবে। ভাববে আমরাও জড়িত। ডেভ হুফার ফ্যান ক্লাবের গুল মেরে তখন পার পাওয়া যাবে না।'

'কি আর হবে?' রসিকতা করল জিনা, 'বড়জোর জেলে যাবে। কখনও তো যাওনি। গিয়ে দেখো, নতুন একটা অভিজ্ঞতা হবে।...কিন্তু কথা হচ্ছে, দশ লাখ ডলার বাড়িতে ফেলে রাখবেন রীড? কেন?'

'রাখলে ক্ষতি কি? এই টাকা কোন টাকাই নয় তাঁর জন্যে,' জবাব দিল মুসা।

চিন্তা করছিল কিশোর, মুখ তুলে তাকাল, 'একটা মজার কথা জানো? কারও সাক্ষাৎ পেতে চাইলে বড়জোর পাঁচজন লোকের সাহায্য নিতে হয়। যত দুর্লভ লোকই হোক, তাকে ধরতে পাঁচজনের বেশি লাগে না। এখন পরিচিত এমন একজনকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের যার সঙ্গে খাতির আছে রীডের।'

কিন্তু ওনিয়ন রীডের কোন বন্ধু আছে বলেও মনে হলো না। দেড় ঘণ্টা ধরে বিভিন্ন ভাবে চেষ্টা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেল কিশোর। চেনা-জানা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়, পরিচিত, কাউকে আর বাদ রাখল না। বিরক্ত হয়ে শেষে ফোন রেখে দিয়ে বলল, 'ফালতু কথা। পাঁচজন দিয়ে কাজ হয় না।'

এই সময় ফোন বাজল।

রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতে রবিনের গলা ভেসে এল, 'কিশোর, এতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বলছিলে? চেষ্টা করতে করতে আঙুল ব্যথা হয়ে

গেল।' উত্তেজিত মনে হচ্ছে তাকে। 'শোনো, অফিসে এইমাত্র একটা কথা কানে এল, রীডের বাড়িতে কি ঘটছে আন্দাজ করা যায়। সস ডারবিন নামে একজন ড্রামার লজকে বলছিল রীডের বাড়িতে নাকি জুয়ার পার্টি আছে শনিবার রাতে, বাজাতে যেতে হবে। বড় বড় সব মানুষেরা থাকবেন পার্টিতে—সিনেমার লোক, ব্যবসায়ী, রক স্টার। জুয়া খেলার জন্যে নগদ টাকা দরকার হয়, তাই ব্যাংক্কে অনেক টাকা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন রীড...' চুপ হয়ে গেল সে।

'আরও কিছু বলবে মনে হচ্ছে?' কিশোরও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'ব্যাংকের নাম শুনলে চমকে যাবে। কোস্টাল মেরিন!'

উজ্জ্বল হয়ে গেল কিশোরের মুখ। 'তারমানে নীল ওডিমার! দাঁড়াও, এখনি যাব।'

এবার আর ব্যাংকে গিয়ে ওডিমারের সঙ্গে দেখা করতে বেগ পেতে হলো না কিশোর ও মুসাকে। তবে ওদের দেখে খুশিও হলো না ভাইস-প্রেসিডেন্ট। কিশোরের মুখে ডাকাতির কথা শুনে কেবল, 'অসম্ভব! অসম্ভব!' করতে লাগল। রুমাল দিয়ে বার বার কপালের ঘাম মুছছে।

'আমার ধারণা,' কিশোর বলছে, 'এজন্যেই গতবার খারাপ ব্যবহার করেছিলেন আমাদের সঙ্গে। ডাকাতির পরিকল্পনার কথা আমরা কতখানি জানি খুঁচিয়ে বের করতে চেয়েছিলেন আমাদের পেট থেকে।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ওডিমারের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বলল, 'এই ব্যাংকে বড় বড় মক্কেল যাদের অ্যাকাউন্ট আছে, আপনি সব জানেন। প্রমোশন হওয়ার পর রীডের অ্যাকাউন্ট দেখাশোনারও দায়িত্ব পড়েছে আপনার ওপর। দশ লাখ ডলার যে বের করে নিয়ে যাবেন রীড, এই কথাটাও কোনভাবে আপনিই প্রচার করেছেন। নইলে এত গোপন কথা ডাকাতেরা জানবে কি করে?'

ঘাবড়ে গেছে ওডিমার। মাথা ঝাঁকাল। স্বীকার না করে আর পারল না, 'হ্যাঁ, রীডের নতুন পার্সোন্যাল ব্যাংকার আমাকেই করা হয়েছে। তিন হপ্তা আগে আমাকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়ে রীড বলেছেন দশ লাখ ডলার তুলতে চান। অনেক টাকার ব্যাপার। আগে থেকে জানিয়ে না রাখলে হঠাৎ করে এত টাকা জোগাড় করতে পারে না ব্যাংক। শনিবার বন্ধ থাকবে, তাই আগামীকাল শুক্রবার সকালেই টাকাটা পাঠিয়ে দেব আমরা।' অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসল ব্যাংকার। তাতেও স্বস্তি না পেয়ে এদিক ওদিক ঘোরাল স্যুইভেল চেয়ারটা। 'মুখ ফসকে...আসলে গপ মারতে গিয়ে, কত কত টাকা আমি ঘাঁটি এটা বোঝানোর জন্যে পেইন্টবলের এক বন্ধুকে বলে ফেলেছিলাম দশ লাখ টাকার খবরটা।'

দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল সে। 'দশ লাখ ডলার ডাকাতি হবে, শুনে এসে যখন বললে তোমরা, কাঁপ ধরে গিয়েছিল আমার।'

'এখন তো সব শুনলেন,' কিশোর বলল। 'মিস্টার রীডকে সাবধান করে দেয়ার দায়িত্বটা কি আপনি নেবেন?'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল ওডিমার, 'না না, এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না মিস্টার রীডকে। ব্যাংকে পুলিশ আনতে চাই না।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গোয়েন্দারা।

মুসা জিজ্ঞেস করল, 'ভয় পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি। কোথায় কি শুনলাম, বলে বেড়াতে থাকলে আমার সুনাম আর এক বিন্দু থাকবে না। মিস্টার রীডকে হয়তো জানালাম, তিনি সাবধানও হলেন, তারপর যদি ডাকাতি না হয়? ছাগল ভাবা হবে আমাকে। ক্যারিয়ার শেষ।'

'আর যদি ডাকাতি হয়, তাহলেও দায় এড়াতে পারবে না ব্যাংক; আপনার সুনাম শেষ হবে, কারণ আপনি জেনেও আপনার মক্কেলকে সাবধান করেননি। চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে। ভুল যা করার করে ফেলেছেন, মিস্টার ওডিমার, আর পার পাচ্ছেন না আপনি। টাকার গল্প যেদিন করেছেন, সেদিনই নিজের সর্বনাশ ডেকে এনেছেন।' ডেস্কে হাতের ভর রেখে সামনে ঝুঁকল কিশোর। 'যাই হোক, কি করলে রীডের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'প্রমাণ হাতে পেলে,' অস্থির ভঙ্গিতে চেয়ারে হেলান দিল ওডিমার। 'সত্যি ডাকাতিটা হবে যদি প্রমাণ এনে দিতে পারো, ঠেকানোর ব্যবস্থা নেব আমি।'

মুসা বলল, 'কেন আমরা যে বললাম, তাতে বিশ্বাস হলো না···?'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ওডিমার বলল, 'তোমরা শোনা কথা বলেছ। এ কথা এখন ব্যাংকের প্রেসিডেন্টকে গিয়ে বললে হেসে উড়িয়ে দেবেন তিনি। আমাকেও গাধা মনে করবেন। রীডকে গিয়ে যদি বলি, তিনিও ভুরু কুঁচকে তাকাবেন আমার দিকে। ভাববেন, অত বড় দায়িত্বে একটা অযোগ্য লোককে বসানো হয়েছে কেন?'

'তাহলে অযোগ্য হয়েই ওই চেয়ারে বসে থাকুন,' রাগ সামলাতে না পেরে বলেই ফেলল মুসা।

'দেখো, ভদ্রভাবে কথা বলো! বুঝতে পারছ না কেন, রীড একজন জুয়াড়ি। ঝুঁকি নেয়া তাঁর অভ্যাস। ডাকাতির কথা শুনলে মনে মনে হয়তো হাসবেন। ভাববেন, ঝুঁকিটা নিয়েই দেখা যাক না কি হয়?'

'তারমানে মক্কেলের টাকা নিয়ে আপনিও জুয়া খেলতে চাইছেন?' প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল কিশোর।

রক্ত জমল ওডিমারের মুখে। 'অনেক হয়েছে। এবার আসতে পারো। আমার কাজ আছে। ডাকাতি হবেই, প্রমাণ পেলে এসো আমার কাছে। তার আগে আমি কিছু করতে পারব না।'

'আমরাও আর কিছু বলতে আসব না,' সাফ জবাব দিয়ে দিল কিশোর। 'খবরের কাগজে যখন বড় বড় করে নামটা ছাপা হবে আপনার, চামড়া ছিলবে পত্রিকাওলারা, নাকের সামনে এনে মেলে ধরব তখন।'

নীরবে অফিস থেকে বেরিয়ে এল দু-জনে। মুসার গাড়িতে উঠল।

'কিশোর, কি করা যায় বলো তো? ওই মেরুদণ্ডহীন লোকটাকে দিয়ে

কিছু হবে না।'

'তদন্ত চালিয়ে যাব। ওডিমার কিন্তু ঠিকই বলেছে। প্রমাণ তো নেই আমাদের হাতে। কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না কিছু।'

গম্ভীর হয়ে ব্যাংকটার দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। 'ভুলই করে এলাম মনে হয়। ওই লোকটাই যদি ডাকাতের সর্দার হয়ে থাকে, হুঁশিয়ার করে দিয়ে এলাম তাকে'

'ওডিমার?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

বারো

চারটে নাগাদ হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসল তিন গোয়েন্দা।

কিশোর বলল, 'আবার গোড়া থেকে ভেবে দেখা দরকার। হাতে আর মাত্র একটা দিন। আমার বিশ্বাস, কাল রাতেই আঘাত হানবে ডাকাতেরা। তার পরদিন পার্টি, অনেক লোকের ভিড় থাকবে, তখন কিছু করতে যাবে না ওরা। মুসা, কাকে সন্দেহ হয় তোমার?'

'এমন কেউ, যে পেইন্টবল খেলে, রোডেশিয়ান ক্যামোফ্লেজ পরে, ওনিয়ন রীডের টাকার খবর জানে।'

'তাতে তো ওডিমারের ওপরই সন্দেহ পড়ে।'

'টোনার নরম্যানের ওপরও,' বলল রবিন।

ভ্রুকুটি করল কিশোর। 'সে হলে বড়জোর ডাকাতের সহকারী হবে। নেতা বলে মানতে পারছি না।'

অবাক হলো রবিন। 'আমি তো ভেবেছিলাম তাকেই সন্দেহ করবে সবার আগে। খেলার সময় যে শয়তানীটা করেছে তোমার সঙ্গে।'

'সে-কথা আমি ভুলিনি। এ রকম শয়তানী যারা করে, তারা সাধারণত মাথামোটা হয়। ভেবে-চিন্তে ডাকাতির পরিকল্পনা করার মত বুদ্ধি এদের ঘটে থাকে না। রোববারে বুশ লেপার্ডদের সঙ্গে যখন খেললাম, কি করল দেখলে না? রোডস তাকে ঠেলে দিল আমাদের গুলির মুখে। দলের দামী খেলোয়াড়কে ওভাবে সামনে ঠেলে দেয় না কোন ক্যাপ্টেন। তারমানে ওকে দামী ভাবে না রোডস।'

বলতে থাকল কিশোর, 'তা ছাড়া সে-ই যদি প্ল্যান করে থাকবে, বোকার মত নকশাটা অফিসের টেবিলে ফেলে রাখবে কেন? হয় নিজের মাথায় রাখবে সমস্ত ব্যাপারটা, নয়তো আরও পরিষ্কার করে খুঁটিনাটি করে আঁকবে, যাতে দলের লোককে বোঝাতে পারে।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ,' একমত হলো রবিন।

'রবিন, দশ লক্ষ ডলার অনেক টাকা। এত টাকা লুট করে পার পাওয়া

ছেলেখেলা নয়। টোনারের মত লোক একা এই দুঃসাহস দেখাবে না, এ ব্যাপারে আমি শিওর।'

'বাকি থাকল রাসটি আর ভেগাবল,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'দু জনেরই জোরাল মোটিভ আছে। ভেগাবলের টাকা দরকার, আর রাসটি প্রতিশোধ নিতে চায় ওডিমারের ওপর।'

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল রবিন, 'এই, একটা কথা ভুলেই বসেছিলাম আমরা! নিজের জায়গায় এমন ভাবে একটা ফীল্ড তৈরি করেছেন একজন লোক, ডাকাতির জায়গার সঙ্গে যার হুবহু মিল আছে।'

'জর্জ অ্যাণ্ডারসন!' একসঙ্গে বলল কিশোর আর মুসা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বানালেন, কিন্তু প্ল্যানটা কার? তিনি কি করে জানলেন রীডের বাড়ির আশপাশের জায়গা কেমন?'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'দারুণ একটা কথা মনে করেছ। আরেকবার গিয়ে ফীল্ডটা দেখা দরকার। খোঁজও নিতে হবে, কার কাছ থেকে প্ল্যান নিয়ে এক নম্বর ফীল্ডটা বানিয়েছেন তিনি।'

ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-র পার্কিং লট বলতে গেলে খালিই। কমাণ্ডার পোস্টের পেছনে কাউন্টারে একটা পরিচিত মুখ দেখতে পেল ছেলেরা। মারশা টুইটার। ক্যামোফ্লেজের ওপর রেফারির কমলা রঙের ভেস্ট পরেছে। কয়েকটা পেইন্টগান নিয়ে বসেছে পরিষ্কার করার জন্যে।

'তিন গোয়েন্দা যে,' হাসল মেয়েটা। 'তারপর কি মনে করে? রহস্যের কিনারা হলো?'

মুসা বলল, 'এতই কি সহজ।'

'এনডির সঙ্গে কথা বলতে এসেছি,' কিশোর বলল। 'আছেন নাকি?'

'অফিসে নেই। উত্তরের উপত্যকায়, এক নম্বর ব্যাটলগ্রাউণ্ডে। আমাকে অনুরোধ করেছেন কিছু কাজ করে দিতে। ছুটির দিনে ভিড় হবে তো, জিনিসপত্র রেডি রাখতে চান।'

'তুমি কি রেফারিও হও নাকি?' জানতে চাইল মুসা।

'হই মাঝেসাঝে। ভিড় কম হলে আর এনডির কর্মচারীরা ফীল্ড মেরামতের কাজে ব্যস্ত থাকলে সাহায্যের জন্যে আমার ডাক পড়ে।'

'তারমানে শুরু থেকেই আছো এখানে,' এক পা সামনে এগোল কিশোর। 'এক নম্বর ফীল্ডটা কি ভাবে তৈরি হয়েছে নিশ্চয় বলতে পারবে।'

মাথা নাড়ল মারশা। 'আজব আগ্রহ! তবে হতেই পারে, গোয়েন্দা তো। কি জানতে চাও?'

'ছাউনিগুলো বানাতে গেলেন কেন এনডি?' প্রশ্ন করল মুসা।

'অবশ্যই খেলার মজা বাড়ানোর জন্যে। অনেক ফিল্ডেই আজকাল এ সব তৈরি হচ্ছে। যতটা সম্ভব জটিল করে তোলা হচ্ছে ফিল্ডগুলোকে। বেশ কয়েকটা টিমের ক্যাপ্টেন চাপাচাপি শুরু করল, শুধু পাহাড় আর গাছপালায় চলছে না, অন্য কিছু করুন; ছাউনি বানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন এনডি।'

'কোনও বিশেষ ক্যাপ্টেন পরামর্শ দিয়েছে, ঠিক কি জিনিসটি চায়?'

জিজ্ঞেস করল কিশোর।

মাথা ঝাঁকাল মারশা। 'তা বলতে পারব না। তবে যদ্দূর জানি, পরামর্শ অনেকেই দিয়েছে, টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। এমনকি গতর খাটিয়েও কাজ করে দিয়েছে।'

'কিন্তু তদারকির ভার তো কোন একজন নিশ্চয় নিয়েছে? প্ল্যান করেছে।' রবিন জানতে চাইল, 'সেই লোকটা কে? অ্যাণ্ডারসন?'

'না,' মাথা নাড়ল মারশা। 'ডিজাইন করেছে টোনার, তদারকিও সে-ই করেছে।'

'টোনার?' অবাক হলো কিশোর।

'এ কাজের উপযুক্ত সে। ছোটাছুটি করে বেরিয়েছে সারাক্ষণ, গলাবাজি করেছে, একে ধমক, তাকে ধমক…তার ধারণা, তার মত এত ভাল নকশা আর কেউ করতে পারবে না। সুতরাং তাতে একটু ভুল থাকলে চলবে না—এমন একটা ভঙ্গি,' হাসল মারশা। 'কিন্তু তার *এত ভাল* নকশায় তৈরি ট্রেঞ্চে ঢুকে দেখেছি আমি। জঘন্য। মোটেও নিরাপদ ভাবতে পারবে না।'

'হয়তো এমন কিছু ভেবে বানিয়েছে টোনার,' রহস্যময় কণ্ঠে বলল কিশোর, 'যে জায়গাটা আসলেই নিরাপদ নয়।'

'তোমাদের কথাবার্তা কেমন যেন লাগছে আমার কাছে!'

'আরে দূর,' হাত নাড়ল মুসা, 'কিশোরের কথায় পাত্তা দিয়ো না। এক কথা থেকে আরেক কথায় চলে যাওয়া তার স্বভাব।'

মুসার কথাকে যেন পাত্তা দিল না কিশোর, আচমকা বলল, 'স্পেশাল ফীল্ডে গিয়ে খেললে কেমন হয়?'

'ভালই হয়,' সমর্থন করল মারশা। 'এখানে খেলতে এলে অনেকেই ওসব জায়গায় যেতে চায়। দাঁড়াও, গগলস নিয়ে আসি। গগলস ছাড়া ওখানে খেলার নিয়ম নেই।' হাত বাড়াল সে, 'ভাড়া লাগবে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেটে হাত ঢোকাল কিশোর। এই কেসটায় প্রচুর খরচ হচ্ছে তার। জিজ্ঞেস করল, 'কত?'

বুলডোজার দিয়ে সমান করা রাস্তা ধরে এগোল তিন গোয়েন্দা। আগের রোববারে এটা দিয়েই গিয়েছিল এনডি আর বুশ লেপার্ডদের সঙ্গে। অথচ মনে হচ্ছে কতদিন হয়ে গেল।

'তারপর, কিশোর,' রবিন জিজ্ঞেস করল, 'কি বুঝছ? পালের গোদাটা কে?'

'এখনও শিওর না,' চিন্তিত ভঙ্গিতে জবাব দিল কিশোর। 'টোনারের বিরুদ্ধে দুটো তথ্য পেয়েছি। এক, তার অফিসে পাওয়া নকশা; দুই, ব্যাটল ফীল্ডের নকশার প্ল্যান তার করা। ওডিমারের কথাও ভাবতে হবে। সে একটা টিমের ক্যাপ্টেন। কবে, কত টাকা রীডের বাড়িতে যাবে জানে সে। নেতা হওয়ার যোগ্যতা তার আছে। ভাবনা-চিন্তার ক্ষমতাও। তা ছাড়া আমরা গিয়ে বলার পরও বসকে কিংবা পুলিশকে খবর দিতে নারাজ।'

হ্যামবারগার হিলের মোড়ে পৌঁছল ওরা। বনের ভেতর দিয়ে এগোল। পাহাড়ের চূড়ায় গাছপালা যেখানে পাতলা হয়ে এসেছে সেখানে এসে হঠাৎ কিশোর আর রবিনের হাত চেপে ধরল মুসা। একটানে সরিয়ে আনল ঝোপের আড়ালে। 'কেউ আছে,' ফিসফিস করে বলল সে। পাহাড়ের নিচে একটা নড়াচড়া চোখে পড়েছে তার। 'ক্যামোফ্লেজ পরা থাকলে ওকে দেখতে পেতাম না।'

'আমাদেরও তো নেই,' রবিন বলল। 'চোখে পড়ে যাব সহজেই।'

কিশোরের গায়ে সাদাটে রঙের হাওয়াই শার্ট। মুসার লাল জ্যাকেট। রবিনের শার্টে নীলের ওপর বাদামী ডোরা। ঝোপঝাড়ে তাকেই কম চোখে পড়বে। সে-জন্যে পাহাড়ের ঢাল ধরে গুড়ি মেরে এগোল সে, নিচে কে আছে দেখতে।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল। পেটের কাছে মাটি লেগে আছে, বুকে হেঁটে এগোতে হয়েছিল।

'বললে বিশ্বাস করবে না,' কণ্ঠস্বর যতটা সম্ভব নিচু করে বলল সে, 'টোনার। ছাউনির আশেপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে। স্টপওয়াচ দিয়ে সময় মেপে দেখছে কতক্ষণ লাগে।'

মাথা দুলিয়ে কিশোর বলল, 'বলেছিলাম না সে নেতা নয়? নেতারা এই কাজ করবে না। সে দলের একজন কর্মী।'

'এমন করছে কেন গিয়ে জিজ্ঞেস করলেই হয়,' মুসা বলল।

'করলে বলবে নাকি ডাকাতি করতে যাবে? বলবে প্র্যাকটিস করছে,' রবিন বলল।

জুতোর ডগা দিয়ে মাটিতে খোঁচা মারল কিশোর। 'কি করব বুঝতে পারছি না। ওদের ঠেকাতে হলে তাড়াতাড়ি একটা কিছু করা উচিত।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'কালকের আগেই।'

তেরো

বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যাটা টেলিফোন করে কাটাল কিশোর। টোনার নরম্যান আর নীল ওডিমারের ব্যাপারে খোঁজখবর করল।

কথা বলল স্থানীয় ব্যবসায়ী, ব্যাংকের পরিচিত কয়েকজন লোক, আর রকি বীচ পুলিশের চীফ ইয়ান ফ্লেচারের সঙ্গে। তেমন কিছু জানতে পারল না।

পরদিন শুক্রবার সকালে হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসল আবার তিন গোয়েন্দা।

'টোনারের একটা বদনাম শুনলাম,' কিশোর বলল, 'কথায় কথায় নাকি মেরে বসে মানুষকে।'

'তাতে প্রমাণ হয় না সে ডাকাত,' মুসা বলল। 'আর কি পেলে?'

'অ্যাকাউনটেন্ট হিসেবে খুব ভাল। কিন্তু হঠাৎ করেই পেশা বদল করে অন্য কিছু করার কথা নাকি ভাবছে। প্রাইভেট সিকিউরিটি ফোর্স গড়ার দিকেই ঝোঁক দেখাচ্ছে আজকাল।'

'এই জন্যেই তার অফিসের টেবিলে ফোর্সের ওপর লেখা বই দেখেছি,' রবিন বলল।

'রীডের বাড়িতে ডাকাতির প্ল্যান করতে সাহায্য নেয়ার জন্যেও আনতে পারে ওই বই।'

'ওডিমারের ব্যাপারে কি জানলে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ওকে মক্কেলরা পছন্দ করে,' বলল কিশোর। 'দরদর করে উঠে যাচ্ছে ওপরে। আরও উঠবে। এত অল্প বয়েসে একটা ব্যাংকের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। খুব খাটে...'

'খেলার সময়ও খাটে,' ফোঁস করে উঠল মুসা। 'ছুটি পেলেই মানুষের গায়ে বল ছুঁড়ে মারে। মজা পায়।'

'পাবেই,' বলল রবিন। 'সারাটা সপ্তাহ বড়লোকদের অত্যাচার সহ্য করে। মন যায় বিষিয়ে। বল ছুঁড়ে ছুঁড়েই শান্ত করে নিজেকে। কিশোর, তার ব্যাপারে কি জানলে?'

'উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক। ক্যারিয়ার ছাড়া আর কিছু বোঝে না।' গাল ডলল কিশোর। 'ভালই আয় করে সে। রীডের বাড়িতে ডাকাতি করার প্রয়োজন পড়ে না।'

'পড়ে।'

'কেন?'

'দশ লাখ ডলারের জন্যে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা কখনও এক জায়গায় এক কাজ নিয়ে বসে থাকতে চায় না। সব সময় নতুন কিছু খোঁজে। দশ লাখ টাকা পেলে ব্যাংকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু করতে পারবে।'

'এটা একটা ভাল কথা বলেছ,' সমর্থন করল কিশোর। 'কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে। পুলিশকে বলতে পারব না।'

আবারও কয়েকটা ঘণ্টা ফোন করে কাটাল কিশোর আর রবিন। নতুন কিছুই জানতে পারল না।

রাগ করে শেষে আছাড় দিয়ে রিসিভার রেখে দিল কিশোর। 'সময়ও যাচ্ছে ফুরিয়ে! রীডকে হুঁশিয়ার করা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কি করে সেটা করব তা-ও বুঝতে পারছি না। ইচ্ছে করছে গিয়ে গেট ভেঙে ঢুকে পড়ি, সিনেমার হিরোরা যেমন গাড়ি নিয়ে ঢোকে।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল সে। মুসার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার গাড়িটা নিয়ে যাব নাকি?'

'তাকে ফোন করলেই হয়?' রবিন বলল।

মাথা নাড়ল মুসা, 'চেষ্টা করেছিল কিশোর। ফোনবুকে নম্বরই নেই। আনলিসটেড। এমন কাউকে চিনি না, যে নম্বরটা জানে।'

'আমি চিনি,' বলে ফোনের দিকে হাত বাড়াল রবিন। বার্টলেট লজের অফিসে ফোন করল তাঁর সেক্রেটারিকে। 'হাই, ফেয়ারি। একটা উপকার করতে পারবে? শনিবার রাতে ওনিয়ন রীডের বাড়িতে ব্যাণ্ড পার্টি পাঠানোর কথা আছে, জানো তো?...গুড। কন্ট্রাক্ট করার জন্যে রীড যাকে পাঠিয়েছিলেন সেই লোক ঠিকানা-টিকানা কিছু রেখে গেছে? ফোন নম্বর?...ভেরি গুড। নম্বরটা বলো না, প্লীজ?'

কাগজে খসখস করে নম্বর লিখে নিল রবিন। বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

'এই সহজ ভাবনাটা আগে ভাবতে পারোনি!' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে কিশোরের।

'তাড়াতাড়ি করো,' হেসে তাগাদা দিল মুসা। 'সময় বয়ে যাচ্ছে।'

রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করল কিশোর। হাত কাঁপছে। ওপাশে রিঙ হচ্ছে। খোদা, কেউ যেন ধরে!—মনে মনে বলল সে।

রিসিভার তোলা হলো ওপাশ থেকে। ভারি গলা ভেসে এল, 'ওনিয়ন।'

'মিস্টার ওনিয়ন রীড?' এত দ্রুত আর এত সহজে ভাগ্য খুলে যাবে কল্পনাই করতে পারেনি কিশোর। ভেবেছিল সেক্রেটারি বা বাড়ির অন্য কেউ ধরবে।

'ওনিয়ন রীড বলছি,' জবাব এল ইংরেজিতে, তবে কথায় কড়া বিদেশী টান। কোন দেশের লোক রীড? 'কে বলছেন?'

'স্যার, আমাকে আপনি চিনবেন না। আপনাকে সাবধান করার জন্যে ফোন করেছি। আপনার বাড়িতে ডাকাতি...'

'আবার সেই কথা!' ধমকে উঠলেন ওনিয়ন। তারপর দ্রুতবেগে পরের যে কথাগুলো বললেন, অর্ধেকই বুঝল না কিশোর। মোটামোটি অনুমান করে নিয়ে যা দাঁড়াল, 'আমাকে জ্বালিয়ে মজা পাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, তাই না? নম্বর পেলে কোথায় বুঝলাম না। তবে এই শেষ, আর পারবে না। এখুনি নম্বরটা বদলে যাবে। টেলিফোন অফিস থেকে লোক এসে গেছে। নতুন কিছু জানাতে পারোনি তুমি। এ সব কথা আগেও শুনেছি। আহা, আমার ভাল করার জন্যে দরদ উথলে উঠেছে সবার, যত্তসব!'

চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'রাখবেন না, রাখবেন না, প্লীজ! দশ লাখ ডলার...'

লাইন কেটে গেল। মুখ কালো করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল কিশোর। জানাল বন্ধুদের।

রেগেমেগে মুসা বলল, 'জাহান্নামে যাক! আমাদের কি ঠেকা পড়েছে তাঁর টাকা বাঁচানোর! আমরা কিছুই করব না...'

'দোষটা তাঁর নয়,' কিশোর বলল। 'ডাকাতদের চালাকি। বার বার ফোন করে সাবধান করেছে তাঁকে, যাতে বিরক্ত হয়ে যান তিনি। আর বিশ্বাস না করেন। ভাবেন মজা করা হচ্ছে। এত রাগা রেগেছেন, আমার কথাই শুনতে চাইলেন না।'

'আবার করে দেখবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'না। আবার রেখে দেবেন। কিংবা হয়তো এতক্ষণে বদলে গেছে নম্বরটা।'

'কি করব তাহলে এখন?' মুসা জানতে চাইল। 'পুলিশও বিশ্বাস করবে না...দাঁড়াও দাঁড়াও পেয়েছি...'

'কী?'

'অন্তত একজন পুলিশের কাছে তো যেতে পারি আমরা, ফিয়ারড রোডস! পেইন্টবল প্লেয়ার। স্পেশাল ফীল্ডের কথা জানা আছে তার। কেন বানানো হয়েছে এক নম্বর গ্রাউণ্ডটা তাকে হয়তো বোঝাতে পারব।'

'কিন্তু তারই টিমের একজন, টোনার নরম্যানের কথা যখন বলব, বিশ্বাস করবে?' রবিনের প্রশ্ন।

'করতে পারে। দলের লোক হলেই যে চোর হতে পারবে না এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া সে বেভারলি হিলসের লোক। যখন দেখবে রীডের বাড়ির পজিশন ব্যাটলগ্রাউণ্ড ওয়ানের সঙ্গে মিলে যায়, বিশ্বাস করবে।'

'তাহলে কথা বলতে বলছ...?'

রবিনের কথা শেষ হওয়ার আগেই থাবা মেরে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। কথা বলতে বলতে আবার কালো হয়ে গেল মুখ। হতাশ ভঙ্গিতে রিসিভার রেখে সহকারীদের জানাল, 'আজ ডিউটি নেই তার। রোববারের আগে আসবে না। বাড়ির নম্বর জিজ্ঞেস করলাম, দিল না। গলা শুনেই বুঝেছি তাকে দেখতে পারে না ডেস্ক সার্জেন্ট।'

দ্রুত ফোনবুকের পাতা ওল্টাতে শুরু করল সে। কয়েক মিনিট পর বন্ধ করে বলল, 'ফিয়ারড রোডসের নাম নেই।'

রবিন বলল, 'এনডির কাছে থাকতে পারে।'

তার অনুমান ঠিক। পাওয়া গেল এনডির কাছে—বাড়ির ঠিকানা, ফোন নম্বর, সব। কিন্তু ডায়াল করতে গিয়েও থমকে গেল কিশোর। 'আমার করাটা বোধহয় উচিত হবে না। একবার তাকে অনুসরণ করে গেছি, মনে মনে এখনও রেগে থাকতে পারে আমার ওপর। মুসা, ভাল খেলোয়াড় হিসেবে তোমাকে পছন্দ করার কথা তার। তোমারই যাওয়া উচিত। ফোন না করে সামান্য যে প্রমাণটা আছে আমাদের হাতে, নকশার ফটোকপি, সেটা তাকে দেখালে হয়তো বিশ্বাস করানো সহজ হবে।'

'আমি রাজি,' হাত বাড়াল মুসা। 'দাও ফটোকপিটা।'

আধঘন্টার মধ্যেই পৌঁছে গেল মুসা। হলিউড হিলসের একপ্রান্তে ছোট একটা বাড়িতে বাস করে রোডস। আশেপাশে কয়েক সারি বাংলো টাইপের বাড়ি, অনেক পুরানো।

পথের একেবারে শেষ মাথার বাড়িটা রোডসের। পেছনে পাহাড়, তার ওপাশে গিরিখাদ। সেখানে আর কোন বাড়ি বানানো যাবে না। মুসার মনে হলো, এতে খুশি রোডস। কারণ অনেক বড় একটা শূন্য আঙিনা পেয়ে গেছে,

যেখানে এসে কেউ তাকে বিরক্ত করবে না। ইচ্ছে করলে পেইন্টবল ওটি প্র্যাকটিস করতে পারবে।

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে বাড়ির দিকে হেঁটে এগোল মুসা। কয়েক পা যেতে না যেতেই একটা পরিচিত শব্দ কানে এল। কোনও জিনিসে লেগে ঠুস করে পেইন্টবল ফেটেছে।

বাহ্, চমৎকার, বাড়িতেই আছে তাহলে রোডস। প্র্যাকটিস করছে।

খুশি মনে আরও দুই কদম এগিয়ে একটা কথা মনে পড়তে যেন হোঁচট খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। বল ফাটার শব্দ শুনেছে, কিন্তু পিস্তলের শব্দ শুনল না কেন?

তারমানে নীরব-অস্ত্র ওটা, শব্দ করে না!

চোদ্দ

ঝড়ের গতিতে ভাবনা চলেছে মুসার মাথায়। সামনের দরজার দিকে না গিয়ে বাড়ির পাশের ঝোপের আড়ালে আড়ালে নিঃশব্দে এগোল পেছনের আঙিনার দিকে।

পাহাড়ের ঢালে এসে উঠল। বাড়ি থেকে এখানে তাকে দেখা যাবে না। এক দৌড়ে উঠে এল পাহাড়ের চূড়ায়। শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ঝোপের ভেতরে ভেতরে বুকে হেঁটে এগোল। গায়ের নতুন জ্যাকেটটার সর্বনাশ হচ্ছে, কিন্তু মাথাই ঘামাল না সেটা নিয়ে।

শুকনো ঘাস কিংবা ঝোপের ডালে লেগে যাতে শব্দ না হয় সে-ব্যাপারে সাবধান রইল সে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে লাগল। চলে এল এমন একটা জায়গায় যেখানে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থেকে বাড়ির পেছনের আঙিনা স্পষ্ট দেখতে পায়।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না মুসা। গ্যারেজের কাছ থেকে বিশ ফুট দূরে দাঁড়িয়ে আছে রোডস। পেইন্টবলই প্র্যাকটিস করছে। কিন্তু যে অস্ত্রটা দিয়ে করছে সেটা সাধারণ পেইন্টগান নয়, ছয় ফুট লম্বা একটা ব্লো-গান।

বুশ লেপার্ডদের সন্দেহ করেছে হেনরি ভেগাবল, অনুমান ঠিক। গোপন অস্ত্রটা দেখে ফেলেছে এখন মুসা। যেটা দিয়ে বল ছুঁড়লে কোন শব্দ হয় না।

ব্লো-গানটাকে খুলতে শুরু করল রোডস। তিন ফুট লম্বা দুটো টুকরো। বুশ জ্যাকেটের ভেতরে লুকিয়ে ফেলল। কোন ধরনের খাপটাপ আছে বোধহয়। এই তাহলে ব্যাপার। এ ভাবেই লুকিয়ে পেইন্টবল গ্রাউণ্ডে অস্ত্রটা নিয়ে যায় সে।

হাসি পেল মুসার। খেলার মাঠে সবাই যেখানে আরও আধুনিক, আরও উন্নত অস্ত্র খুঁজে বেড়ায়, সেখানে রোডস নিয়ে যায় দক্ষিণ আমেরিকার জংলী

মানুষের অতি প্রাচীন একটা অস্ত্র। ভাগ্যিস বল ব্যবহার করে রোডস, বিষ মেশানো ডার্ট নয়। তাহলে প্রথম দিন খেলার পরই মারা পড়ত রবিন, কিশোর আর জিনা। ওরা সেদিন নীরব ব্লো-গানের শিকার হয়েছিল।

গ্যারেজের দিকে হাঁটতে লাগল রোডস। ব্লো-গানটা যে লুকানো আছে জ্যাকেটের ভেতরে, কিছুই বোঝা গেল না। অনেক দিনের প্র্যাকটিস। পকেট থেকে গোটানো একটা বড় কাগজ বের করে স্কচ টেপ দিয়ে সাঁটিয়ে দিল গ্যারেজের দরজায়। টার্গেট। তারমানে বল ছোঁড়া আরও প্র্যাকটিস করবে।

কাগজে টার্গেট আঁকা রয়েছে। ভাল করে দেখে অবাক হলো মুসা। কয়েকটা বড় কুকুরের ছবি। স্পষ্ট করে না এঁকে আবছা করে আঁকা হয়েছে। কয়েক ভাবে, কয়েক ভঙ্গিতে। মুখোমুখি, পাশ থেকে, পেছন থেকে—মোট কথা একটা কুকুর যত ভঙ্গিতে দাঁড়াতে পারে, সব রকম ভাবে।

আবার বিশ ফুট পিছিয়ে এল রোডস। জ্যাকেটের পকেট থেকে অবিশ্বাস্য দ্রুত ব্লো-গানের টুকরো দুটো বের করে জোড়া লাগিয়ে ফেলল। বল ভরে নিশানা করল।

ঠুস করে বল ফেটে রঙ লেগে গেল একটা কুকুরের কাঁধে। পরের বলটা লাগল মুখোমুখি দাঁড়ানো আরেকটা কুকুরের বুকে। একের পর এক বল ছুঁড়তে লাগল রোডস। নিখুঁত নিশানা। একটাও মিস হলো না।

এতক্ষণে বুঝতে পারল মুসা, কুকুরের গায়ে কেন বল মারছে রোডস। রাতে রীডের বাড়িতে কুকুর ছেড়ে দেয়া হয়। বলের বদলে ডার্ট ছুঁড়লে সহজেই মেরে ফেলা যায় কিংবা ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায় কুকুরগুলোকে। নিঃশব্দে ঘটে যাবে ঘটনাটা। গার্ডেরা টেরও পাবে না কিছু।

ডাকাতদের নেতা কে, তা-ও জানা হয়ে গেল মুসার। এসে ভালই করেছে। সেনাবাহিনীতে ছিল রোডস। কি করে কমাণ্ডো হামলা চালাতে হয়, জানে। রীডের বাড়িতে ডাকাতির প্ল্যান তারই করা, বুঝতে আর অসুবিধে হলো না।

অনুমান করল মুসা, টিমের ক্যাপ্টেন হিসেবে এনডিকে ব্যাটলগ্রাউণ্ড ওয়ান বানাতে সে-ই নিশ্চয় বেশি চাপাচাপি করেছে। তার নির্দেশেই গ্রাউণ্ডের ছক বানিয়েছে টোনার, রীডের বাড়ির আশপাশের জায়গার মত করে। দলে কয়জন আছে ওরা? শুধু রোডস আর টোনার? বুশ লেপার্ডদের অন্য দু-জন—জনি আর ডিকও দলে থাকলে এখন অবাক হবে না সে।

যা জানার জানা হয়ে গেছে। এখন পালানো দরকার।

ঝোপ আর ঘাসে পোকামাকড়ের অভাব নেই। গায়ে উঠতে শুরু করেছে গোবরে পোকা। ঘাসের ডগার খোঁচা লাগছে নাকে, সুড়সুড়ি দিচ্ছে। হাঁচি বেরিয়ে না গেলেই এখন হয়। নড়ার সাহস হলো না তার। যদি কোন ভাবে শব্দ হয়ে যায়, শুনে ফেলবে রোডস।

চুপ করে পড়ে রইল মুসা।

অবশেষে আবার ব্লো-গান খুলে জ্যাকেটের তলায় লুকাল রোডস। গ্যারেজের দরজা থেকে কাগজটা খুলে নিয়ে চলে গেল বাড়ির ভেতরে। এইই

সুযোগ। উঠে মাথা নিচু করে দৌড় দিল চূড়ার দিকে।

পেছনে দরজা খোলার শব্দ হলো। আঙিনায় বেরিয়ে এল আবার রোডস। হাতে পুলিশের পিস্তল। এটাতে আর বল নয়, আসল বুলেট। চিৎকার করে বলল, 'কারও ওপর চোখ রাখতে হলে ক্যামোফ্লেজ পরে আসতে হয়, খোকা!'

পিস্তল তুলল রোডস।

কিন্তু থামল না মুসা। ঝাঁপ দিয়ে পড়ল চূড়ার অন্যপাশের ঢালে, গড়াতে শুরু করল। কিছুদূর ওভাবে নেমে, উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে নামতে লাগল। কোন দিক দিয়ে বেরোলে বড় রাস্তায় উঠতে পারবে জানা নেই। থামল না। বাঁচতে হলে পালাতে হবে এখান থেকে।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। ঝোপঝাড় ভেঙে, শুকনো ঘাস মাড়িয়ে ছুটে আসছে লোকটা।

মরিয়া হয়ে লুকানোর জায়গা খুঁজতে শুরু করল মুসা। সময় নেই। তাড়াতাড়ি লুকাতে না পারলে যে কোন মুহূর্তে পিঠে এসে বিঁধবে বুলেট।

মোড় নিয়ে কয়েকটা ঝোপ পাড় হয়ে ছুটল গাছের জটলার দিকে। নিরাপদেই পৌঁছল ওখানে। গাছের আড়ালে আড়ালে দৌড়ে চলল।

পুরো বনই যেন তার বিরোধিতা করার জন্যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। পায়ে বেধে তাকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে শেকড়, মুখে বাড়ি মারছে ডাল। হঠাৎ করে যেন সামনে গজিয়ে উঠছে ছোট আকারের কাঁটাঝোপ, পথরোধ করতে চাইছে। পায়ের নিচে শুকনো পাতা আর ডাল তো আছেই, মড়মড় করে গুঁড়ো হচ্ছে, মটমট করে ভাঙছে। শত্রুকে জানিয়ে দিচ্ছে তার অবস্থান।

পেছনে লেগে রয়েছে রোডস।

হাত দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল মুসা। চোখে লেগে জ্বালা ধরাচ্ছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। কিন্তু থামল না সে। হাল ছেড়ে দিয়ে মরার ইচ্ছে নেই।

ডানে মোড় নিয়ে যেদিক থেকে এসেছে আবার সেদিকে ফিরে চলল। ঘুরপথে তার গাড়িটার কাছে পৌঁছতে চায়।

কিন্তু পাকা কমাণ্ডো রোডস। চালাকিটা ধরে ফেলল। যেখান থেকে মোড় নিয়েছে মুসা, সেখান পর্যন্ত গেলই না। আরও আগেই মোড় নিল, মুখোমুখি ধরার জন্যে।

পায়ের আওয়াজ শুনে মুসাও বুঝতে পারল সেটা। এঁকেবেঁকে ছুটল গাছপালার ভেতর দিয়ে। শেকড়ে পা বেধে আছাড় খেলো। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে আবার ছুটল। কাঁটা ডালে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে হাত-মুখ, কেয়ারই করছে না। একটা ব্যাপার বুঝতে পারছে না, সে কোন দিকে যাচ্ছে এত তাড়াতাড়ি জানছে কি করে রোডস? হঠাৎ মনে পড়ল, গায়ের লাল জ্যাকেট। ওটাই ফাঁস করে দিচ্ছে সব। খুলে ফেলার চেষ্টা করল সে। কিন্তু এ ভাবে ছুটতে ছুটতে কাজটা করা অসম্ভব মনে হলো তার কাছে। থামারও উপায় নেই। ধরে ফেলবে রোডস।

কোন দিক যাচ্ছে এখন তা-ও বুঝতে পারছে না আর। গাড়ির কাছে যেতে না পারলে, কোনমতে রোডসের কোন পড়শীর বাড়িতে পৌঁছতে পারলেও হয়তো রক্ষা। অন্য কারও সামনে কি তাকে গুলি করে মারবে রোডস?

দশ লক্ষ ডলারের জন্যে কয়েক ডজন খুন করতেও দ্বিধা করবে না, এমন বহু লোক আছে। আর রোডস একটা করতে পারবে না এটা বিশ্বাস হয় না। হয়তো পড়শীকেও খুন করে বসতে পারে। প্রমাণ রাখবে না। কি করবে কে জানে! নানা রকম কুচিন্তা খেলে যাচ্ছে মুসার মাথায়।

সামনে ঘন ঝোপ। ওগুলোর কাছে আসতেই চোখে পড়ল একপাশে গিরিখাত। আরেকটু হলেই পড়ে যেত তার মধ্যে, ঝোপের ডাল আঁকড়ে ধরে বাঁচল কোনমতে। সামনে পথ নেই। পেছনে আসছে রোডস। এবার কি করবে? খাদের দিকে তাকাল সে। বিশ ফুট নিচে তল। লাফিয়ে এতটা নামতে পারবে না।

দিশেহারার মত পেছনে তাকাল মুসা।

গাছের ফাঁকে চোখে পড়ল রোডসকে।

মরিয়া হয়ে খাদের পাড়ের সরু কিনারা ধরে দৌড় দিল মুসা। কিন্তু কয়েক গজ যেতে না যেতেই একটা গাছের শেকড়ে পা বেধে আবার হোঁচট খেলো।

তাল সামলানোর অনেক চেষ্টা করেও পারল না। থাবা মেরে ধরে ফেলল একটা ডাল। কিন্তু ওটাও ভার রাখতে পারল না তার। মট করে ভেঙে গেল।

দূর থেকে রোডস দেখল, খাদের মধ্যে পড়ে যাচ্ছে ছেলেটা।

পনেরো

খাদের কিনারে এসে দাঁড়াল রোডস। হাতে পিস্তল। অনেক নিচে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একটা দেহ। পা পড়েছে ঝোপের ওপর। পায়ের নিচের অংশ ঝোপে দেবে গেছে, মাথা ঢেকে আছে ঘন ঘাসে। শরীরের পাশে বেশ খানিকটা জায়গা লাল হয়ে আছে।

রক্তের মত লাগল রোডসের কাছে। নিচে নামল না। পিস্তলটা পকেটে ভরে ফিরে চলল সে।

খাদের কিনারে একটা ঝোপে বসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। ধোঁকাটা কাজে লেগেছে। ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-তে কেনা ক্যামোফ্লেজ টি-শার্টটা গায়ে থাকাতে তাকে ওপর থেকে দেখেনি রোডস। ভাঙা ডালটা রয়েছে হাতে। রোডস দেখতে এলে মাথায় বাড়ি মারত। যদিও অনুমান করেছিল সে নামবে না। দুর্ঘটনায় মরা লাশের আশেপাশে রহস্যময় পায়ের ছাপ দেখলে

সন্দেহ হবে পুলিশের, খুঁজে বেড়াবে লোকটাকে, রোডসও জানে সেটা। তাই কাছে আসার ঝুঁকি নেবে না। নেয়ওনি।

খাদের ওপর থেকে খাড়া নিচে পড়েনি মুসা। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে। মাটির কয়েক ফুট ওপরে থাকতে একটা ঝোপ আঁকড়ে ধরেছিল। তাতেই বেঁচে গেছে। ঝোপ ছেড়ে দিয়ে বাকিটুকু লাফিয়ে নেমেছে।

মাটিতে নেমেই কয়েক টানে জ্যাকেট আর প্যান্ট খুলে এমন করে বিছিয়ে দিয়েছে, যেন উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন মানুষ। ভাগ্য ভাল, পকেটে ছিল একটা পেইন্টবল টিউব, সেটার লাল রঙ সব টিপে বের করে মাখিয়ে দিয়েছে জ্যাকেটের পাশের ঘাসে।

চালাকিটা কাজে লেগেছে। দেখতে আসেনি রোডস। মুসা মারা গেছে মনে করে চলে গেছে।

আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে রইল মুসা। তারপর খাদের ঢাল বেয়ে উঠে এল আবার ওপরে। দূরে শোনা যাচ্ছে রোডসের চলার শব্দ, শুকনো ঘাস আর ঝোপঝাড়ে লেগে শব্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর যখন সব চুপচাপ হয়ে গেল, নিঃশব্দে গাড়ির দিকে এগিয়ে চলল মুসা।

সরাসরি রোডসের বাড়িতে না এসে পড়শীদের একটা বাড়ির সীমানায় ঢুকল সে। লুকিয়ে থেকে দেখল বেরিয়ে যাচ্ছে ঝরঝরে ক্যামারো গাড়িটা। দূরে পথের মোড়ে ওটা হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে গাড়িতে উঠল। পিছু নিল ক্যামারোর।

যানবাহনের ভিড় বেশি। তা ছাড়া মুসার গাড়িটাকে চেনে না রোডস। তবু সাবধান রইল মুসা। অনেক দূর থেকে অনুসরণ করে চলল ক্যামারোকে।

বিমান বন্দরে পৌঁছে Aero Brazil টিকেট কাউন্টারের দিকে এগোল রোডস। টিকেট কিনে যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল। কয়েক মিনিট পর মুসাও এসে দাঁড়াল কাউন্টারের সামনে। তরুণী টিকেট বিক্রেতাকে বলল, 'এক্সকিউজ মি, এইমাত্র যে ভদ্রলোক টিকেট কিনলেন তিনি কোথায় যাচ্ছেন?'

'কেন, চেনো নাকি?'

'হ্যাঁ, চেনা চেনাই মনে হলো। বাবার বন্ধু।'

টিকেটের একটা অংশ থেকে যায় কাউন্টারে, সেটা দেখে মেয়েটা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বাবার বন্ধুর নাম মিস্টার হ্যামার?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মিস্টার হ্যামার। রিয়োতে ব্যবসা আছে, ঘন ঘন যান ওখানে।'

'আজও রিয়োর টিকেটই কিনেছেন। রাত বারোটা। কেন, তাঁকে দরকার নাকি?'

'না, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। এয়ারপোর্টে এক বন্ধুকে রিসিভ করতে এসেছি। ভদ্রলোককে দেখলাম। বাবাকে বলব গিয়ে।'

মেয়েটাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সরে এল মুসা। একটা ফোন বুদে গিয়ে ফোন করল কিশোরকে, 'কেসের সমাধান করে ফেলেছি।'

'মাত্র একটা টিকেট কিনল?' রবিন বলল। হেডকোয়ার্টারে রয়েছে তিনজনই। 'ডাকাতির পর পুরো দলটা পালাবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

'মুসা, শোনো,' নড়েচড়ে বসল কিশোর, 'তুমি ফোন করার পর ভালমত ভেবেছি আমি। নতুন একটা সম্ভাবনার কথা মনে হয়েছে। ভেবে দেখো, একজন পুলিশ অফিসারের নামে গুজব শোনা গেছে—চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজের সিকিউরিটি ফোর্স গঠন করবে। তার এক বন্ধু বলাবলি করছে, অ্যাকাউন্টিঙের কাজ ছেড়ে নতুন কিছু করবে, এবং তারও সিকিউরিটি ফোর্সের দিকে ঝোঁক। সে-সব নিয়ে পড়াশোনা করছে। আরও একটা ব্যাপার, টিকেট মাত্র একটা করেছে রোডস। অনেকে মিলে ডাকাতি করলে একা পালাত না সে, টিকেট বেশি করত। ব্যাপারটা হয়তো আসলে ডাকাতিই নয়।'

'তাহলে কি?' জানতে চাইল রবিন।

'একটা পরীক্ষা। ওরা দেখিয়ে দেবে রীডের সিকিউরিটি সিসটেমের মধ্যে গোলমালটা কোথায়। আস্থা অর্জন করতে পারলে রোডসের নতুন দলকেও কাজটা দিয়ে দিতে পারেন রীড। এই আশাতেই করছে রোডস। এবং কাজটা পেয়েই ছুটি কাটানোর জন্যে রিয়োতে পারি জমাবে সে।'

সামনে ঝুঁকল মুসা, 'বেশ, বুঝলাম, রোডস ভাল মানুষ। তাহলে পিস্তল নিয়ে তাড়া করল কেন আমাকে? আমার লাশ দেখেও কাছে এল না কেন? মনে শয়তানী না থাকলে চোখের সামনে একজনকে মরে যেতে দেখেও কাছে আসবে না, এটা হতে পারে না। তা ছাড়া অন্য নামে টিকেট কিনল কেন?'

'প্রথম দুটোর নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে,' কিশোর বলল। 'তবে শেষ প্রশ্নটা বেশ সন্দেহ জাগায়, অন্য নামে কেন? এই একটা কথা শুনলে পুলিশও মাথা ঘামাবে।'

'ঘামাক আর না ঘামাক, যা করার আমরাই করব,' ফোনের রিসিভার তুলল মুসা। 'কি ঘটছে, কোথায় ঘটছে, কখন ঘটছে, কে ঘটাচ্ছে, সবই এখন মোটামুটি জানা আমাদের। ঠেকানোর জন্যে সাহায্য দরকার।'

চুপ করে তাকিয়ে আছে কিশোর আর রবিন। মুসা কি করতে চায় বুঝতে পারছে না।

ব্যাটলগ্রাউণ্ড থ্রী-তে টেলিফোন করল সে। 'হালো, মিস্টার অ্যাণ্ডারসন? আমি মুসা আমান। জরুরী কথা বলছি, মন দিয়ে শুনুন, প্লীজ...'

রাত ন'টায় রীডের বাড়ির উল্টোদিকের পাহাড় চূড়াটায় উঠে দাঁড়াল মুসা। পরনে ক্যামোফ্লেজ। তার সঙ্গে যারা এসেছে তাদের পরনেও একই পোশাক। অন্ধকার হয়ে আসছে। কোনমতে চেনা যাচ্ছে এখন রবিন, মারশা আর জিনাকে। মারশাকে আনা হয়েছে তার নিশানা ভাল বলে। তাকে প্রয়োজন। আর জিনা এসেছে জেদ ধরে। মুসারা আসবে শুনে ফেলেছে, আর কি তাকে ফেলে আসা যায়?

'বোকামি করছি কিনা কে জানে,' ফিসফিস করে বলল রবিন। হাতের পেইন্টবল মেশিনগানে শক্ত হলো আঙুল। 'কিশোর কোথায়?'

'ও পাশে,' উল্টো দিকটা দেখাল মুসা। 'যদি ওদিক দিয়ে আসে ওরা? সে আর এনডির দলের অর্ধেক লোক তৈরি আছে ওদিকটায়···ওই যে, এসে গেছে···'

নিচের উপত্যকায় চারটে আবছা মূর্তিকে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে নদীর দিকে এগোতে দেখা গেল। এমন একদিক দিয়ে এগোচ্ছে ওরা, যে জায়গাটা গার্ডহাউস থেকে দেখা যায় না। বেড়ার কাছে পৌছে পকেটে হাত দিল একজন। বের করল তিন ফুট লম্বা দুই টুকরো পাইপ। জোড়া লাগিয়ে ব্লো-গান বানিয়ে ফেলল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে সেটার মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে গুলি শুরু করল।

চোখের পলকে কাবু করে ফেলল সবগুলো কুকুরকে। বেড়া ডিঙিয়ে বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করল চারজনের দলটা।

'যা ভেবেছিলাম ঠিক সে-ভাবেই করছে সব,' মুসা বলল। 'এবার আমাদের পজিশন নিতে হবে।'

দ্রুত বনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গাছপালার প্রান্তে চলে এল ওরা, যেখান দিয়ে বেরিয়েছিল ডাকাতেরা সেখানে। তৈরি হয়ে লুকিয়ে বসল। মারশা জানতে চাইল, 'কতক্ষণ দেরি হবে?'

'বেশি না,' জবাব দিল মুসা।

তার কথা শেষ হতে না হতেই বাড়িতে বেজে উঠল তীক্ষ্ণ অ্যালার্ম। একসঙ্গে আলো জ্বলে উঠল অনেকগুলো। গার্ডদের ছোটাছুটি দেখে মনে হলো পিঁপড়ের বাসায় খোঁচা মেরেছে কেউ। ভীষণ চমকে গেছে, এ রকম কিছুর জন্যে যেন তৈরি ছিল না ওরা। কেউ ছুটল বাড়ির দিকে, টর্চ হাতে অন্যেরা ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। তৃতীয় গার্ডহাউসের ছাত থেকে একটা সার্চলাইটের আলো গিয়ে পড়ল লনের ওপর।

ছুটে আসতে দেখা গেল তিনজন ডাকাতকে। যাওয়ার সময় যেমন শান্ত, হিসেবী ভঙ্গিতে গিয়েছিল, তেমন নয়। বড় বেশি তাড়াহুড়া। বেড়া ডিঙানোর সময় হুড়ুম-ধাড়ুম করে পড়ল মাটিতে। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। অ্যালার্মের কথাটা মাথায় আসেনি ওদের, বোঝা গেল।

তৃতীয় লোকটা বেড়া ডিঙিয়ে এ পাশে আসতেই হুকুম দিল মুসা, 'ফায়ার!'

বল ছুঁড়তে শুরু করল চারজনে। এনডির দলের লোকেরাও বল মারতে লাগল দিশেহারা তিন ডাকাতকে সই করে।

চিৎকার শুরু করল তিনজনে। সবচেয়ে লম্বা লোকটা টোনার, চেহারা না দেখেও অনুমান করা গেল সেটা। দৌড় দিল পাহাড়ের একদিকের ঢালে ওঠার জন্যে। তেড়ে গেল এনডিফোর্সের কয়েকজন। চেঁচামেচি গার্ডদেরও কানে গেল। ওরাও দৌড়ে আসতে লাগল।

টর্চ ফেলল কয়েকজন। সেই আলোতে দেখা গেল বলের রঙে মাখামাখি

ডাকাতদের ক্যামোফ্লেজ, চিত্র-বিচিত্র হয়ে গেছে। পেইন্টগানকে গুরুত্ব না দিলেও গার্ডদের আসল অস্ত্রকে না দিয়ে পারল না। হাত তুলে দাঁড়াল টোনার, জনি ও ডিক।

ততক্ষণে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে চলে গেছে মুসা। কি ঘটেছে গার্ডদের বোঝানোর জন্যে।

মজা পেয়ে এখনও হাত তুলে দাঁড়ানো ডাকাতদের গায়ে রঙের বল ফাটাচ্ছে জিনা।

'পালের গোদাটা কোথায়?' নিজেকেই প্রশ্ন করল রবিন। 'রোডস?'

কানে আসছে পেইন্টবল মেশিনগানের কড়কড় শব্দ। দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমে।

তিন ডাকাতকে ধরে বাড়ির দিকে নিয়ে চলল গার্ডেরা। মুসা চলল তাদের সঙ্গে। আর বসে থাকার দরকার নেই। জিনা আর মারশাকে নিয়ে রবিনও এগোল।

গার্ডহাউসে ঢোকানো হলো তিন বন্দিকে। কয়েক মিনিট পর হাসিমুখে এসে হাজির হলো কিশোর আর এনডির দল, রোডসকে ধরে নিয়ে এসেছে। রঙে মাখামাখি হয়ে আছে ডাকাত সর্দার। হাতে রঙ, পোশাকে রঙ, মুখে রঙ—যেন একটা ভাঁড় সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি। কল্পনাই করতে পারেনি এমন কিছু ঘটবে, এ ভাবে হেরে যাবে।

কিশোরের হাতে বড় একটা ব্যাগ। তাতেও রঙ। সেটা দেখিয়ে বলল, 'এটা নিয়ে পালাচ্ছিল। কিন্তু আমরা যে লুকিয়ে বসে থাকব স্বপ্নেও ভাবেনি রোডস।'

ষোলো

'পালাচ্ছিল? কি বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না!' অবাক হওয়ার ভান করল টোনার।

ব্যাগের মুখ খুলল কিশোর। ভেতরে রাশি রাশি টাকার তোড়ার দিকে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল টোনার।

'অবাক লাগছে, তাই না?' হেসে বলল কিশোর। 'ভেবেছিলেন আপনাদের বন্ধু একজন কোটিপতির সিকিউরিটি সিসটেম ভেদ করা যায় কিনা পরীক্ষা চালাচ্ছে, যাতে নতুন দলটা কাজ পায়। তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল বুশ লেপার্ডদের তিনজন।

'আসলে তা নয়। এটা স্রেফ ডাকাতি। দশ লাখ ডলার নিয়ে কেটে পড়ত আপনাদের বন্ধু ফিয়ারড রোডস। আপনারা পেতেন খালি ব্যাগটা।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে তিনজন। কিশোরের কথা বুঝতে সময় লাগল।

'তারমানে নতুন সিকিউরিটি কোম্পানি খুলছে না রোডস!' শূন্য কণ্ঠে

বলল ডিক ফ্র্যান্সিস।

'নতুন কাজ হবে না আমার!' বিড়বিড় করল জনি বিয়াণ্ডা। 'ইনস্যুওরেন্সের বিরক্তিকর কাজটা আর ছাড়া হলো না!'

ঘুসি মারার জন্যে লাফ দিয়ে রোডসের দিকে এগোল টোনার, 'শয়তান! চীট! তুই আমাদের...'

তাকে ধরে ফেলল গার্ডেরা।

'অতি সহজ প্ল্যান ছিল রোডসের, মিস্টার নরম্যান,' কিশোর বলল। 'নকশাটা দেখেই সব বুঝে ফেলেছিলাম। আপনার অফিসে পেয়েছি ওটা।'

এমন চোখ গরম করে টোনারের দিকে তাকাল রোডস, মনে হলো জ্বলন্ত ওই দৃষ্টি ইস্পাতের ওপর ফেললে তা-ও গলে যাবে। 'গাধা কোথাকার! কাগজে আঁকার কি দরকার ছিল? মাথায় রাখতে পারোনি...'

তাকে চুপ করিয়ে দিল এবার গার্ডেরা।

তিন বুশ লেপার্ডের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর, 'আপনাদের তিনজনের ওপর তিন রকম দায়িত্ব ছিল নিশ্চয়?'

মাথা ঝাঁকাল ডিক। বুঝতে পারছে কি ভাবে ঠকানো হয়েছে তাদের। রাগে কালো হয়ে গেছে মুখ। 'আমাকে পাহারা দিতে বলা হয়েছে মূল বাড়ির একটা ঘরের জানালার কাছে। ওই ঘরেই আছে আয়রন সেফটা। রোডস বলেছে, সে ওই আলমারিতে একটা ভিডিও ক্যাসেট ঢুকিয়ে দিয়ে আসবে, তাতে থাকবে রোডস সিকিউরিটি কোম্পানির বিজ্ঞাপন। তারপর এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা। গিয়েই ফোন করা হবে মিস্টার রীডের কাছে, পুরো ব্যাপারটা জানানো হবে। কিন্তু সে-রকম কিছু ঘটল না। রোডসকে আলমারির দিকে এগোতে দেখলাম। তারপর কি যে ঘটল, একটা ভোঁতা আওয়াজের পর অ্যালার্ম বেজে উঠল। আর থাকতে সাহস করলাম না। দৌড় দিলাম বেড়ার দিকে।'

'ভোঁতা শব্দটা বিস্ফোরকের,' অনুমান করল কিশোর। 'সেফের তালা ভেঙেছে রোডস। তালার সঙ্গে যে অ্যালার্ম লাগানো ছিল, এই তথ্যটা জানা ছিল না বলেই ভুলটা করেছে।'

'কিন্তু আমাদের সিকিউরিটি সিসটেমের কথা জানল কি করে রোডস?' জানতে চাইল হেডগার্ড।

'অতি সহজে। বেভারলি হিলস পুলিশ স্টেশনে পোস্টিং রোডসের। এ বাড়ির সিকিউরিটি সিসটেমের সব তথ্য লেখা আছে পুলিশের ফাইলে। দেখে নিয়েছে সে।' হেডগার্ডের দিকে তাকাল কিশোর, 'অ্যালার্মটা পরে লাগানো হয়েছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল গার্ড। 'হ্যাঁ, দিন কয়েক আগে। কয়েকটা রহস্যময় টেলিফোন পেয়েছেন মিস্টার রীড, তাঁর বাড়িতে নাকি ডাকাতি হবে। টাকা লুট করতে আসবে ডাকাতেরা। আমাকে ডেকে সেফে অ্যালার্ম লাগিয়ে দিতে বললেন তিনি। পুলিশকে জানানো হয়নি কথাটা।'

'এবং সে-জন্যেই জানতে পারেনি রোডস। জানলে আর বিস্ফোরক

দিয়ে খোলার চেষ্টা করত না।'

তিন গোয়েন্দার ওপর ঘুরতে লাগল রোডসের জ্বলন্ত দৃষ্টি। মুসার ওপর স্থির হলো। 'তুমি তাহলে খাদে পড়ে মরোনি! ধোঁকাটা দিলে কি করে?'

হাসল মুসা, 'সেটা আর না-ই বা শুনলেন।'

গার্ডেরা ধরে না রাখলে মুসাকে মেরেই বসত রোডস। খেঁকিয়ে উঠল, 'যত নষ্টের মূল তোমরা তিন বিচ্ছু···জানলে কি করে খবরটা?'

'আপনি জানিয়েছেন। সেদিন বনের মধ্যে পেইন্টবল খেলার সময় একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম আমি। আপনি আর টোনার এলেন সেখানে। টোনারের পরনে ছিল রোডেশিয়ান ক্যামি। কথায় কথায় আপনি সেফের দশ লাখ ডলারের কথা বললেন। বুঝে ফেললাম, ডাকাতির কথা হচ্ছে। আপনাদের পা দেখেছিলাম কেবল, ভয়ে মাথা তুলতে পারিনি। মুখ দেখলে কিংবা কণ্ঠস্বর চিনতে পারলে অনেক আগেই সব কিছুর সমাধান হয়ে যেত।'

মুসা থামলে কিশোর বলল, 'সবই বুঝেছি, একটা ব্যাপার বাদে। কি করে আন্দাজ করলেন ডাকাতির ব্যাপারে তদন্ত করছে মুসা?'

'আন্দাজ করেছি কি করে বুঝলে?'

'নইলে তাকে সাবধান করার জন্যে স্যালভিজ ইয়ার্ডে ঢুকে তার পিঠে পেইন্টবল মেরে আসতেন না। বল ছোঁড়ার কোন আওয়াজ শুনিনি। তারমানে নীরব অস্ত্র দিয়ে ছোঁড়া হয়েছে। আর সেই জিনিসটা একমাত্র আপনার কাছেই ছিল, ব্লো-গান।'

দ্বিধা করতে লাগল রোডস।

'মনে পড়ছে না? বেশ, আরেকটু মনে করিয়ে দিই,' কিশোর বলল। 'মুসা গেল সেদিন রাসটির দোকানে। সে থাকতেই একজন কাস্টোমার ঢুকল, যার সঙ্গে কথা বলার জন্যে চলে গেল রাসটি। সেই কাস্টোমারটা ছিলেন আপনি। রাসটি আর মুসা যখন ডাকাতির কথা বলছিল, শুনে ফেলেছিলেন। তারপর পিছে লাগলেন মুসার। তাকে অনুসরণ করে চলে গেলেন ইয়ার্ডে। আড়ি পেতে শুনলেন আমাদের কথা। গুলি করলেন মুসাকে। ভেবেছেন, তাতেই ঘাবড়ে গিয়ে তদন্ত বন্ধ করে দেব আমরা।' হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল কিশোরের দৃষ্টি, 'তবে সবচেয়ে খারাপ কাজটা করেছেন আমার গাড়িটা নষ্ট করে দিয়ে। এর জন্যে আপনার ওপর থেকে রাগ যাবে না আমার কোনদিন।'

মুচকি হাসল রোডস। 'যাক, একটা কষ্ট অন্তত দিতে পেরেছি···'

দূরে পুলিশের সাইরেন শোনা গেল।

কয়েকটা সাদা-কালো রঙ করা গাড়ি এসে ঢুকল চত্বরে। লাফ দিয়ে নামল পুলিশ অফিসারেরা। সবাই চেনে রোডসকে। তার খারাপ আচরণের জন্যে আগে থেকেই দেখতে পারত না, এখন সব শুনে তার ওপর আরও বিষিয়ে গেল তাদের মন।

বন্দিদের নিয়ে চলে গেল পুলিশ। দু-জন অফিসার কেবল রয়ে গেল রিপোর্ট লিখে নেয়ার জন্যে।

কিশোর বলল, 'যাক, শেষ পর্যন্ত শেষ হলো কেসটা···'

'না, হয়নি এখনও,' বলে উঠল একটা ভারি কণ্ঠ, কথায় কড়া বিদেশী টান। গার্ডদের পেছন থেকে এগিয়ে এলেন সাদা স্যুট পরা লম্বা একজন মানুষ। মোটা সাদা ভুরুর নিচে কালো চোখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ঝিলিক।

'মিস্টার রীড?' কিশোর বলল।

'আমি ওনিয়ন রীড।'

'আমিই আপনাকে ফোনে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছিলাম...'

'এবং আমি লাইন কেটে দিয়েছিলাম। যারা বড় দানে জুয়া খেলে, তারা ঝুঁকি নিতে ভয় পায় না। আমিও পাইনি। বড় ঝুঁকির মানে, বড় পুরস্কার।'

'পুরস্কার' শব্দটা শুনে কান খাড়া হলো কিশোরের। 'আমরাও বড় ঝুঁকি নিয়েছি। আমার এই বন্ধুটি তো প্রায় মরতেই বসেছিল,' মুসাকে দেখাল সে, 'আপনার উপকার করতে গিয়ে।'

'মরতে বসেছিল?' বিস্ময়ে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল রীডের ভুরু। 'অনেক বড় ঝুঁকি। অনেক বড় পুরস্কার পাওয়া উচিত।' ব্যাগটার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। ওটাকে পাহারা দিচ্ছে দুই পুলিশ অফিসার। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দুই মুঠো একশো ডলারের নোট বের করে আনলেন রীড।

বাধা দিল একজন অফিসার, 'স্যার, এখান থেকে নেয়াটা ঠিক হচ্ছে না। আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ...'

'দশ লাখ থেকে নিলাম তো মাত্র কয়েক হাজার, বেশির ভাগই রয়ে গেল। এত টাকা দিয়েও ডাকাতগুলোকে জেলে ভরতে পারবেন না?'

জবাব দিতে পারল না অফিসার।

মুসার দিকে ফিরলেন রীড, দু-হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, তোমার পুরস্কার। ইচ্ছে করলে এমনিতেও নিতে পারো, আমি দিচ্ছি। আবার এগুলো নিয়ে একটা জুয়াও খেলতে পারো। তাহলে আমার দুই হাতে যা আছে তার ডবল পাবে।'

তাড়াতাড়ি বাধা দিতে গেল কিশোর, 'মুসা...'

'তুমি থামো,' বলে উঠলেন রীড। 'এই ছেলেটা ঝুঁকি নিয়েছে, সে-ই সিদ্ধান্ত নিক।' মুসার দিকে তাকালেন আবার, 'কি, খেলবে?'

রোডসই যে ডাকাতদের দলপতি, এটা জানার পর থেকে এমন সব ঘটনা ঘটিয়েছে, নিজের ওপর আস্থা বেড়ে গেছে মুসার। ভাবল, জেতার পালা চলছে তার। ঝুঁকিটা নিয়ে ফেলল, 'খেলব।'

'গুড। কারও কাছে কয়েন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন রীড।

পকেট থেকে একটা মুদ্রা বের করে দিল রবিন।

সেটা মুসাকে নিতে বলে জিজ্ঞেস করলেন রীড, 'কি নেবে তুমি—হেড, না টেল?'

'হেড।'

'বেশ, ফেলো কয়েনটা।'

টোকা দিয়ে ওপর দিকে মুদ্রাটা ছুঁড়ে দিল মুসা। উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠে ঘুরতে ঘুরতে পড়ল নিচে। আশপাশে যারা আছে সবাই আগ্রহ

নিয়ে ঝুঁকে তাকাল কি উঠেছে দেখার জন্যে।

টেল!

'খুব খারাপ হলো তোমার জন্যে,' দু-হাতের সব টাকা আবার ব্যাগে ফেলে দিলেন রীড।

মুসার দিকে তাকিয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল কিশোর। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'কোনও দিন নেতা হতে পারবে না তুমি, মুসা। কারণ, কখন থামতে হবে জানা নেই তোমার। এগিয়ে যাওয়ার নেশায় পেয়ে বসে। বিকেল থেকে নের্তৃত্ব দিয়ে এসেছ তুমি। বার বার জিতেছ। ভেবেছ, আজ সবই তোমার পক্ষে যাবে। তা আসলে যায় না। প্ল্যান করে করেছিলে বলেই তখন জিতেছিলে। কোন কিছু না ভেবে ঝুঁকি নিতে গেলেই গড়বড় হয়ে যেতে পারত সব। নেতাদের কখনও জুয়া খেলা উচিত নয়। যে কাজ করলে লাভের আশা যতখানি, লোকসানের ভয়ও ততখানি, সেটা করা উচিত নয় বুদ্ধিমান মানুষের। নিশ্চিত জিনিস ফেলে অনিশ্চিতের আশা করে লোভী হয়ে ওঠে যারা, তারা বোকা…'

এতগুলো টাকা চোখের পলকে এ ভাবে হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় এমনিতেই ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে মুসার। হাতজোড় করে বলে উঠল, 'দোহাই তোমার, কিশোর, লেকচার থামাও! আর সহ্য করতে পারছি না!'
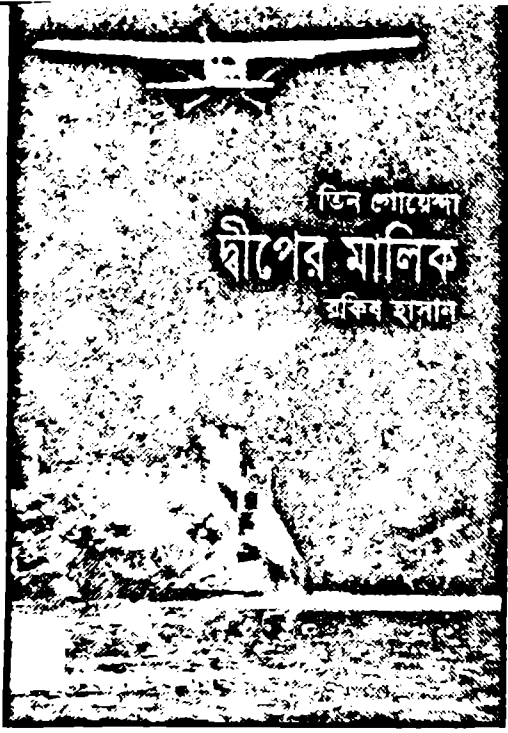
দ্বীপের মালিক

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

ওকিমুরো কর্পোরেশনের অফিস। টেবিলে পা তুলে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে ওমর, এই সময় দরজায় টোকা পড়ল।

'কে?' মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল সে।

'আমি। বোরিস।'

'এসো।'

ঘরে ঢুকল ইয়ার্ডের কর্মচারী বোরিস। সঙ্গে একজন সুদর্শন যুবক। ছিপছিপে শরীর। বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। বয়েস ওমরের সমানই হবে।

নিশ্চয় মক্কেল। পা নামাল ওমর। কাগজটা ভাঁজ করে সরিয়ে রাখল একপাশে। উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল, 'ওমর শরীফ।'

এগিয়ে এসে হাতটা ধরল যুবক। 'ক্রিশ্চেন হ্যাগেন।'

'বসুন।' বোরিসের দিকে তাকাল ওমর। 'কিশোর কোথায়?'

'মিসেস পাশা কোথায় যেন পাঠালেন।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও।'

'হো-কে!' বেরিয়ে গেল বোরিস।

হ্যাগেনের দিকে তাকাল ওমর। 'কি খাবেন?'

'কিচ্ছু না,' মাথা নাড়ল হ্যাগেন। 'আমি একটা জরুরী কাজে এসেছি। ডিটেকটিভ ভিকটর সাইমন আমার বন্ধু। তার কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। আপনার কাছে পাঠিয়ে দিল।'

ড্রয়ার খুলে সিগারেটের প্যাকেট বের করল ওমর। হ্যাগেনের দিকে তাকাল, 'চলবে?'

'আমি সিগার খাই।' হাত বাড়াল হ্যাগেন, 'ঠিক আছে, দিন।'

সিগারেট বের করে একমাথা টেবিলে ঠুকল ওমর। ঠোঁটে লাগিয়ে আগুন ধরাল। টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হ্যাগেনের দিকে তাকাল, 'হ্যাঁ, বলুন।'

'অনেক লম্বা কাহিনী। যতটা সম্ভব ছোট করেই বলি।'

'জরুরী তথ্যগুলো বাদ দেবেন না।'

'আমার আসল বাড়ি স্কটল্যান্ডে। ক্যানাডার নাগরিকত্ব আছে। আমেরিকায়ও বহুদিন থেকেছি আমি। পঞ্চাশ বছর আগে আমার দাদা, রুবেন হ্যাগেন, রস-শায়ার থেকে পশ্চিমে পাড়ি জমিয়েছিলেন। বেশ কিছুদিন থেকেছেন ওখানে। হ্যাগেনদের, অর্থাৎ আমাদের আদিবাড়ি ওয়েস্টার্ন আইলস'এর টোলা'তে। প্রচুর টাকা কামিয়েছিলেন আমার দাদা। সেগুলো দিয়ে কি করবেন বুঝতে পারছিলেন না। অন্যখানে পাড়ি জমালেও হৃদয়টা

রেখে এসেছিলেন আদিনিবাস হাইল্যান্ডসেই। স্কটল্যান্ডের কোন কিছুই ভুলতে পারেননি। এমনকি নিয়মিত স্কটিশ পত্রিকাও যেত তাঁর কাছে। একদিন নর্দার্ন স্কট পত্রিকার একটা খবর তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল, প্রেরণা জোগাল বলতে পারেন। বিভিন্ন কারণে লোকসংখ্যা কমে গিয়েছিল টোলায়। হাতে গোণা অবশিষ্ট যারা ছিল, তাদের মেইনল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ওখানে আর টিকতে পারছিল না ওরা। ডাক্তার নেই, কোন রকম চিকিৎসা-সুবিধা নেই, বিনোদন নেই, এমনকি একটা স্কুল পর্যন্ত নেই। ওরা যেভাবে বেঁচে ছিল, ওটা কোন জীবনই নয়।'

'শুনেছি, ওয়েস্টার্ন আইলের অনেক দ্বীপ থেকেই ওভাবে বাসিন্দাদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,' ওমর বলল।

'হ্যাঁ। টোলায় যা ঘটেছিল, সেটা আমার জন্মের আগের ঘটনা। বাবার মুখে শুনেছি। যাই হোক, আমার দাদা ঠিক করলেন দ্বীপটা কিনে নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো ওখানেই কাটাবেন। পুরানো একটা দুর্গ আছে ওখানে, টোলার এক সময়কার শাসনকর্তার–হ্যাগেনদের পূর্বপুরুষ। দাদা ভাবলেন, দুর্গের সংস্কার করে, বাসিন্দাদের থাকার জন্যে নতুন বাড়িঘর তৈরি করে দিয়ে, গরু-ঘোড়া আর চাষাবাদের নতুন যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে দ্বীপটাকে আবার বসবাসের উপযোগী করে তুলবেন।'

'সত্যি কি সম্ভব ছিল সেটা?'

'কেন নয়?'

'বাসিন্দারা তো সব চলে গিয়েছিল।'

'গিয়েছিল। কিন্তু থাকার সুবিধে পেলে আবার ফিরতে অসুবিধে কোথায়? টাকার তো কোন অসুবিধে ছিল না। সরকারের হয়তো পোষাত না, সেজন্যে ঝামেলা করেনি। কিংবা দ্বীপটার প্রতি আর কোন আগ্রহই ছিল না। কিন্তু ওটা আমার দাদার জন্মস্থান। তাঁর আগ্রহ থাকাটা স্বাভাবিক। সরকারের কাছ থেকে একশো বছরের জন্যে লীজ নিলেন দ্বীপটা। কিন্তু নিজের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার জন্যে ওখানে পৌছতে আর পারলেন না। আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার সময়ই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন।'

'তারমানে কোন কাজই হয়নি ওখানে?'

'কিচ্ছু না। দাদার ছিল এক সন্তান, আমার বাবা। বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না দ্বীপটার ব্যাপারে। কোন ঝামেলায় না গিয়ে নির্বিবাদে জীবন কাটিয়ে দেয়ার পক্ষপাতি। দিয়েছেও তাই। স্টক মার্কেটে টাকা খাটিয়ে দাদার রেখে যাওয়া টাকাকে বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। বছরখানেক আগে বাবাও মারা গেছে। আমিও বাবার একমাত্র সন্তান। সব কিছুর মালিক হলাম আমি,' হাসল হ্যাগেন। 'আমার চরিত্রটাও হয়তো দাদার মতই, হাইল্যান্ডারদের মত সাগর আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই করে টিকে থাকার প্রবণতা। দ্বীপটার মালিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললাম, দাদার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করব। কোন কাজ নেই আমার। এত টাকা আছে, কোন কাজ করার প্রয়োজনই নেই। করে কি করব? টাকাই বাড়বে শুধু। তার চেয়ে দাদা যা

করতে চেয়েছিল, সেটা করতে পারলে একটা কাজের কাজ হবে। প্রথমেই ভাবলাম, দ্বীপটা দেখতে যাব।'

'গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি দেখলেন?'

'কিছুই না। এখানেই আসল কাহিনীর শুরু...'

'এক মিনিট। দ্বীপটার ভৌগোলিক অবস্থানটা জানা যাক আগে। কোথায় ওটা?'

'ম্যাপে দেখালে ভাল হত। যাকগে, মুখেই বলি–বাট অভ লুইস থেকে মাইল তিরিশেক–দ্বীপের সর্বদক্ষিণ প্রান্তটা। মেইনল্যান্ড থেকে চল্লিশ মাইল।'

'কত বড় দ্বীপ?'

'চার মাইল লম্বা। চওড়া মাইলখানেক, সবচেয়ে চওড়া অংশটা দেখতে তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মত। নিঃসঙ্গ দ্বীপ বলা যাবে না। দুর্গটা যে পাহাড়চূড়ায়, তাতে উঠলে দিগন্তের কাছে আরও দু'একটা দ্বীপ চোখে পড়ে।'

'ওগুলোতেও বসতি নেই?'

'আমার জানামতে নেই। থাকার কোন যুক্তিও নেই অবশ্য।'

'টোলার তরাই অঞ্চলটা দেখতে কেমন?'

'খুবই বাজে। চাষবাস করার পর কোন ভূমিকে ফেলে গেলে যেরকম আগাছা আর নলখাগড়ায় ভরে যায়। আবহাওয়া অবশ্য খারাপ না। সব সময়ই যদিও ঝোড়ো বাতাস বয়। তবে গালফ স্ট্রীমের সীমানা বরাবরই সেটা বেশি।'

'দ্বীপটায় যাওয়ার ব্যবস্থা কি?'

'এইবার এসেছেন আসল কথায়। যেতে গিয়েই ঘটল বিপত্তি। আমি ভেবেছিলাম, উপকূলে গেলেই যাওয়ার একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু এ মাথা ওমাথা চষে ফেলেও কাউকে একটা বোট ভাড়া দিতে রাজি করাতে পারলাম না। টোলার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে সবাই নিজেকে কেমন গুটিয়ে নেয়। আর যখন আমার নাম শোনে, এমন চমকে যায়, যেন আমি কোন মারাত্মক বিষ, পটাশিয়াম সায়ানাইড। আমার কথাই শুনতে চাইল না কেউ।'

'সমস্যাটা কোনখানে জানার চেষ্টা করেননি?'

'করিনি মানে! কিন্তু ইঁটের দেয়ালের সঙ্গে কথা বলে কি লাভ?'

মৃদু হাসি ফুটল ওমরের ঠোঁটে। পোড়া সিগারেটের গোড়াটা পিষে ফেলল অ্যাশট্রেতে। 'হুঁ, হাইল্যান্ডারদের চরিত্র সম্পর্কে যা জানি, সেটা সত্যি হলে বলতে হয় ম্যাচের কাঠি দিয়ে ঝিনুকের ডালা ফাঁক করা বরং সহজ, হাইল্যান্ডারদের পেট থেকে কথা আদায় করার চেয়ে।'

'একদম ঠিক। অন্য কেউ হলে হয়তো হতাশ হয়ে ফিরেই যেত, কিন্তু আমিও একজন হাইল্যান্ডার। হাল ছেড়ে দেয়া রক্তেই নেই আমাদের। জেদ চেপে গেল। যাদের ভাল করতে গেলাম, তাদেরই অসহযোগিতা!'

হাসিটা বাড়ল ওমরের। 'স্বদেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেননি তো?'

'তা করিনি। লকনিভারে গিয়ে একটা বোট কিনেই ফেললাম, একটা কেবিন ক্রুজার।'

'অনেক টাকা খরচ করে ফেলেছেন।'

'তাতে কি? ওই গর্দভগুলোকে দেখিয়ে দিতে চেয়েছি, কোন কিছু করেই আমাকে ঠেকাতে পারবে না।'

'নাবিক জোগাড় করলেন কি করে? ওখানকার সমুদ্র তো সব সময় উত্তাল। দক্ষ নাবিক ছাড়া চালাতে পারবে না।'

'নাবিক দরকার হয়নি আমার। আমিই নাবিক। বোট নিয়ে বহুবার একা একা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি। কেবিন ক্রুজার চালানো তো সহজ।'

'তাহলে গিয়েই ছাড়লেন দ্বীপে।'

'হ্যাঁ। যদি থাকার প্রয়োজন পড়ে, এ জন্যে প্রয়োজনীয় খাবার-দাবার আর অন্যান্য জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম সঙ্গে করে। কোন্খানে যাচ্ছি আমি কাউকে বলিনি, কেউ দেখেওনি আমাকে রওনা হতে।'

আনমনে মাথা ঝাঁকিয়ে ওমর বলল, 'নিজেকে ভুল বোঝাচ্ছেন আপনি, মিস্টার হ্যাগেন, নিজেও জানেন সেটা। হাইল্যান্ডারদের যদি আমি চিনে থাকি, আপনি রওনা হওয়ার সময় নিশ্চয় বহুজোড়া গোপন চোখ লক্ষ করছিল আপনাকে।'

'ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিল তখন।'

'তাতে কিছু না। আমার তো একেক সময় মনে হত, হাইল্যান্ডাররা অন্তর্যামী। আমার ধারণা, আশেপাশের কয়েক মাইলের মধ্যে সবাই জেনে গিয়েছিল আপনার উদ্দেশ্য। যাকগে, টোলায় গিয়ে কি দেখলেন? আর এখন ডিটেকটিভের প্রয়োজনই বা পড়ল কেন?'

'আসছি সেকথায়। আমি উপকূলে ঘোরাঘুরি করার সময় একজন এসে কথা বলেছিল আমার সঙ্গে—সেও একজন হ্যাগেন, তবে সম্পর্কে আমাদের কাছাকাছি কেউ নয়। অদ্ভুত একটা ইঙ্গিত দিয়েছিল, দ্বীপে নাকি ভূতের উপদ্রব আছে। ভূত বিশ্বাস করেন?'

'আমি না করলেও হাইল্যান্ডাররা করে। এত দুঃসাহসী একটা জাত কিভাবে ভূতের ভয়ে কাবু হয়, ভাবতে অবাক লাগে আমার। গদগদ হয়ে ভূতের গল্প বলার সময় বার বার মনে করিয়ে দেয়: দেখো, আবার ভেবে বোসো না আমি কুসংস্কারে বিশ্বাসী।' হেসে বলল সে, 'বহু ধরনের ভূত আছে ওখানকার পাহাড়ে-জঙ্গলে, তাই না, মিস্টার হ্যাগেন?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে হ্যাগেন বলল, 'লোকটাকে চাপাচাপি শুরু করলাম, কে কে ভূত দেখেছে জানতে চাইলাম। অন্য কথায় চলে গেল সে। দ্বীপে বসতি করার কথা তুলে বলল, ওখানে আর চাষাবাদ বা খামার করা সম্ভব নয়। দ্বীপটাতে বিষাক্ত সাপের ছড়াছড়ি, বিশেষ করে অ্যাডার। ঘাস খাওয়ার সময় গরুর নাকে কামড়ে দেয়। গরু পোষা অসম্ভব।'

'একেবারেই ফালতু কথা। স্কটল্যান্ডের বহু জায়গায় আছে অ্যাডার সাপ, তাই বলে কি ওসব অঞ্চলে গরু পোষা বন্ধ হয়ে গেছে? আমি আইল্যান্ড অভ

মুল'এ গিয়েছিলাম। অ্যাডারের ছড়াছড়ি ওখানকার মুরল্যান্ডে। নিশ্চয় জানেন, সাপের ভয়ে চলে যাওয়া দূরে থাক, লোকে সাপের কথাও তোলে না কখনও। মাঝেসাঝে কামড় খায়। তার জন্যে পালিয়ে যায় না। যাকগে, টোলায় গিয়ে কি দেখলেন আপনি, তাই বলুন।'

'যা দেখব আশা করেছিলাম।'

'অ্যাডার?'

'একটাও না।'

'তাহলে?'

'মন খারাপ করে দেয়া প্রকৃতি। কি বলতে চাইছি, নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মত দ্বীপটার চেহারা। বাতাসের একেবারে মুখের মধ্যে পড়ে আছে। আটলান্টিক থেকে ধেয়ে আসে ঝোড়ো বাতাস। যেদিকটাতে ধাক্কা দেয় সেদিকটায় খাড়া পাহাড়। যেদিকে বয়ে যায় সেদিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে। এক জায়গায় পাহাড় নেই, খোলা, সেখান দিয়ে উপসাগরে নামা যায়। এক চিলতে সৈকত আছে। তাতে পাথরই বেশি, তবে সামান্য বালিও আছে। দুই প্রান্ত থেকেই উঠে গেছে পাহাড়। সৈকতের উত্তর প্রান্তে পাথরের টিলাটক্করের মধ্যে আছে ছোট্ট একটা খাঁড়ি। পাথরগুলোর কিছু প্রাকৃতিক, আগে থেকেই ছিল, আর কিছু কিছু অন্যখান থেকে তুলে এনে রাখা হয়েছে। পুরানো আমলে আনা হয়েছিল, প্রয়োজনের তাগিদে। ওখানেই বোধহয় মাছ ধরার আর মেইনল্যান্ডে যাওয়ার নৌকাগুলো বেঁধে রাখা হত। বন্দর বলা যেতে পারে ওটাকে। আমার বোটটাও ওখানে রেখেই দ্বীপে নেমেছিলাম। পুরো দ্বীপটা ঘুরে দেখতে আমার তিন দিন লেগেছিল।'

'দুর্গে ঢুকেছিলেন?'

'নিশ্চয়ই। এতকাল খালি পড়ে থাকলে যতটা নষ্ট হওয়ার কথা, ততটা হয়নি। কাছের পাহাড় থেকে পাথর এনে তৈরি করা হয়েছিল দুর্গটা। ভয়ানক ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে টিকে থাকার মত করে। আমি যতটা বড় হবে ভেবেছিলাম, তারচেয়ে বড়। গোটা বিশেক ঘরবাড়ি এখনও অক্ষত রয়েছে দ্বীপে, দুর্গের মতই ওগুলোরও পাথরের দেয়াল, তবে খড়-পাতার ছাউনি। কিছু ঘরবাড়ি একখানে জড়াজড়ি করে রয়েছে, গ্রামের মত; বাকিগুলো ছড়ানো ছিটানো। মরচে ধরা তার আর ভেঙে পড়া পাথরের ফলক দেখে এখনও বোঝা যায় কোন কোন জায়গায় খেত ছিল, চাষ হতো। কেন বাপ-দাদার ভিটে ফেলে চলে গেছে মানুষ, বুঝতে অসুবিধে হয় না। বহুকাল আগে, যখন জীবন যাপনের এতসব আধুনিক ব্যবস্থা ছিল না, তখন বাস করার জন্যে উপযুক্তই ছিল। কিন্তু এখন ওরকম একটা জায়গায় থাকার কথা কল্পনাই করা যায় না। নৌকা ছাড়া যোগাযোগের কোনও ব্যবস্থা নেই, তাও আবহাওয়ার মতিগতির ওপর নির্ভরশীল। শীতকালে তো অবস্থা চূড়ান্ত খারাপ। নৌকা থাকলেও হপ্তার পর হপ্তা আটকে থাকতে হয়। সাগর এত অশান্ত, নৌকা নিয়ে বেরোনোর উপায় থাকে না।'

'পানির কি ব্যবস্থা?'

'অনেকগুলো ঝর্না আছে। দ্বীপটাতে গিয়ে নতুন একটা বুদ্ধি এসেছে আমার মাথায়। চাষাবাদ কিংবা খামার বাদ দিয়ে অন্য কিছুও করা যায়। দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় ছোট একটা লক আছে, চারপাশের নালা আর ঝর্না থেকে পানি গড়িয়ে এসে জমা হয় ওটাতে। সারা বছর পানিতে ভরে থাকে। ওটা থেকে সাগরে বেরোনোরও পথ আছে। সরু একটা নদী, মাইল দেড়েক লম্বা। নদী হিসেবে একেবারেই খাটো, কিন্তু সী-ট্রাউট আর স্যামন ঢোকার জন্যে যথেষ্ট। নদীর মাথার কাছের পানিতে ট্রাউট গিজগিজ করতে দেখেছি।'

'বুদ্ধিটা কি আপনার?'

'দ্বীপের উঁচু অঞ্চলে হরিণ দেখেছি, নিচু জায়গায় কয়েক ধরনের বনমোরগ, স্নাইপ, লকের পানিতে হাঁস। দুর্গটাকে যদি হোটেল বানিয়ে দেয়া যায়—হান্টার'স লজ জাতীয় কিছু, লোকে থাকতে পারে, শিকারের চমৎকার জায়গা পাবে। মাছ, হরিণ এবং পাখি। খাঁড়ির পানিতে পাথরের খাঁজে খাঁজে প্রচুর গলদা চিঙড়িও দেখেছি।'

'কি করবেন ওগুলো দিয়ে? চিংড়ি তো আর বড়শিতে শিকার করা যায় না।'

'টিনে ভরে চালান করতে পারি। ক্যানিং ইনডাস্ট্রি গড়ে তোলা যায়। আমারও লাভ, লোকেরও কর্মসংস্থান হবে।'

হাসল ওমর। 'একেই বলে ব্যবসায়ী বুদ্ধি। আর কি করা যায়?'

'কিছুই নেই বলে যে দ্বীপটাকে ফেলে গেছে লোকে,সেটা থেকে আর কত?'

'হুঁ, তা ঠিক। দুর্গ আর ছাউনিগুলো বাদে আর কোন বাড়িঘর নেই দ্বীপে?'

'আছে। একটা লাইটহাউস।'

একটা ভুরু উঁচু হয়ে গেল ওমরের। 'লাইটহাউসও আছে!'

'আছে, তবে দ্বীপের অন্য সবকিছুর মতই এটাও পরিত্যক্ত। কিছুদিন আগে নতুন আরেকটা লাইটহাউস বানানো হয়েছে, গভীর সাগরের একটা ছোট দ্বীপে। পরিষ্কার আবহাওয়ায় টোলা থেকে ওটার আলো দেখা যায়। আমি গিয়ে থাকতে পারলে টোলার লাইটহাউসটাকেও সারিয়ে-সুরিয়ে আবার চালু করার চেষ্টা করব। জাহাজীদের উপকার হবে।'

আরেকটা সিগারেট বের করল ওমর। 'শুনতে ভালই লাগছে, মিস্টার হ্যাগেন। তবে আসল কথাটা শোনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

'সেটাই বলতে এসেছি। আমার বিশ্বাস, দ্বীপে কিছু ঘটছে। দুর্গে ঢুকেই মনে হলো, কেউ বাস করে ওখানে।'

হাসল ওমর, 'ভূত?'

'স্কট হলেও ওসব ফালতু কুসংস্কার নেই আমার। আমি বলছি মানুষের কথা।'

'বাস করে কেন মনে হলো? প্রমাণ পেয়েছেন?'

'ঠিক পেয়েছি বলা যাবে না। তবে বহুকাল ধরে কোন ঘর খালি পড়ে থাকলে যে ধরনের গন্ধ থাকে, সেরকম কিছু ছিল না। ঘরের মধ্যে আগুন

জেলে রাখলে যে রকম গন্ধ হয়ে থাকে, অনেকটা সেরকম গন্ধ ছিল ঘরের বাতাসে। পেছনের আঙিনায় কয়লার স্তূপও দেখেছি। নতুন। আগেকার নয়। লাকড়িও দেখেছি। দ্বীপে আছে মাত্র কয়েকটা বার্চ গাছ। ওই গাছের লাকড়ি নয় ওগুলো। অন্যখান থেকে আনা হয়েছে।'

মাথা দোলাল ওমর, 'হ্যাঁ, মানুষই···দুর্গে ঢুকলেন কি করে?'

'সোজা হেঁটে ঢুকে পড়লাম।'

'চাবি ছিল আপনার কাছে?'

'না।'

'তারমানে তালা খোলা ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা আপনাকে অবাক করেনি?'

'নাহ্।'

'তালা দেয়া থাকলে কি করতেন?'

'করতাম যা হোক একটা কিছু। আমি মনে করেছিলাম, দুর্গটা একটা ধ্বংসস্তূপ, ওখানে ঢুকতে আর চাবির কি দরকার। দরজা দিয়ে ঢোকার অসুবিধে দেখলে ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকতে পারব।'

'আসবাব আছে?'

'চেয়ারের একটা ভাঙা পায়াও নেই।'

'পুরো দুর্গটায় খুঁজেছেন?'

'না, সবটা দেখতে পারিনি। ও বিশাল ব্যাপার। অনেক বড় জায়গা, খুঁজতে অনেক সময় লাগবে। আমি শুধু যেটুকু দেখা প্রয়োজন মনে করেছি, দেখেছি।'

'আপনি যাওয়ার আগে কেউ হয়তো বোট নিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। আবহাওয়া খারাপ দেখে দুর্গের মধ্যে ঠাঁই নিতে বাধ্য হয়েছিল।'

'তাহলে আগুন জ্বালানোর এত আয়োজন কেন? দুর্গে বাস করার কথা ভেবে তৈরি হয়েই গেছে, যে গেছে। জেলেই ভাবতাম, যদি আরেকটা ব্যাপার না ঘটত। আপনাদের কাছে আসারও প্রয়োজন পড়ত না।'

'কি ঘটেছে?'

'প্লেনের শব্দ শুনেছি।'

বিমান! গোয়েন্দার সঙ্গে পাইলটও দরকার হ্যাগেনের, বুঝতে পারল ওমর। সেজন্যেই হ্যাগেনকে তার কাছে পাঠিয়েছেন মিস্টার সাইমন। 'কি শুনলেন?'

'দ্বিতীয় রাতে, বোটে ঘুমাচ্ছিলাম। মাঝরাতের পর প্লেনের এঞ্জিনের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলাম এক এঞ্জিনের ছোট প্লেন। ডেকে বেরোলাম। আকাশে চাঁদ ছিল, উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। কিন্তু কিছুই চোখে পড়ল না। ভাবলাম দ্বীপের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। তারপর থেমে গেল শব্দটা। অবাক হলাম। বিপদে পড়ল নাকি? কান খাড়া করে ফেললাম।'

'ক্র্যাশল্যান্ড করার শব্দ শোনার জন্যে?'

'হ্যাঁ। কোন শব্দই শুনলাম না। শোনার কিন্তু কথা। সাগরে ঢেউ তেমন ছিল না। শান্ত রাত। ছিলাম খাঁড়ির মধ্যে। পাথরের দেয়ালে ঘেরা। সাগরের দিক ছাড়া আর কোনদিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। পরনে পাজামা। এত ঠাণ্ডার মধ্যে বেরোতে হলে গরম জামা-কাপড় দরকার। পরার জন্যে কেবিনে ঢুকলাম। ভেতরে থাকতে থাকতেই প্লেনটার উড়ে যাবার শব্দ কানে এল। ছুটে বেরোলাম। শব্দ শুনে বোঝা গেল মেইনল্যান্ডের দিকে যাচ্ছে।'

'কিন্তু দেখতে পেলেন না?'

'না। সব আলো নিশ্চয় নিভিয়ে রেখেছিল। নইলে দেখতে পেতাম।'

'কোথায় ল্যান্ড করেছিল?'

'সৈকতে। এ ছাড়া আর প্লেন নামার জায়গা নেই।'

'তারমানে সৈকতটা খুব ছোট না।'

'বড়ও নয়। তবে বাতাস অনুকূলে থাকলে ওখানে ছোট প্লেন নামানো সম্ভব।'

'সেরাতে কোন্‌দিকে বাতাস বইছিল?'

'উত্তরে।'

'তারমানে দক্ষিণের প্রান্তে সরাসরি উড়ে যেতে পেরেছিল প্লেনটা।'

'তাই।'

'ইনটারেসটিং। কিছু করেছেন?'

'আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সৈকতে চলে গিয়েছিলাম দেখার জন্যে।'

'কিছু দেখলেন?'

'কিচ্ছু না। রাতে জোয়ার এসেছিল। সৈকতের অর্ধেক ডুবে গিয়েছিল। ধুয়ে মুছে গেছে চাকার দাগ।'

'হুঁ।'

'পরের রাতে কাপড়-চোপড় পরে তৈরি হয়ে রইলাম, এঞ্জিনের শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বেরোতে পারি। কিন্তু কিছুই ঘটল না। যাই হোক, একটা ব্যাপারে শিওর হয়ে গেছি আমি, কিছু ঘটছে আমার দ্বীপে। কেউ ঘটাচ্ছে। কি ঘটছে, কারা ঘটাচ্ছে, সেটাই জানতে চাই।'

'জানার জন্যে আমেরিকা থেকে গোয়েন্দা নেবার দরকার পড়ল? এত দূর থেকে? লন্ডনেও তো অনেক গোয়েন্দা আছে।'

'ওদিকে থাকিনি কখনও, কাউকে চিনি না। এ সব ক্ষেত্রে অচেনা পেশাদার গোয়েন্দার চেয়ে পরিচিতদের ওপরই আমার আস্থা বেশি, অপেশাদার হলেও। স্কটল্যান্ডে আমার এক মামা আছে, বিমান বাহিনীর কমোডোর। কিন্তু এত সাধারণ কাজে তার কাছে সাহায্য চাইতে যেতে ভাল লাগেনি। যদি জানতাম, দ্বীপে কেউ অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, তাহলেও নাহয় যাওয়ার কথা ভাবা যেত...যাই হোক, ভিকটর সাইমন আমার বন্ধু, সে যখন আপনাদের কাছে পাঠাল...'

'বুঝেছি। দ্বীপে কি ওই একবারই গিয়েছিলেন, না আরও গেছেন?'

'না, আর যাইনি।'

'প্লেনটা নামার পর দ্বীপে আর খোঁজাখুঁজি করেছিলেন, মানে কোন রকম তদন্ত?'

'না। করে কি লাভ হত? পরিষ্কার বুঝলাম, মেইনল্যান্ডের কেউ কেউ জানে দ্বীপে কি ঘটছে, সেজন্যেই আমার যাওয়া বন্ধ করতে চেয়েছে। স্থানীয় একজন পুলিশম্যান আছে, তাকে নাকি কখনও বাড়ি পাওয়া যায় না, এ রকমই শোনানো হয়েছে আমাকে। অযথা সময় নষ্ট না করে সোজা চলে এসেছি আমেরিকায়, ভিকটর সাইমনকে নিয়ে যেতে।...এখন আপনারা যদি যেতে রাজি হন...'

'টোলায় ফিরে যেতে চান?'

'হ্যাঁ,' দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিল হ্যাগেন। 'আমার জায়গা থেকে আমাকে তাড়াবে, আর আমি সহ্য করব? হতেই পারে না! কোন কিছু শুরু করলে সেটা শেষ না করে ছাড়ি না আমি।'

'আপনার কি ধারণা হ্যাগেন বংশেরই কেউ দ্বীপটাতে ফিরে যাবার চেষ্টা করছে?'

'করাটা অস্বাভাবিক নয়। আমিও তো তাই করছি। কোন হাইল্যান্ডারই তার নিজের জন্মস্থানকে ভুলতে পারে না। ভালবাসাটা রক্তে ঢুকে যায়।'

চুপচাপ সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে আবার হ্যাগেনের দিকে তাকাল ওমর, 'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। আপনি কি বিবাহিত?'

'না। কেন?'

'আপনার মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হবে কে?'

'আমার দূর সম্পর্কের এক ভাইঝি আর ভাইপো আছে ক্যানাডায়। আমার কিছু হলে ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা-পয়সা, সম্পত্তি ওরাই পাবে। আমিই ব্যবস্থা করেছি।'

'তারমানে ওদের কেউ চালাকি করে আপনার দ্বীপে যাওয়া ঠেকাতে চাইবে না।'

'প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া বয়েস ওদের নিতান্তই কম।'

অপেক্ষা করতে লাগল হ্যাগেন। ওমর আর কোন প্রশ্ন করছে না দেখে বলল, 'তাহলে আপনারা যাচ্ছেন আমার দ্বীপে?'

'মিস্টার সাইমন নিশ্চয় আমাদের শর্তগুলোর কথা জানিয়েছেন আপনাকে? মানে কোন্ কোন্ শর্তে কাজ করি আমরা?'

'সব।'

'আপনি রাজি আছেন?'

'রাজি।'

'কোন প্রশ্ন নেই আপনার?'

'না।'

'ঠিক আছে, কাল জানাব আপনাকে। ওকিমুরো কর্পোরেশনের বাকি তিন সদস্যের সঙ্গে কথা বলে দেখি। সবাই একমত হলে তবেই যাওয়া হবে।'

দুই

দা মিনশ'এর ধূসর জলরাশির ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে হেলিকপ্টার। পেছনে আটলান্টিক আর অক্টোবরের নিস্তেজ সূর্য। সামনের দিগন্তে কালির ছোপের মত ভেসে উঠেছে দ্বীপটা, আইল অভ টোলা। কন্ট্রোলে বসেছে ওমর। পাশের সীটে মুসা। পেছনের কেবিনে রবিন আর কিশোর।

ভাড়া করা হেলিকপ্টার। হ্যাগেনই ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সে নিজে জলপথে গেছে তার ছোট্ট কেবিন ক্রুজারটা নিয়ে। রসদ আর প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র হেলিকপ্টারে বহন করা সম্ভব না। তাই বোটে করে নিয়ে গেছে। একা গেছে সে। সহকারী নেয়নি।

যতই এগোচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে দ্বীপটা। ঠিকই বলেছিল হ্যাগেন, তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদের মত। বিড়বিড় করল কিশোর, 'চন্দ্রদ্বীপ।'

আকাশ থেকে চট করেই সৈকতটা চোখে পড়ে। উত্তর প্রান্তের পাথরের জেটিটাও, যেখানে বোট রাখবে বলে দিয়েছে হ্যাগেন।

সৈকতে হেলিকপ্টার নামাবে ওমর।

'হ্যাগেন কোথায়?' বকের মত গলা বাড়িয়ে দিয়েছে মুসা।

'বোটটাও তো দেখছি না,' ওমর বলল।

'ওই যে, হ্যাগেন,' বার্চের জটলার দিকে হাত তুলল মুসা।

গাছপালার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল একজন মানুষকে। পেছনের কোন একটা বাড়িতে ঢুকে বসে ছিল বোধহয়।

'কিন্তু বোট রাখল কোথায়?'

জবাব দিতে পারল না মুসা। রবিন আর কিশোর তাকিয়ে আছে দ্বীপটার দিকে।

ল্যান্ড করল ওমর। নামল সবাই। দৌড়ে এল হ্যাগেন। হাতে একটা বারো বোরের দোনলা বন্দুক।

'আমরা তো চিন্তায়ই পড়ে গিয়েছিলাম,' ওমর বলল, 'আপনাকে না দেখে। সব কিছু ঠিকঠাক আছে তো?'

'নাহ্,' বিরস কণ্ঠে জবাব দিল হ্যাগেন।

'বোটটা কোথায়?'

'পানির নিচে।'

তাকিয়ে রইল ওমর। 'কোথায়?'

'ডুবে গেছে।'

'কোনখানে?'

'জেটিতে।'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ।'
'কি করে ডুবল?'
'সেটাই তো জানতে চাইছি।'
'কিন্তু...কিভাবে...'
'জানি না। রেখে গেছি যখন, ঠিকই ছিল। ফিরে এসে দেখি নেই। চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর দেখতে পেলাম দশ ফুট পানির নিচে।'
'বাঁধায় কোন গণ্ডগোল ছিল না তো?'
'না। বাঁধন খুলে গেলে ঢেউয়ে ভেসে যেতে পারে। ডুবে যায় না।'
'চোখা পাথরে খোঁচা লেগে তলা ফুটো হয়ে গিয়ে?'
'যেখানে রেখেছি, খোঁচা খাওয়ার মত পাথরই নেই।'
'কখন ঘটল এ ঘটনা?'
'কালকে।'
কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর। 'বোট রেখে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?'
'কাজ ছিল না। ভাবলাম, কিছু একটা শিকার করে আনি। তাজা মাংস খাওয়া যাবে।'
'কোন্‌দিকে গিয়েছিলেন?'
'লকের দিকে। একটা ছিপও নিয়ে গিয়েছিলাম, মাছে কেমন খায় দেখার জন্যে। একটা হাঁস আর একটা খরগোশ মারলাম। একটা ট্রাউট ধরলাম।'
'ছিপটা কই?'
'লকের কাছে। আবার মাছ ধরার দরকার হবে ভেবে কিনারেই ফেলে এসেছি।'
নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল একবার কিশোর। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'শুরুটা তো চমৎকার! বোট নেই, খাবার নেই, কম্বল নেই–কিচ্ছু নেই।'
চুপ করে রইল হ্যাগেন।
'আপনার কি ধারণা, এটা স্বাভাবিক দুর্ঘটনা?'
'কি করে স্বাভাবিক হয়? কোন কারণই তো নেই।'
'তবে?'
'কেউ ডুবিয়ে দিয়েছে।'
'কাউকে দেখেছেন?'
'না।'
'কিছু শুনেছেন?'
'না। কেবল সী-গালের চিৎকার আর ঢেউয়ের শব্দ।'
'যে ডুবিয়েছে সে কি এখনও এখানে আছে?'
'থাকার সম্ভাবনাই বেশি।'
'তারমানে আপনাকে লকের দিকে যেতে দেখে এসে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে।'
'হতে পারে।'

'কিংবা আপনার গুলির শব্দ তার কানে গেছে। দেখতে এসেছিল, কে এল। আপনাকে বোটের কাছ্ থেকে সরে যেতে দেখে ডুবিয়ে দেয়ার চিন্তাটা মাথায় এসেছে তার। সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে।'

'তা-ও হতে পারে।'

'চলুন, দেখি, কতটা ক্ষতি করল। আপনার বন্দর থেকে এই সৈকতটা দেখা যায়?'

'সবটা না। খানিকটা।'

জেটির দিকে এগোল সবাই। হাঁটতে হাঁটতে রবিন বলল, 'আমাদের হেলিকপ্টার নামার শব্দও নিশ্চয় শুনেছে।'

'তা তো শুনেছেই,' পাহাড়ের দিকে তাকাল কিশোর। 'হয়তো এক্ষণে আমাদের ওপর নজর রাখছে ও।'

'পরে ব্যবস্থা করব ব্যাটার,' ওমর বলল। 'এখানে ওকে খুঁজে বের করাটা কঠিন হবে না। দুর্গ থেকে জেটিটা দেখা যায় নাকি, হ্যাগেন?'

'না। পাথরের দেয়াল আড়াল করে রেখেছে।'

পাথরের বেড়া ডিঙিয়ে আসতেই জেটিটা দেখা গেল। হাত তুলে বলল হ্যাগেন, 'ওই যে।'

খুদে বন্দর। একসঙ্গে দুটোর বেশি বোটের জায়গা হবে না। একপাশে পাথরের দশ-বারো ফুট উঁচু দেয়াল ঢালু হয়ে নেমে গেছে পানিতে। অন্যপাশে সমান উচ্চতায় পাথর সাজিয়ে দেয়াল তুলে ঢেউয়ের আঘাত ঠেকানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই দেয়ালটার জন্যে সৈকত চোখে পড়ে না। সৈকতের ওই পাশের কিনার থেকে পাহাড় উঠে গেছে। গোড়া থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ওপরের শৈলশিরা পর্যন্ত পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট গাছের ঝোপ আর বেনাবন। শুকিয়ে খসখসে হয়ে আছে। পাহাড়ের জন্যে দ্বীপের ভেতরটা দেখা যায় না। আকাশে সী-গাল উড়ছে। থেকে থেকে কর্কশ চিৎকারে কান ঝালাপালা করছে।

স্ফটিক-স্বচ্ছ পানিতে বোটটা ডুবে থাকতে দেখা যাচ্ছে। পানির সমতল থেকে ওটার কেবিনের ছাত পাঁচ ফুট নিচে। গলুইয়ের নিচে 'ভেগা' নামটা চোখে পড়ছে না।

'এখনও তো দড়িতেই বাঁধা আছে দেখা যাচ্ছে,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ।'

'ব্যাপারটা কেমন না? কেউ যদি ডুবিয়ে দিয়ে থাকে দড়ি কাটেনি কেন?'

'চিন্তা করেছি। দুটো কারণ। দড়ি কাটলে স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্টের কথা ভাবব না, সোজাসুজি ধরে নেব ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় কারণ, বাঁধা না থাকলে স্রোতের টানে ধীরে ধীরে সাগরের দিকে সরে যেতে থাকবে ওটা। অন্য কোন বোট ঢোকার পথ বন্ধ করে দেবে।'

'তারমানে, ভাবছেন, ওই লোকটা মাঝে মাঝে বোট ব্যবহার করে?'

'তা তো করেই। প্লেন বাদে যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা।'

'ভাটা শুরু হলো নাকি?' দেয়াল আর তলায় জন্মে থাকা জলজ উদ্ভিদের

মাথা ভেসে ওঠা দেখে জিজ্ঞেস করল ওমর।
'হ্যাঁ,' জবাব দিল হ্যাগেন।
'ভরা জোয়ারে পানি কতখানি ওপরে ওঠে?' জানতে চাইল কিশোর।
'অতটা খেয়াল করে দেখিনি। পাঁচ-ছয় ফুট হবে। কেন?'
'তাহলে ভাটার সময় কেবিনের ছাত ভেসে ওঠার কথা।'
'হ্যাঁ।'
'খোলের ওপর সমান হয়ে বসে আছে বোটটা।'
'তাতে কি?'
'ভাবছি, পাথরে ঘষা লাগলে খোলের যে কোন একপাশ চিরে যেত। ডুবলে তখন কাত হয়ে থাকত।'
'বলছি তো, পাথরে লেগে ডোবেনি!'
'আমিও সেকথাই বলছি। পাথরে লেগে ডোবেনি, সী-কক খুলে দেয়া হয়েছে। হাঁসের মত এমন সমান হয়ে বসে থাকার এই একটাই কারণ।'
আশা জাগল হ্যাগেনের। উত্তেজিত হয়ে উঠল। 'তাই তো, এ কথাটা তো ভাবিনি! ওপরে তুলে ককটা লাগিয়ে দিলেই ভেসে থাকবে। খোল মেরামতের দরকারই পড়ছে না।'
'কিন্তু তুলবেন কি করে?' ভুরু নাচাল ওমর। 'আমরা সবাই মিলে টানা-হেঁচড়া করেও একচুল নড়াতে পারব না। বরং হয়তো ক্ষতিই করব আরও। তুলতে হলে স্যালভিজ টীম দরকার।'
'বীমা করা আছে?' হঠাৎ প্রশ্ন করল কিশোর।
অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল হ্যাগেন, 'আছে। কেন?'
'ওদের খবর পাঠালেই বোট তোলার সমস্ত সরঞ্জাম নিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসবে। দাম দেয়ার চেয়ে তুলে দিতে খরচ অনেক কম পড়বে ওদের। কিন্তু ওরা এলে সমস্যা আছে।'
'কি সমস্যা?'
'ওদের বোঝানো। পাথরে ঘষা লেগে ডুবলে বোঝানো যেত, দুর্ঘটনায় ডুবেছে বোটটা। কিন্তু এসে যখন দেখবে সী-কক খোলা, কি জবাব দেবেন? আপনাকেই হয়তো সন্দেহ করে বসবে ওরা...'
জ্বলে উঠল হ্যাগেনের চোখ, 'আমাকে সন্দেহ? আমার বোট আমি ডুবিয়ে ওদের ডেকে আনতে যাব কেন?'
'প্রমাণ করতে পারবেন অন্য কেউ ডুবিয়েছে?'
'অ্যা...না। তা পারব না।'
'তাহলে ওরা ফ্যাঁকড়া বাধাবেই। ওদের কাজই সন্দেহ করা...সরাসরি বীমা কোম্পানির কাছে না গিয়ে চেনা কেউ আছে কিনা বলুন, যাকে দিয়ে ওদের বলানো যায়। কিংবা সরাসরি সাহায্য চাওয়া যায়।'
'আছে। আমার এক মামা। এয়ার কমোডোর ড্রেক্সেল ফিলিপ। তার কাছে গেলে...'
তুড়ি বাজাল কিশোর, 'তাহলে তো খুবই ভাল। এয়ার

কমোডোর…অনেক সাহায্য করতে পারবেন তিনি।' ওমরের দিকে তাকাল সে, 'ওমরভাই, কে যাবে? আবহাওয়ার যা অবস্থা এখানে, আমার সাধ্যে কুলাবে না। রবিনের ওপরও ভরসা করা যায় না। এক পারবে মুসা, আর পারবেন আপনি। মুসাকে পাঠালেও বেশ কিছু অসুবিধে আছে। কাউকে কনভিন্স করতে পারবে না সহজে। যাকে বলতে যাবে সে-ই বলবে ছেলেমানুষ, পাত্তাই দেবে না। তা ছাড়া কথা বলতে পারারও ব্যাপার আছে। ইংরেজি ছাড়া আর কিছু বলতে পারবে না মুসা…আপনি যেহেতু এদিকটায় থেকে গেছেন, এদিককার ভাষা…'

'জানি,' তিক্তহাসি হাসল ওমর। 'আর জানি বলেই আসল কাজ বাদ দিয়ে এখন ডাকপিয়নের দায়িত্বটা নিতে হবে আমাকে!'

'এ ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই।'

'সে তো বুঝতেই পারছি।'

'বোট ডুবল, তারমানে খাবারও তলিয়ে গেছে সঙ্গে সঙ্গে।' আসল প্রশ্নটা করল মুসা, 'খাব কি আমরা? বুনো হাঁসের কাঁচা মাংস চিবানো সোজা কথা নয়। ভীষণ শক্ত।'

'যার যার ভাবনা নিয়ে আছে, হাহ্!' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'নেমেই চীজ বারগার আর কাবাব পাবে ভেবেছিলে নাকি?…খাবার ব্যবস্থা হবে, আগে আমার কথা শেষ করতে দাও।' হ্যাগেনের দিকে তাকাল সে, 'মিস্টার হ্যাগেন, ওমরের পরিচয় দিয়ে আপনার মামাকে একটা চিঠি লিখে দিন।…ওমরভাই, এখানে কি ঘটেছে কমোডোর সাহেবকে সব খুলে বলবেন আপনি। সন্দেহের কথাটা জানাবেন। ভেগা কেন ডুবেছে জানার জন্যে রয়্যাল নেভির ফ্রগম্যান পাঠানোর ব্যবস্থা করতে পারবেন কিনা তিনি, জিজ্ঞেস করবেন। ফ্রগম্যান এলে বোট থেকে কিছু মাল তোলারও ব্যবস্থা করা যাবে। আর কিছু না হোক, টিনের খাবারগুলো তুলে আনতে পারলেও খাওয়াটা অন্তত চলে।'

হ্যাগেনের দিকে তাকাল ওমর, 'আর কিছু বলতে হবে?'

মাথা নাড়ল হ্যাগেন, 'আমার কিছু বলার নেই।'

কিশোরের দিকে তাকাল সে।

কিশোর বলল, 'বলবেন, বোটটা তুলে দেয়ার জন্যে যদি স্যালভিজ ক্রু পাঠাতে পারেন, তাহলে আরও ভাল হয়। এ মুহূর্তে মেইনল্যান্ডের স্যালভিজ কোম্পানিগুলোর কাছে সাহায্য চেয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। ওরা আসবে না। মিস্টার হ্যাগেনের কাছে বোট ভাড়া দিতেই রাজি হয়নি কেউ…যত তাড়াতাড়ি পারেন, ফিরে আসবেন। যত বেশি সম্ভব খাবার নিয়ে আসবেন।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল সে, 'হেলিকপ্টারে করে যতটুকু এনেছি, সেটাই আপাতত ভরসা। চলো, নামিয়ে ফেলিগে।'

'তাজা মাংসের ব্যবস্থা করা যায়,' হ্যাগেন বলল। 'আমার পকেটে ছয়টা গুলি আছে। ছিপ আছে। মাছও ধরা যাবে।'

'ভাজবেন কিসে?'

'সেই ব্যবস্থাও করতে পারব,' হাসি ফুটল হ্যাগেনের মুখে। 'বোট থেকে

নামার সময় দরকার লাগবে ভেবে দু'চারটে জিনিস নিয়ে গিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটা ফ্রাইং-প্যান আছে। একটা কেটলি, একটা টীপট, মাছ ধরার সরঞ্জাম ভর্তি একটা ব্যাগ, আর আরও দু'চারটা টুকিটাকি জিনিসও নিয়েছিলাম।'

'চমৎকার! পিকনিক ভালই জমবে। কোথায় ওগুলো?'

আঙুল তুলে পেছনের একটা ভাঙা ঘর দেখাল হ্যাগেন, 'ওর মধ্যে। ভেতরে রেখেছিলাম যাতে বৃষ্টিতে না ভেজে...' বলতে বলতে মুখের ভাব বদলে গেল তার। 'ঠিক!...এখানে যে আছে কেউ, একেবারে শিওর হয়ে গেলাম। আর কোন সন্দেহই নেই। সী-গালে নিশ্চয় বীয়ার খায় না।'

তাকিয়ে রইল কিশোর, 'মানে?'

'মাছ ধরে এসে তৃষ্ণা পাবে ভেবে এক বোতল বীয়ার, একটা ওপেনার আর একটা গ্লাস রেখে গিয়েছিলাম কিনারে। ফিরে এসে বোটটা না দেখে এতই চমকে গিয়েছিলাম, ওগুলো যে নেই, খেয়ালই করিনি। এখন মনে পড়ল।'

'কোথায় রেখেছিলেন?'

'যে পাথরটার ওপর এখন দাঁড়িয়ে আছ তুমি। চ্যাপ্টা বলে বোতল রাখতে সুবিধে ওখানে। বসাও যায় আরাম করে।'

নিচের দিকে তাকাল কিশোর, 'নেই।'

'সেকথাই তো বলছি। যে শয়তানটা আমার বোট ডুবিয়েছে, সে-ই নিয়ে গেছে ওগুলো।'

'আপনি শিওর এই পাথরের ওপরই রেখেছিলেন?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যাগেন। 'হ্যাঁ।'

'হুঁ!' আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল কিশোর, 'কোথায় বসে খেল? এখানে বসে খেয়ে থাকলে শেষ করে আশেপাশে কোথাও বোতলটা ছুঁড়ে ফেলার কথা।'

'খালি বোতল দিয়ে তুমি কি করবে? পাথরে পড়লে নিশ্চয় ভেঙে গেছে, পানি রাখতে পারবে না।'

'পানি রাখব না।'

খুঁজতে শুরু করল কিশোর। দেখাদেখি মুসা আর রবিন যোগ দিল তার সঙ্গে। ওমর আর হ্যাগেনও দাঁড়িয়ে রইল না। গ্লাসটা পাওয়া গেল, ভাঙা। বোতলটাও পাওয়া গেল, আস্ত।

'এই যে, পেয়েছি,' নিচু হয়ে তুলতে গেল হ্যাগেন।

'দাঁড়ান, দাঁড়ান,' দৌড়ে গেল কিশোর।

অবাক হলো হ্যাগেন। সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে হাতে জড়িয়ে বোতলটা তুলে নিল কিশোর। 'আঙুলের ছাপ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। লোকটা পুরানো অপরাধী হয়ে থাকলে পুলিশের ফাইলে তার রেকর্ড থাকবে। নাম জানা যাবে।' বোতলটা বাড়িয়ে দিল, 'ওমরভাই, এটা নিয়ে যান। কমোডোর সাহেবকে বলবেন সাহায্য

করতে।'

সাবধানে রুমালে জড়ানো বোতলটা হাতে নিল ওমর।

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, 'চলো, হেলিকপ্টার থেকে মালগুলো নামিয়ে ফেলি।' হঠাৎ উত্তেজনা ফুটল চেহারায়। 'ভুল হয়ে গেছে! আগে জানলে ওখানেও পাহারার ব্যবস্থা করতাম। এতক্ষণে কপ্টারটা নষ্ট করে দিয়েছে কিনা কে জানে!'

কিশোরের কথায় টনক নড়ল সবার। তাড়াহুড়া করে ছুটল।

পাথর ডিঙাতে ডিঙাতে কিশোর বলল, 'একটা কথা বুঝতে পারছি না। বোট ডোবানোর উদ্দেশ্যটা কি?'

'আমাদের এখানে আটকে ফেলার জন্যে,' হ্যাগেন বলল, 'এ ছাড়া অন্য কি কারণ থাকতে পারে?'

'আমার তা মনে হয় না। আটকে রাখার চেয়ে বিদেয় করতে পারলে বরং বাঁচে সে। সুবিধে হয়।'

'ভেবেছে আটকে ফেলতে পারলে না খেয়ে মরব। এখানে সেটা ঘটা খুব স্বাভাবিক। শত্রুর শেষ, ঝামেলাও শেষ। বাইরে থেকে আনা খাবার না থাকলে বন্দুক দিয়ে শিকার করে আর কদ্দিন টিকতে পারব।'

'জানল কি করে আপনি বোট নিয়ে এখানে আসছেন? আসার পথে দ্বীপের কাছাকাছি কোন বোট-টোট দেখেছেন?'

'না।'

'আসার সময় দ্বীপের একটা পাশ দেখেছেন, অন্য পাশটা দেখেননি। একসঙ্গে দুদিকে নজর রাখা সম্ভব নয়। অন্যপাশে বোট থাকতে পারে।'

'না, পারে না। ওই পাশে বোট ভিড়িয়ে নামা অসম্ভব। নামতে হলে এদিকে আসতেই হবে।'

'প্লেনে করে নামিয়ে দিয়ে যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা পারে। আমার আসার আগেই ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছে হয়তো।'

'ওকে ওকে করছেন কেন? একজন না হয়ে দু'জন তিনজন বা আরও বেশিও থাকতে পারে।'

'তা-ও বটে। এটা অবশ্য ভাবিনি!'

'তাহলে কি এখানে থাকা উচিত হবে আমাদের?' রবিনের প্রশ্ন।

'তো কি কাজটা আধখাপচা ফেলে রেখে চলে যাব?' কিশোর বলল। 'এসে গেছি।...ওমরভাইকে যত জলদি পারা যায় বিদেয় করা দরকার। তাড়াতাড়ি গেলে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে পারবেন।'

'জিনিসগুলো রাখব কোথায়?' জানতে চাইল মুসা।

'আপতত ওই কটেজটাতেই, হ্যাগেন যেটাতে রেখেছে। এরচেয়ে ভাল আরেকটা জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত।'

'দুর্গে রাখলে কেমন হয়?' রবিন বলল।

মাথা নাড়ল কিশোর, 'এ মুহূর্তে ওই জায়গাটা এড়িয়ে চলাই সবচেয়ে

বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'তোমার ধারণা ওখানেই ঢুকে বসে আছে শত্রুপক্ষ?'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'কটেজের মধ্যে ঠাণ্ডা লাগবে খুব।'

'কিছু করার নেই।'

মাল নামাতে শুরু করে দিয়েছে মুসা। খাবার ভর্তি ছোট একটা বাক্স বাড়িয়ে দিল নিচে দাঁড়ানো কিশোরের দিকে। জরুরী মুহূর্তের জন্যে আনা হয়েছিল এ খাবার।

'কি কি আছে ওর মধ্যে?' জানতে চাইল হ্যাগেন।

'বিস্কুট,' জবাব দিল কিশোর, 'দুই টিন গরুর মাংস, কয়েক টিন মাখন, জ্যাম, চিনি, পনির, কনডেন্স মিল্ক আর চা।'

'আনাতে ভালই হয়েছে। কিন্তু তোমরা জানতে আমি সবই নিয়ে যাচ্ছি। এগুলো আনতে গিয়েছিলে কেন আবার?'

'অভ্যাস। এ ধরনের অভিযানে আগেও বেরিয়েছি আমরা। জানি, যে কোন সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই সাবধান থাকি।' মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'মুসা, হ্যাভারস্যাকটা দাও।'

ওমরও উঠে গেছে ওপরে। গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দূরবীনটা রাখবে নাকি?'

'দিন। কাজে লাগতে পারে। পিস্তলগুলোও দিন। মুসা, গুলির ক্লিপগুলোও নিয়ে নাও।'

একটা ভুরু উঁচু করে ফেলল হ্যাগেন। 'ওগুলোর দরকার হবে?'

'না হলেই খুশি হব। কিন্তু যারা বোট ডুবিয়ে এতগুলো মানুষকে বিপদে ফেলে দিতে পারে, তাদের কোনমতেই বিশ্বাস করা উচিত না।'

জিনিসপত্র নামানো হলো। একটা টর্চ তুলে নিয়ে পকেটে ভরল কিশোর।

কপ্টার থেকে নেমে এল মুসা।

তিন

নামে কটেজ। আসলে অতি সাধারণ একটা কুঁড়ে। একটামাত্র ঘর। খড়ের চালার কিনারগুলো খসে পড়েছে। পাথরের দেয়াল। বাতাস ঠেকানোর জন্যে তৈরি। ঘরের লাগোয়া ছোট আরেকটা ঘের দেয়া চালা তৈরি করা হয়েছে। ওটা পায়খানা। খানিক দূরে আবর্জনার স্তূপ। কাঁচা মেঝে। কিন্তু বহুকাল ধরে ব্যবহারের ফলে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে। পাথরে তৈরি একটা ফায়ারপ্লেস আছে। চুলার বদলে রয়েছে পাথরের ওপরে পাশাপাশি ফেলে রাখা দুটো শিক। তার ওপর হাঁড়ি চড়িয়ে নিচে আগুন জ্বেলে রান্নার ব্যবস্থা। কিছু লাকড়িও পড়ে আছে একপাশে। চার ফুট লম্বা, চার ফুট চওড়া একটা চ্যাপ্টা

তক্তা পড়ে আছে—স্রোতে ভেসে এসেছিল বোধহয়, তুলে এনে রাখা হয়েছে; যেটা ঘরের একমাত্র আসবাব, টেবিল হিসেবে ব্যবহার করা হত। দেয়ালে দুটো লম্বা কুলুঙ্গিমত তৈরি করা হয়েছে। ঝোপের ডালপাতা বিছিয়ে রাখা হয়েছে একটাতে।

'ওটা আমার বিছানা,' হেসে জানাল হ্যাগেন।

'আরাম কি লাগে ওখানে?' জবাব দিল কিশোর।

'এরচেয়ে বেশি আরাম আর সম্ভব না। এখানে যারা বাস করত তাদের জন্যে এরচেয়ে বেশি আর কি। দোতলা বানায়নি। কে যায় শুধু শুধু ঠাণ্ডায় মরতে। কয়লা দিয়ে আগুন জেলে সারাক্ষণ বসে থাকত তার কাছে, কিংবা বিছানায় কাটাত, শীতকালে বাইরেই বেরোত না।'

'বদ্ধ থাকার কারণেই গন্ধ হয়ে আছে ঘরটা,' নাক কুঁচকে বলল মুসা।

'ঠাণ্ডায় জমে মরার চেয়ে গন্ধ সহ্য করা ভাল।'

একটা প্রাইমাস স্টোভ দেখে খুশি হলো কিশোর, বোট থেকে নিয়ে এসেছিল হ্যাগেন, 'দারুণ!'

'দারুণের কি হলো?' বুঝতে পারল না হ্যাগেন।

'লাকড়ির আগুন ছাড়াই পানি ফুটাতে পারব।'

'তাতে সুবিধেটা কি?'

'ধোঁয়া হবে না।'

'হলেই বা কি? আমার দ্বীপ, আমার যত ইচ্ছে ধোঁয়া করব, কার কি?'

'শত্রুকে এখনই জানাতে চাই না কোথায় উঠেছি আমরা।'

'কিন্তু আমরা দুর্গে ঢুকলেই তো জেনে যাবে।'

'কে বলল এখনই দুর্গে ঢুকতে যাচ্ছি আমরা?'

অবাক হলো হ্যাগেন। 'আমি তো ভেবেছিলাম ওই কাজটাই প্রথম করবে তুমি।'

'না। পরে। আপাতত দুর্গের ধারেকাছেও যেতে চাই না আমি। শত্রুই বরং আমাদের কাছে আসুক।'

'আসবেই, কি করে জানলে?'

'কমন সেন্স আর মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে সামান্য ধারণা। আমাদের কিছু করতে না দেখলে আমরা কি করছি জানার জন্যে অস্থির হয়ে যাবে সে। আমরা এখনও রয়েছি কিনা দ্বীপে এ ব্যাপারেও শিওর নয় সে। হেলিকপ্টারটা চলে যেতে শুনেছে। ও ধরে নিয়েছে, বোট ডুবে গেছে দেখে থাকার আশা বাদ দিয়ে আপনিও আমাদের সঙ্গে চলে গেছেন। দুর্গ থেকে দ্বীপটা দেখা যায় না। সুতরাং আমরা কি করেছি চোখে পড়ার কথা নয় তার। কি বলছি, বুঝতে পারছেন?'

'পারছি।'

'আমরা দেখা না দিলে বিপদে পড়ে যাবে সে। আমরা আছি কিনা, কয়জন আছি, কি করছি, কিছুই জানতে পারবে না। ধোঁয়া দেখে আমাদের সন্দেহ জাগতে পারে ভেবে আগুন জ্বালতে সাহস করবে না। এক কাপ চা করে,

খেতেও দশবার ভাববে। আমরা চুপচাপ বসে থাকব এখানে। উৎকণ্ঠা সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে আসবে সে। বেশি হলে দুই দিন, তার বেশি লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আমাদের কাছে খাবার আছে, দুটো দিন সহজেই ঘরে বসে থাকতে পারব আমরা। ততদিনে ওমরভাইও সাহায্য নিয়ে ফিরে চলে আসবে।'

খাবারের কথায় পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল মুসার, 'শুকনো মুখে বসে না থেকে খেতে খেতেও কথা বলতে পারি আমরা। লাঞ্চের সময় তো নিশ্চয় হয়ে গেছে, নাকি?'

হেসে ফেলল কিশোর। 'রবিন, স্টোভ জেলে কেটলিতে পানি চড়িয়ে দাও। মুসা, মাংসের টিন খোলো।' হ্যাগেনের দিকে তাকাল, 'খাওয়ার পানি আনেন কোত্থেকে?'

'আমাদের পেছনের পাহাড়ে কয়েকটা ঝর্না আছে।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর।

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল মুসা।

'একটু ঘুরে দেখে আসি।' হ্যাগেনের দিকে ফিরল কিশোর, 'আমাদের পেছনে যে শৈলশিরাটা আছে, ওখান থেকে দুর্গটা দেখা যায়?'

'যায়।'

'কোথায় কি আছে নিজের চোখে দেখে আসা দরকার। বলা যায় না, হেলিকপ্টার চলে যেতে দেখে এতক্ষণে হয়তো রওনা হয়ে পড়েছে আমাদের শত্রুটি। অবশ্য খুব বেশি অস্থির স্বভাবের হলে। হঠাৎ এসে আমাদের চমকে দিক, সেটা চাই না। ও আমাদের দেখার আগেই ওকে আমাদের দেখে নিতে হবে।'

'হুঁ।'

দূরবীনটা তুলে নিল কিশোর। 'শৈলশিরা থেকে দুর্গটা কদ্দূর?'

'আধমাইল মত।'

'ঠিক আছে। যাবেন? আসুন। জায়গাটা আপনার চেনা, সঙ্গে থাকলে সুবিধে হবে।'

হ্যাগেনের সঙ্গে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে শৈলশিরার দিকে উঠতে শুরু করল কিশোর। এখানে এই পাহাড়টার জন্যে দ্বীপের ভেতরটা চোখে পড়ে না।

দুর্গ থেকে চোখে পড়ার আশঙ্কায় শেষের দিকে কয়েক গজ হামাগুড়ি দিল দুজনে। উঠে এল শৈলশিরায়। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসে পাহাড়ের অন্যপাশে কি আছে দেখতে লাগল কিশোর। হ্যাগেন বসল তার পাশে। পাহাড়ের গোড়া থেকে শুরু হয়েছে বেনায় ছাওয়া উষর প্রান্তর। মাঝে মাঝে ঘন সবুজের ছোপ, ভেজা জায়গার লক্ষণ। হাইল্যান্ডের স্বাভাবিক তরাই অঞ্চল। আপাতদৃষ্টিতে সমতল মনে হলেও সমতল নয় জায়গাটা, উঁচুনিচু ঢেউ আছে প্রচুর। ঢেউয়ের খাঁজগুলোতে ইচ্ছে করলে বহুলোক লুকিয়ে থাকতে পারে।

মাত্র দুটো বিল্ডিং চোখে পড়ছে এখান থেকে–একটা দুর্গ, আরেকটা ওই

পরিত্যক্ত লাইটহাউস।

খালি চোখে এর বেশি দেখা গেল না। খাপ থেকে দূরবীনটা বের করল। লেন্সে হাত চাপা দিয়ে রাখল যাতে রোদে না চমকায়। যেদিকটা দেখতে চায় সেদিকে ঘুরিয়ে আস্তে হাত সরিয়ে আনল। না নাড়লে ঝিক করে উঠবে না, দুর্গ থেকে চোখে পড়বে না। কয়েক মিনিট ধরে দেখল দুর্গটা, লাইটহাউস আর আশেপাশের জমি।

'সন্দেহের কিছু আছে?' জানতে চাইল হ্যাগেন।

'কিচ্ছু নেই। কিছু নড়ছে না। ধোঁয়ার কোন চিহ্ন নেই। নিজেই দেখুন,' দূরবীনটা বাড়িয়ে দিল কিশোর।

ভাল করে দেখে কিশোরের সঙ্গে একমত হলো হ্যাগেন। 'হয় দুর্গে লুকিয়ে আছে, নয়তো লাইটহাউসে।'

'বাকি ঘরবাড়িগুলো কোথায়?'

'আমাদের বাঁয়ে একটা নিচু জায়গায়।'

'লকটা?'

'আরও বাঁয়ে। ওটা থেকে বেরিয়ে যে নদীটা গিয়ে সাগরে পড়েছে, সেটা একেবারে দক্ষিণে।'

'দুর্গ থেকে বেশ দূরে, তাই না?'

'দুই মাইল।'

'গুড। দেখা হয়েছে। চলুন।'

ফিরে এসে দেখল খাবার আর চা রেডি।

'কি করে এলে?' জানতে চাইল রবিন।

'কি আর করব, শত্রুপক্ষেরই দেখা নেই,' জবাব দিল কিশোর। কি মনে হতে হ্যাগেনের দিকে তাকাল, 'আপনার শিকারের মাংস কোথায়? আছে নাকি কিছু?'

'শুধু হাড্ডি। সাগরে ফেলে দিয়েছি। আজ সকালে আবার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তোমরা কখন চলে আসো, এ জন্যে যেতে পারিনি। কেন? পাখি আর খরগোশের মাংসের লোভ হয়েছে নাকি?'

'চারজন লোকের অনেক খাবার দরকার। টিনের খাবারে আর কতক্ষণ। কিন্তু এখনই দরকার নেই। গুলির শব্দ শুনে ফেলবে। কাল সকাল পর্যন্ত সময় দেব ওকে। তারপর বেরোব।'

'বিকেলে কি করবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'কিছুই না। আর যাই করি, শুয়ে থাকতে পারব না। ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে বন্দুকের মত শব্দ হবে না। হ্যাগেন, আপনি ইচ্ছে করলে নদীতে চলে যেতে পারেন। দু'একটা স্যামন কিংবা ট্রাউট ধরতে পারলে রুচি বদল করা যায়।'

'তা ঠিক। ছিপ তো রেখেই এসেছি।'

'মুসাকে নিয়ে যান। ও মাছ ধরতে পছন্দ করে। রবিন আমার সঙ্গে থাক।'

'পাথরের খাঁজে নাকি প্রচুর গলদা চিঙড়ি আছে। ধরে এনে তাজা তাজা

ভাজা করতে পারলে...আহ্!' জিভে আসা পানি টুপ করে গিলে ফেলল মুসা।
'ধরো তো আগে। তারপর দেখা যাবে,' হেসে বলল রবিন। 'ভাজা করা আমার দায়িত্ব।'
'আসতে হয়তো দেরি হতে পারে আমাদের,' হ্যাগেন বলল।
'কেন?' ভুরু নাচাল কিশোর।
'ট্রাউটেরা বেশি খায় সূর্য ডোবার পর।'
'যতক্ষণ খুশি লাগানগে। রাতে তাজা মাছ পেলেই আমি খুশি। আপনারা মাছ ধরুনগে, আমরা ততক্ষণে জিনিসপত্র যা আছে, কোথাও লুকিয়ে ফেলব। বলা যায় না, কোন্ ফাঁকে এসে আবার নষ্ট করে দিয়ে যায়। তাহলে ভীষণ বিপদে পড়ব। এখন চলুন, সবাই মিলে দেখে আসি আগে, ভাটার সময় পানি কতটা নামল।'
পানি অনেক নেমেছে। ভেগার ছাতের মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপরে ঢেউ খেলছে।
হ্যাগেনের দিকে তাকাল মুসা। 'আপনার মালপত্র কোথায় রেখেছেন?'
'সামনে, পেছনে, দুদিকেই লকার আছে।'
'কেবিন থেকে ঢোকা যায়?'
'যায়। কেন?'
'পানি খুব কম। ঢুকে কিছু জিনিস বের করে আনা যায় কিনা দেখতাম।'
মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখনই ঝুঁকি নেয়ার কোন মানে হয় না। আটকা পড়লে মরবে। এতটা কোণঠাসা হইনি আমরা এখনও। খাবারের খুব বেশি সমস্যা হলে তখন দেখা যাবে।'
'আমি কিন্তু ঝুঁকি তেমন একটা দেখতে পাচ্ছি না। পানি তো একেবারেই কম...'
'একটা কথা মাথায় আনছ না। বোটটা সমান হয়ে বসে আছে। তুমি উঠলেই একদিক ভারী হয়ে গিয়ে কাত হয়ে যেতে পারে। তখন পড়বে বিপদে। আপাতত ঢোকার চিন্তাটা বাদ দাও না মগজ থেকে।'
হাত তুলল মুসা, 'বেশ দিলাম।'
হ্যাগেন বলল, 'দেখা তো হলো। এবার মাছ ধরতে যাওয়া যায়, নাকি?'
'যান। সাবধান থাকবেন। কোনমতেই যেন দুর্গ থেকে দেখা না যায়। তেমন জায়গায় যাবেন না।'
'সেটা আর বলে দিতে হবে না।'
রওনা হলো হ্যাগেন আর মুসা। সৈকত ধরে এগোল।
রবিনকে নিয়ে ফিরে চলল কিশোর। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'পালা করে পাহারা দিতে হবে আমাদের।'
'এত সাবধান থেকে পরে যদি দেখা যায় সব মিছে, কেউ নেই দ্বীপে, তাইলে হ্যাগেনের কাছে আর মুখ থাকবে না।'
'অসাবধান থেকে যদি বিপদে পড়ি, শত্রুপক্ষ আমাদের সর্বনাশ করে ছাড়ে, তাহলে মুখ আরও থাকবে না। দূরবীন নিয়ে ওপরে উঠে যাও।

শৈলশিরায় বসে চোখ রাখবে। খুব সাবধান, কাঁচের ঝিলিক যেন না দেখা যায়। তোমাকেও যেন চোখে না পড়ে। নড়াচড়া একদম বন্ধ। এ ধরনের খোলা জায়গায় সামান্যতম নড়াচড়াও বহুদূর থেকে চোখে পড়ে। সন্দেহজনক কিছু দেখলে পাখির মত শিস দেবে। এক ঘণ্টা পর আমি এসে বসব তোমার জায়গায়। এখন আমি গিয়ে জিনিসপত্রগুলো লুকিয়ে ফেলি।'

'যাও।'

দূরবীন গলায় ঝুলিয়ে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল রবিন। শেষ কয়েক গজ কিশোর আর হ্যাগেনের মতই হামাগুড়ি দিয়ে উঠল। শৈলশিরায় লুকিয়ে বসে নিচের তরাই অঞ্চলের দিকে তাকাল। সবুজ ছোপগুলোতে মাঝে মাঝে নড়াচড়া চোখে পড়ছে। কিসের নড়াচড়া বুঝতে অসুবিধে হলো না। শিকারী হলে বন্দুক নিয়ে ছুটে যাওয়ার কথা ভাবত। কিন্তু সে শিকারী নয়, অহেতুক প্রাণীহত্যা পছন্দ করে না; আর শিকারী হলেও শত্রুর চোখে পড়ার ভয়ে এ মুহূর্তে শিকার করতে যেত না।

কিশোর ওদিকে জিনিসগুলো সব ঘরের এককোণে সরিয়ে ফেলে ঝোপের ডালপাতা দিয়ে ঢেকে দিল, যাতে কোন দিক দিয়েই দেখা না যায়। একই জিনিস দিয়ে বিছানা পেতেছে হ্যাগেন। কেউ এসে কোণের দিকে তাকিয়ে ডালপাতাগুলো দেখে কিছু সন্দেহ করবে না। কিশোর আরও ডালপাতা এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিল কয়েকটা বিছানার জন্যে। শুধু ঘরের মাঝখানের একটুখানি জায়গা খালি রাখল। কাজ সারতে সারতেই কেটে গেল একটা ঘণ্টা। উঠে এল রবিনের কাছে।

'কিছু দেখলে?'

'না। কেউ সত্যি আছে কিনা, সন্দেহটা এখনও যায়নি আমার। বাড়ছে।'

'তাহলে বোটটা ডোবাল কে? তারপর আছে বীয়ারের বোতল। বলতে পারো, লোকটা অকাজগুলো সেরে কেটে পড়েছে কিনা। সেটাও সম্ভব না। প্লেন কিংবা বোট ছাড়া বেরোতে পারবে না এ দ্বীপ ছেড়ে। গেলে এঞ্জিনের শব্দ নিশ্চয় শুনতে পেত হ্যাগেন।'

নিচে গিয়ে কাজ নেই, তাই কিশোরের সঙ্গেই বসে রইল রবিন। কিছুই ঘটছে না, মাঝে সাঝে লকের দিক থেকে হাঁস উড়ে যাওয়া ছাড়া।

'মুসাদের দেখে উড়ে যাচ্ছে বোধহয় ওগুলো,' কিশোর বলল।

আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে নেমে গেল রবিন। কয়েক মিনিট পর তার শিস শুনে কিশোর বুঝল, চা বানানো হয়ে গেছে। নেমে এসে চা খেয়ে আবার ওপরে উঠল দুজনে।

সাতটা পর্যন্ত পাহারা দিল ওরা। গোধূলির আলোও কমে গেছে। অস্পষ্ট হয়ে এল সব কিছু। আর বসে থাকার মানে হয় না। আকাশে মেঘ। বাতাস কনকনে ঠাণ্ডা। রাতে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা আছে। রাত কাটানোর জন্যে যেমনই হোক একটা আশ্রয় থাকায় মনে মনে খুশি হলো কিশোর। এই আবহাওয়ায় খোলা আকাশের নিচে কাটানো ভীষণ কষ্টকর।

দরজার কাছে একটা পাথর এনে রেখেছে সে। সেটাতে বসল।

'মুসারা এত দেরি করছে কেন?' রবিনের প্রশ্ন।
'আস্তে। এখন থেকে নিচুস্বরে কথা বলবে। অন্ধকারে লুকিয়ে যে কেউ চলে আসতে পারে কটেজের কাছে।'
'এখন আসবে না।'
'তোমার সন্দেহটা গেল না।'
'কিন্তু ওরা এত দেরি করছে কেন?'
'কি করে বলি। আমি তো তোমার সঙ্গেই ছিলাম।'
কথা না পেয়ে চুপ করে রইল দুজনে। ঘন হচ্ছে অন্ধকার। যেন বিশাল এলাকা জুড়ে আকাশ থেকে নেমে আসছে কালো রঙ, ঢেকে দিচ্ছে চরাচর। পাথরের ফাঁকে বয়ে যাওয়া ঝর্নার পানির কুলকুল ছাড়া আর কোন শব্দও নেই। সী-গালেরাও ঘুমিয়ে পড়েছে।
ঠাণ্ডা পড়ছে। ঘরে ঢুকে গেল ওরা।
আরও কিছুক্ষণ পর কিশোরও রবিনের মতই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। 'এত দেরি তো করার কথা নয়? হ্যাগেন পথ চেনে। অন্ধকারে অন্য দিকে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।'
'কিছু ঘটল নাকি?'
'ঘটতে তো পারে অনেক কিছুই। জলাভূমিতে আটকা পড়তে পারে, সাপের কামড় খেতে পারে, পাথরে পিছলে পড়ে পা ভাঙতে পারে, পাহাড়ের ওপর থেকে পড়ে যেতে পারে...'
'থাক থাক, আর বোলো না!'
কয়েক মিনিট পর হঠাৎ কঁক কঁক করে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল কয়েকটা বনমোরগ। মুসারা আসছে ভেবে নাম ধরে ডেকে উঠতে যাচ্ছিল কিশোর। চুপ হয়ে গেল সময়মত।
দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল দুজনে। শব্দটা এসেছে মুসারা যেদিকে গিয়েছিল, তার উল্টো দিক থেকে। ওদের পেছন থেকে। সৈকতের দিক থেকে নয়। সেজন্যেই সাবধান হয়ে গেছে কিশোর।
সময় কাটতে লাগল। অনেকক্ষণ কেটে যাওয়ার পরও যখন কিছু ঘটল না, রবিনের মনে হতে লাগল শেয়াল দেখে ভয় পেয়ে উড়ে গেছে মোরগগুলো, ঠিক এই সময় কথা শোনা গেল, 'চলে গেছে ও।'
তার কথার জবাব দিল আরেকটা কণ্ঠ, 'তাই তো মনে হচ্ছে। তোমার কথাই ঠিক।'
কথায় কড়া স্কট টান।
এক মুহূর্ত নীরব থেকে আবার বলল আগের কণ্ঠটা, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। দিনে এসে দেখে যাব আবার। চলো।'
'ফিরে আসবে ভাবছ?'
'গাধা না হলে আসবে না।'
অতটা নিশ্চিন্ত হতে পারল না অন্যজন। 'হ্যাগেনদের অত বোকা ভেবো না। সাহসও কম নেই।'

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওঠার খসখস শব্দ হলো। নামার সময় সতর্ক ছিল, নিঃশব্দে নেমেছে। এখন আর প্রয়োজন বোধ করছে না।

লোকগুলো চলে গেলে ফিসফিস করে বলল কিশোর, 'কি বুঝলে?'

'তোমাদের কথাই ঠিক...'

কয়েক মিনিটের জন্যে মুসাদের কথা ভুলে গিয়েছিল ওরা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভাবার অবকাশ ছিল না–লোকগুলো থাকতে থাকতে দুজনে চলে এলে কি অঘটন ঘটতে পারে। অল্পক্ষণ পরেই সৈকতের দিক থেকে ওদের কথা শোনা গেল। কথা বলতে বলতে আসছে। কয়েক মিনিট পরই এসে হাজির হলো। হ্যাগেনের হাতের ছিপটা অন্ধকারেও দেখা যাচ্ছে।

'অনেক দেরি করলেন,' কিশোর বলল।

'ট্রাউট ধরতে দেরিই হয়। অন্ধকার না হলে আসে না। একটা যা ধরেছি না, দেখলে বুঝবে। ছোট আছে তিনটা। বড়টা ধরলাম শেষে। ওটাই দেরিটা করাল। উঠতেই চায় না। লুকিয়ে পড়ল গিয়ে পাথরের খাঁজে। অন্ধকারে টেনে বের করতে ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে।'

'আটকে দিয়ে ভাল করেছে। নইলে ধরা পড়ে যেতাম।'

'মানে! এসেছিল নাকি ওরা?'

'এই তো, কয়েক মিনিট আগে গেল। দুইজন।'

অন্ধকারে শোনা গেল মুসার গলা, 'খাইছে!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ থাকার পর জিজ্ঞেস করল হ্যাগেন, 'তোমাদের দেখেনি তো?'

'না।'

'কিছু বলেছে?'

'বেশি না। আপনি চলে গেছেন নাকি দেখতে এসেছিল। আপাতত সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেলেও চলে যে যাননি বুঝতে সময় লাগবে না।'

'কারা ওরা, কিছু অনুমান করতে পারো?' মুসার প্রশ্ন।

'মুখ দেখিনি। কথার টান শুনে বুঝেছি একজন ইংরেজ, আরেকজন স্কট–স্থানীয় কেউ হবে, মেইনল্যান্ড থেকে এসেছে। হ্যাগেনদের ভাল করে চেনে।'

'হুঁ,' হ্যাগেন বলল, 'সন্দেহ দূর হলো আমাদের। শিওর হয়ে গেলাম, ওরা দ্বীপেই আছে। এরপর করণীয় কি আমাদের?'

'ভাবতে হবে,' জবাব দিল কিশোর। 'আজ রাতে আর কিছু করতে যাব না। খেয়েই শুয়ে পড়ব।'

'পাহারা দেয়ার দরকার আছে?'

'মনে হয় না। ওরা জেনে গেছে এখানে কেউ নেই। দিনের আগে আর আসবে না। ততক্ষণ আমরা নিশ্চিন্ত।'

চার

গভীর ঘুম থেকে চমকে জেগে গেল রবিন। কোন কিছু ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে তার। নড়ল না সে। কান পেতে রইল। কিসের শব্দ ঘুম ভাঙিয়েছে তার, নিশ্চিত হতে পারছে না; তবে মনে হচ্ছে দূরে কারও চিৎকার কিংবা ডাক শুনেছে। ক'টা বেজেছে বলতে পারবে না। এখনও অন্ধকার। গাঢ় অন্ধকার। দরজাটা খোলা থাকা সত্ত্বেও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তারা চোখে পড়ছে না। আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। আস্তে উঠে বসল। ঘরের কোথায় কি আছে বোঝার চেষ্টা করল, নতুন কোন ঘরে ঘুমালে জেগে উঠে মানুষ যা করে থাকে।

কিশোরও জেগে আছে। অন্ধকারে শোনা গেল ওর ফিসফিসে কণ্ঠ, 'শব্দ কোরো না। আলো জ্বেলো না।'

'কি হচ্ছে বলো তো?'

'বুঝতে পারছি না। সৈকতে কিছু ঘটছে। অন্ধকারে আলো ব্যবহার করার কথা। কিন্তু দেখা তো যাচ্ছে না।'

ওদের কথা শুনে বাকি দুজনও জেগে গেল। কি হয়েছে জানতে চাইল।

রবিনকে যা বলেছে, ওদেরও সেটাই বলল কিশোর। 'আমি শিওর, চিৎকার শুনেই ঘুমটা ভেঙেছে আমার।'

'কিছু চোখে পড়েনি?' জানতে চাইল হ্যাগেন।

'না। আকাশে ঘন মেঘ। ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছে। চোখের সামনে হাত আনলে দেখা যাবে না, এত অন্ধকার। আলোও তো দেখতে পাচ্ছি না সৈকতে।'

'কি হচ্ছে অনুমান করতে পারছ?'

'নাহ্।'

'পাহাড়ে চড়ে দেখব নাকি?'

'এই আবহাওয়ায়? পাথর ভিজে পিচ্ছিল হয়ে গেছে। অন্ধকারে পা পিছলে পড়লে মারা যাবেন। আলো জ্বালতে পারলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু এখন আলো জ্বালার মানে ওদের চোখে পড়ে যাওয়া।'

'ক'টা বাজে?' জানতে চাইল মুসা।

'চারটের কিছু বেশি।'

'তারমানে ভরা জোয়ার।'

'তাই হবে।'

'তুমি কোন্খানে? দেখতে পাচ্ছি না।'

'দরজার কাছে।'

কিশোরের কণ্ঠটা কোন্খান থেকে আসছে আন্দাজ করে বাকি তিনজনও দরজার কাছে চলে এল।

চারজনের মধ্যে মুসার কানের জোর বেশি। প্রথমে ঢেউয়ের শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনল না। তারপর আলাদা করে চিনতে পারল আরও একটা মৃদু শব্দ। মানুষের কণ্ঠ। বিচিত্র একটা ঘষার শব্দের পর চাপা একটা চিৎকারও যেন কানে এল।

হ্যাগেনও শুনতে পেয়েছে। 'সৈকতে কেউ আছে। রাতের বেলা, এই বৃষ্টির মধ্যে কি করছে ওরা?'

সময় কাটতে লাগল। পাঁচ মিনিট। দশ। বিশ। আর শব্দ শোনা গেল না।

'মনে হয় চলে গেছে,' হ্যাগেনই বলল আবার।

'দেখব নাকি বাইরে গিয়ে?' প্রস্তাব দিল মুসা।

'না। হাত-পা ভাঙার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?'

আরও কিছুক্ষণ দরজার কাছে বসে থাকার পরও যখন কিছু শুনল না, ঘরের ভেতর ফিরে এল ওরা। কিশোর বলল, 'বাইরে গিয়ে শুধু শুধু ভেজার কোন মানে হয় না। জামা-কাপড় ভিজিয়ে শেষে মুশকিলে পড়ে যাব।'

'তা ঠিক,' হ্যাগেন বলল। 'ম্যাকিনটশ আনতে পারলে ভাল হত।'

'তা তো হতই। কিন্তু এই অবস্থা হবে যে কে জানত। তাহলে বোটটাও খোয়াতে হত না আপনাকে।'

'হুঁ!'

'এখন আমাদের ধৈর্য ধরতে হবে। বৃষ্টিতে ঝামেলা করলেও একটা সুবিধেও হয়েছে, ধোঁয়া ওপরে ওঠার ভয় নেই। আগুন জ্বালানো যেতে পারে। আবার শুতে ইচ্ছে করছে না। ভোর হতে বড়জোর আর ঘণ্টাখানেক। এই সুযোগে মাছ ভেজে নিয়ে নাস্তাটা সেরে ফেলা যায়। রবিন, স্টোভটা ধরাও। চা বসাও।'

'তা ধরাচ্ছি। কিন্তু অন্ধকারে মাছ কাটব কি করে? টর্চ জ্বেলে নেব নাকি?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বলল কিশোর, 'তা জ্বালানো যায়। বৃষ্টির জন্যে দূর থেকে দেখা যাবে না।'

শুকনো ঝোপঝাড় জড় করে লাইটার জ্বেলে আগুন ধরিয়ে ফেলল মুসা। লাইটারটা পাওয়া গেল হ্যাগেনের কাছে। পকেটে রেখে দিয়েছিল।

আগুন জ্বলতেই ঘরের অন্ধকার কেটে গেল কিছুটা। সবাই হাত বাড়িয়ে এল সেঁকার জন্যে। ঘরের ভেতর মাছ কাটলে দুর্গন্ধ হয়ে যাবে, সেজন্যে মাছ আর টর্চ নিয়ে বাইরে চলে গেল মুসা।

সাবধান করে দিল কিশোর, 'দেখো, ঢেকেঢুকে রেখো। আলো ওপর দিকে তুলো না।'

কিছুক্ষণ পর কাটা মাছগুলো একটা ভাঙা গামলায় করে নিয়ে এল মুসা। কয়েকটা ভাঙা বাসনও এনেছে।

মুচকি হাসল কিশোর। 'কোথায় পেলে ওগুলো?'

'আবর্জনার স্তূপে।'

মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল কিশোরের হাসি। 'কোথায়?'

'আবর্জনার স্তূপে। দিনের বেলায়ই দেখেছিলাম। কাটা মাছ মাটিতে

রাখলে বালি লেগে যাবে, দাঁতে কচকচ করবে। সেজন্যে গামলাটায় রেখেছি।'

'আবর্জনা থেকে বালি ভাল ছিল না?'

'না। ভাল করে ধুয়ে এনেছি। সেজন্যেই এত সময় লেগেছে।'

কাঠিতে গেঁথে মাছের ছোট ছোট টুকরোগুলো আগুনের ওপর ধরতে লাগল মুসা আর হ্যাগেন। কাবাবের সুগন্ধ ভুরভুর করতে লাগল ঘরের মধ্যে।

'মাছের মধ্যে তাজা ট্রাউটের মাংসের তুলনা হয় না,' হ্যাগেন বলল। 'যাই হোক, খাওয়ার ব্যবস্থা তো হলো। কিশোর, কি করবে কিছু ভেবেছ?'

রবিনের চা করা হয়ে গেছে। সেদিক থেকে চোখ ফেরাল কিশোর, 'সৈকতের ঘটনাটার পর থেকে দুটো কথা ভাবছি। কোনটা ভাল হবে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ওরা যে আছে, এটা তো জানা হয়ে গেল এখন। হয় ওদের আসার অপেক্ষায় বসে থাকতে হবে আমাদের, নয়তো ওদের কাছে নিজেদেরই যেতে হবে। দুর্গ থেকে খোঁজা শুরু করা যেতে পারে। তবে এখুনি সেরকম কিছু করার দরকার আছে কিনা ভেবে দেখতে হবে। প্রথমত, আমাদের তাড়া নেই। দ্বিতীয়ত, ওমরভাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে চাইছি। কি খবর নিয়ে আসে জানা দরকার। তা ছাড়া দুর্গ আক্রমণ করতে যেতে হলে আমাদের লোকবলও দরকার। ওরা থাকবে দুর্গে, নিরাপদ; আমরা যাব খোলা জায়গা দিয়ে, ওদের সহজ নিশানা হয়ে। আমাদের দেখলেই হয়তো লুকিয়ে পড়বে। আক্রমণও করে বসতে পারে। এক্ষুণি যুদ্ধ ঘোষণা করার কোন প্রয়োজন দেখছি না আমি।'

'বাহ্, ছোটখাট একটা লেকচার দিয়ে ফেললে,' হাসল হ্যাগেন। 'তবে যা বলেছ, ঠিকই বলেছ। কিন্তু আমার একটা কথা আছে। এভাবে আটকে থেকে কষ্ট করব কেন আমরা? আমাদের কাছে বন্দুক আছে, পিস্তল আছে। ওরা দুজন, আমরা চারজন। লোকও ডবল। তা ছাড়া এই দ্বীপের মালিক আমি, ওরা বেআইনীভাবে ঢুকেছে। ভদ্রভাবে যেতে না চাইলে পিটিয়ে তাড়ানোর অধিকার আছে আমাদের।'

'পিটিয়ে তাড়ানো মানেই তো গোলাগুলি। লাশ পড়া। সেটা ওদেরও হতে পারে, আমাদেরও। প্রয়োজন নেই যখন, অহেতুক ঝুঁকির মধ্যে যাব কেন আমরা এখনই?'

'এক কাজ তো করা যায়,' রবিন বলল। 'সামনে দিয়ে না-ই বা গেলাম। বৃষ্টির মধ্যে ওদের নজর এড়িয়ে দুর্গে ঢোকা যায় না?'

'তা হয়তো যায়। কিন্তু বেরোলেই যে ভিজে চুপচুপে হব। এমনি সাধারণ সময়ে শার্ট ভেজাতে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু এখন শুকনো রাখাটা ফরজ। ভেজা কাপড়ে এই ঘরের মধ্যে শুয়ে-ঘুমাতে পারবে? জীবনটা নরক হয়ে যাবে না? অন্ধকারের মধ্যে এখন ওসব চেষ্টা করে লাভ নেই। আলো ফুটুক। তারপর দেখব কি করা যায়। তবে আলো ফুটলে, দুর্গে গিয়ে খোঁজার আগে সৈকতে যাব। কি করেছে ওরা দেখতে হবে। জরুরী কোন সূত্রও পেয়ে যেতে পারি।'

ভাঙা প্লেটে সরবরাহ হলো তাজা ট্রাউটের কাবাব। হ্যাগেনের সঙ্গে একমত না হয়ে পারল না তিন গোয়েন্দা, সী-ট্রাউটের তুলনা হয় না। পেট ভরে মাছ খেয়ে, গরম গরম চা খেয়ে, আগুনে হাত-পা সেঁকে; দরজা দিয়ে যখন ভোরের ধূসর আলো চুইয়ে ঢুকতে লাগল, মনে তখন ওদের বেজায় ফূর্তি। বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি কমেছে। তবে বন্ধ হয়নি। এখনও ঝরছে মিহি কণা, কুয়াশার মত ঘন হয়ে, কাপড় ভিজিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। আকাশের ঘন মেঘ তেমনি ভারী হয়ে আছে, কাটেনি একটুও। তবে বাতাসের প্রকৃতি দেখে মনে হলো, উড়িয়ে নিতে দেরি হবে না। বেরিয়ে পড়েছে সী-গালের ঝাঁক। খাবার খোঁজা আরম্ভ হয়েছে।

'আগুন এখন নিভিয়ে ফেলা দরকার,' কিশোর বলল। 'হঠাৎ করে যদি আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়, ধোঁয়া দেখা যাবে।'

আলো আরেকটু বাড়লে দূরবীন নিয়ে বেরোল সে। পিছলে পড়ার ঝুঁকি নিয়েও পাথরের ওপরে উঠে সৈকতে একটু চোখ বোলানোর ইচ্ছে। অল্পক্ষণ পরেই ফিরে এসে বলল, 'নেই কিছু। অন্তত এখান থেকে তো দেখা যাচ্ছে না। দুর্গটাও দেখা যায় না। রবিন, শৈলশিরাটায় উঠে একবার দেখে আসবে নাকি? আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে। বাতাস বইছে পশ্চিম থেকে। আমাদের এখানটার আগেই দুর্গের দিকটা পরিষ্কার হবে।'

'যাচ্ছি,' দূরবীন হাতে বেরিয়ে গেল রবিন।

ওপরে উঠে দেখল, কিশোরের অনুমান ঠিক। পশ্চিমে হালকা হয়ে এসেছে বৃষ্টির কণা। তার ভেতর দিয়ে সূর্য বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে। তবে আকাশের মেঘ কাটেনি। যে কোন সময় ঝমঝম করে শুরু হতে পারে আবার। ধোঁয়াটে কুয়াশার মত বৃষ্টির জন্যে দুর্গটা এখনও চোখে পড়ছে না।

অপেক্ষা করতে লাগল সে। ধৈর্য ধরার ফল মিলল। ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিল সূর্য। দেখা গেল দুর্গটা। দূরবীন তুলল সে। একটা নড়াচড়া চোখে পড়ল। ভাল করে দেখার আগেই আবার আড়ালে চলে গেল সূর্য, অদৃশ্য হয়ে গেল দুর্গ।

যা দেখার দেখে নিয়েছে ভেবে নিচে নামার জন্যে ঘুরল সে। সাগরের দিকে মুখ। কালো পানিতে জিনিসটা চোখে পড়তেই স্থির হয়ে গেল। পালতোলা নৌকা। খুবই ছোট। কটেজ থেকে দেখা যাবে না। ওপর থেকে বলেই চোখে পড়েছে।

তাড়াতাড়ি নেমে এসে খবরটা জানাল সে।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'নৌকা!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'পাল আছে। মাছধরা নৌকার মত লাগল। এক পলকের জন্যে দেখলাম। তারপরই বৃষ্টির মধ্যে হারিয়ে গেল।'

'কোন্ দিকে গেছে?'

'দ্বীপের দিকে এগোলে আবার চোখে পড়ত। যেহেতু পড়েনি, আমার ধারণা, সরে যাচ্ছে।'

'কোথায়? মেইনল্যান্ডের দিকে?'

'হ্যাঁ।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'মাছধরা নৌকা হলে এই আবহাওয়ায় বেরোনোটা অস্বাভাবিক। কাল রাতে যে ঘষার শব্দ শুনলাম, তার সঙ্গে এই নৌকার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। রাত দুপুরে কেন শুধু শুধু ঝুঁকি নিয়ে জেটিতে নৌকা ঢোকাতে যাবে কোন জেলে?'

'আলো জ্বেলে পথ দেখালে ঝুঁকি অনেক কমে যায়। এখানকার কেউ সেটা করে থাকতে পারে,' অনুমান করল হ্যাগেন।

'তারমানে জেলে নৌকা নয়। ওটা যে আসবে জানা ছিল যারা আলো দেখিয়েছিল, তাদের। ওদের কথাই শুনেছি ভোররাতে। এখন চলে যাচ্ছে নৌকাটা। তবে শুধু নৌকা দেখে বোঝা যাচ্ছে না ওদের উদ্দেশ্য। যাকগে, সময় হলেই বোঝা যাবে। রবিন, দুর্গটা দেখেছ?'

'এক পলকের জন্যে। একটা ঘোড়া দেখেছি।'

'কি?'

'ঘোড়া। পনি।'

'হরিণকে ঘোড়া বলে ভুল করোনি তো?' হ্যাগেন বলল।

'না। যে জানোয়ারটাকে দেখেছি, তার শিং ছিল না মাথায়।'

'সব হরিণেরই শিং থাকে না।'

'দুর্গের কাছে ঘাস খেতে দেখেছি জানোয়ারটাকে। হরিণ কি এত কাছে যায়?'

'মানুষ থাকলে যাবে না।'

হ্যাগেনের দিকে তাকাল কিশোর, 'এখানে বুনো ঘোড়া আছে নাকি?'

'আমি শিওর না। তবে থাকার সম্ভাবনা কম। এখানকার বাসিন্দারা যাওয়ার সময় তাদের সমস্ত পোষা জানোয়ার সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। পনি ঘোড়ার দাম আছে। ফেলে যাওয়ার কথা নয়।'

'হুমম!' মাথা দোলাল কিশোর। 'খারাপ করছি কি? এখানে বসে বসেই অনেক কথা জেনে যাচ্ছি। ভালই এগোচ্ছে তদন্ত। শত্রুপক্ষের বাহন দরকার হয়েছিল, সেজন্যে ঘোড়া আমদানী করেছে। কি বহন করেছে—মানুষ, না অন্য কিছু?' শেষ প্রশ্নটা নিজেকে করল সে। দরজার বাইরে তাকাল। 'বৃষ্টি থেমেছে। সৈকতে যাওয়া যায়। এখানে কারও পাহারায় থাকা দরকার। মুসা, তুমি থাকো। চট করে গিয়ে ওপরে উঠে দেখে চলো এসো কেউ আছে কিনা। তুমি এলে আমরা বেরোব।'

'যাচ্ছি।'

দূরবীন নিয়ে চলে গেল মুসা।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এসে জানাল, দেখেনি কাউকে।

'ঘোড়াটা?'

'দুর্গের কাছে কোন জানোয়ারই নেই এখন।'

'বৃষ্টি থেমে যাওয়ায় চোখে পড়ার ভয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছে হয়তো।' হ্যাগেনের দিকে তাকাল কিশোর, 'যাবেন সৈকতে?'

উঠে দাঁড়াল হ্যাগেন। রবিন আগে থেকেই তৈরি।

মুসাকে বলল কিশোর, 'আমাদের দেরি হবে না। ভালমত নজর রেখো চারদিকে। মাঝে মাঝে ওপরে উঠে যেয়ো। দুর্গ আর আশপাশটা দেখে এসো।'

'আচ্ছা।'

'আর, কোন কারণেই কটেজ থেকে দূরে কোথাও যাবে না।'

'ঠিক আছে।'

পাঁচ

বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে ভাল লাগল না মুসার। দূরবীন নিয়ে উঠে এল ওপরে। ঝোপের আড়ালে একটা পাথরের ওপর বসে দেখতে লাগল দুর্গটা। ঘোড়া চোখে পড়ল না। কোনখান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখল না।

এতই মনোযোগ দিয়ে দেখছিল, পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো টেরও পেল না।

'অ্যাই, কি করছ এখানে?' বলে উঠল একজন।

চমকে ফিরে তাকাল মুসা।

তিনজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। একজনের পরনে সাধারণ স্যুট, বাহুতে ফেলে রেখেছে একটা রেইনকোট। বাকি দুজনের পোশাক পরিচ্ছদ আলাদা। গলাঢাকা ভারী জার্সির ওপর ভারী টুইডের জ্যাকেট পরেছে। ট্রাউজারের নিচটা ঢুকিয়ে দিয়েছে গাম-বুটের ভেতরে। স্যুট পরা লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।

অবাক হলেও সেটা বুঝতে দিল না মুসা। চমকটা সামলে নিয়ে শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বলছেন?'

তাজ্জব হয়ে গেছে। কোনদিক দিয়ে এল লোকগুলো? মাঠের ওপর দিয়ে এলে তার চোখে পড়তই। যেন মাটি ফুঁড়ে উদয় হয়েছে। দিনের বেলা না হলে ভূত ভেবে বসত সে। তবে ভূতেরা যে দিনের বেলা চলাচল করতে পারবে না, এমন কোন গ্যারান্টিও নেই। এ রকম নিরালা, নির্জন দ্বীপে সবই সম্ভব। সতর্ক রইল সে।

'তো আর কাকে?' ভুরু নাচাল লোকটা।

'আমি কি করছি না করছি, তাতে আপনার কি?' সমান তেজে জবাব দিল মুসা।

'নাম কি তোমার?'

'সেটা দিয়েই বা আপনার কি দরকার? আপনাদের চেহারা-সুরৎ মোটেও পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

'বড় বেশি ফড়ফড় করে! দেব নাকি ঘাড়টা মটকে?' এক পা এগিয়ে এল

পেছনের একজন।

হাত তুলে তাকে থামতে ইশারা করল স্যুট পরা লোকটা। 'তুমি জবাব দেবে, না কি?'

'জবাব চান? তাহলে অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের। ওরা এলেই পেয়ে যাবেন।'

'কারা?'

'নেভি।'

তিনজনকেই শক্ত হয়ে যেতে দেখল মুসা।

'কি বললে?' কণ্ঠস্বর বদলে গেছে স্যুট পরা লোকটার।

ওদের দুর্বলতা বুঝে গেছে মুসা। 'বললাম, নেভির লোক। যে কোন সময় চলে আসবে ওরা। আপনারা এখানে কি করছেন, যদি প্রশ্ন করে, জবাব দেয়ার জন্যে তৈরি থাকবেন। এ জায়গার মালিক আপনারা নন। বেআইনীভাবে ঢুকেছেন।'

'নেভি আসবে কেন?'

'থাকতে,' ওদের ভয় দেখানোর জন্যে বলল মুসা। 'টার্গেট প্র্যাকটিস করবে। দুর্গ আর লাইট-হাউসটাকে মেস বানাবে। শুনেছি, এখানে মিসাইল বেজও নাকি বানানোর চিন্তা-ভাবনা করছে।'

খবরটা শুনে বেশ একটা ধাক্কা খেয়েছে লোকগুলো, চেহারা দেখেই বোঝা গেল। মনে মনে হাসল মুসা। ভয় অনেকটা কমে গেছে তার। এরা মানুষই, ভূত নয়।

চুপ করে আছে স্যুট পরা লোকটা। পেছন থেকে বলে উঠল সেই আগের জন, 'ও মিথ্যে কথা বলছে!'

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল স্যুট পরা লোকটা, থেমে গেল এঞ্জিনের শব্দে। হেলিকপ্টার।

খুশি হয়ে উঠল মুসা। একেবারে সময়মত চলে এসেছে। নিশ্চয় ওমরভাই।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে তিনজনেই। মুসার নজরও ওপর দিকে।

সোজা দ্বীপের দিকে উড়ে আসছে হেলিকপ্টার। দুই মিনিট কেটে গেল। কেউ কথা বলল না। চারজোড়া চোখই তাকিয়ে আছে কপ্টারটার দিকে।

সৈকতে নামবে আশা করেছিল মুসা। কিন্তু কাছে এসে গতিপথ সামান্য বদলে যেতে দেখে অবাক হলো। উড়ে গেল জেটিটার ওপর দিয়ে। কোথায় নামতে হবে ভাল করেই জানে ওমরভাই। দ্বিধা করছে কেন?

সাগরের দিক থেকে হেলিকপ্টারটা আবার ফিরে আসতেই এতক্ষণে লক্ষ করল মুসা, ওটার গায়ে মিলিটারিদের চিহ্ন আঁকা। ইংরেজিতে বড় বড় করে দুটো অক্ষর লেখা রয়েছে : R. N., অর্থাৎ, রয়্যাল নেভি।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। লোকগুলোকে ভয় দেখানোর জন্যে নেভির কথা বানিয়ে বলেছিল। কথাটা যে এ রকম কাকতালীয়ভাবে সত্যি হয়ে যাবে, কল্পনাও করেনি। কপ্টারটাকে ধীরে ধীরে সৈকতের ওপর নামতে দেখে যেন

হুঁশ ফিরল। তাকাল স্যুট পরা লোকটার দিকে। 'কি, বলেছিলাম না?'

'ওটাতে করেই এসেছ নাকি তুমি?'

'জানার কি খুব প্রয়োজন?'

দ্বিধা করল লোকটা। তারপর মাথা ঝাঁকাল।

ব্যঙ্গ করে হাসল মুসা। 'সৈকতে চলে যান তাহলে। পাইলটকে জিজ্ঞেস করলেই আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেবে।'

পরামর্শটা মোটেও পছন্দ হলো না লোকটার। দুই সঙ্গীর দিকে ফিরে বলল, 'এসো।'

মুসাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত নেমে গেল নিচে। সতর্ক রইল যাতে সৈকত থেকে ওদের দেখা না যায়।

লোকগুলো চলে যেতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মুসা। হেলিকপ্টারটা না এলে এত সহজে ছাড়া পেত না। কিন্তু রয়্যাল নেভির হেলিকপ্টার এখানে কেন? ওমরভাই কোথায়?

এত সকালে হেলিকপ্টারটা দেখে কিশোররাও অবাক হয়েছে। অনুমান করল, ওমর গিয়ে যোগাযোগ করার পর আর দেরি করেননি হ্যাগেনের মামা ড্রেক্সেল ফিলিপ, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সাহায্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।

হেলিকপ্টার থেকে নামল দুজন অফিসার। একজন লেফটেন্যান্ট, অন্যজন চীফ পেটি অফিসার।

এগিয়ে এসে হ্যাগেনের সঙ্গে হাত মেলাল লেফটেন্যান্ট। 'আমি লেফটেন্যান্ট ওয়ারেন গুড। ইনভারগরডন থেকে এসেছি। আপনি নিশ্চয় ক্রিস্টেন হ্যাগেন। ওপর থেকে হুকুম এসেছে, এক মুহূর্ত দেরি না করে আপনার বোটটার কি অবস্থা দেখে যেতে।'

কপ্টার থেকে ডুবুরির পোশাক বের করে পরে ফেলল তার সঙ্গী। নেমে গেল পানিতে। পানির নিচে ওর মাথাটা ডুবে যেতেই হ্যাগেনের দিকে ফিরল গুড, 'কি করে ডুবল?'

'সেটা জানার জন্যেই তো আপনাদের সাহায্য চেয়েছি,' জবাব দিল হ্যাগেন। 'এই দ্বীপটার মালিক বর্তমানে আমি। আমার দাদা সরকারের কাছে থেকে লীজ নিয়েছিলেন। বোট রেখে দ্বীপের ভেতরে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি ডুবে আছে। দ্বীপটাতে কেউ থাকে না বলেই জানতাম। কিন্তু বোটটাকে ডুবতে দেখে মনে হয়েছে, কেউ ইচ্ছে করে ওটাকে ডুবিয়েছে।'

'এ কাজ কে করতে যাবে?'

'জানি না। মনে হয় আমার শত্রু আছে।'

'স্মাগলার না তো?'

'হতে পারে। আমরা আসাতে হয়তো তার অসুবিধে হচ্ছে। সেজন্যে তাড়াতে চাইছে।'

'ও। আপনারা কি থাকছেন নাকি এখানে?'

'হ্যাঁ, কাজ আছে। হেলিকপ্টারে করে যাকে পাঠিয়েছিলাম মেইনল্যান্ডে,

ওমর শরীফ, সে এখনও আসেনি।'

'খাবার-টাবার আছে? না বোটের সঙ্গে ডুবে গেছে?'

'ডুবে গেছে।'

'তাহলে তুলে দেয়া যায়। পানি লেগে নষ্ট না হয়ে থাকলে...'

'টিনের খাবারগুলো নিশ্চয় নষ্ট হবে না।'

'না। দাঁড়ান, অ্যালান উঠে আসুক। আবার নামাব।'

পানির ওপরে মাথা তুলল পেটি অফিসার। উঠে এল পিচ্ছিল পাথর বেয়ে। বোট ডোবার কারণ জানাল, 'সী-কক খোলা।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যাগেন, 'এটাই সন্দেহ করেছিলাম আমরা। খুলল কি করে?'

'কেউ খুলে দিয়েছে। কে খুলতে গেল...'

তাকে কথা শেষ করতে দিল না লেফটেন্যান্ট, 'আর কোন ক্ষতি হয়েছে?'

'না। পানিতে টইটম্বুর হয়ে আস্তে করে নিচে গিয়ে বসে গেছে।'

গুডের দিকে তাকাল হ্যাগেন, 'তোলা কি খুব কঠিন হবে?'

'তোলার সরঞ্জাম থাকলে তো কোন ব্যাপারই না। কিন্তু ওসব নিয়ে আসিনি আমরা। যা দেখে গেলাম, ঘাঁটিতে গিয়ে রিপোর্ট করব। আমাদের দায়িত্ব শেষ। তারপর কর্তৃপক্ষ যা ব্যবস্থা করার করবে।'

'খাবার আর অন্যান্য জিনিসগুলো তুলে দেবেন বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' ঘড়ি দেখল লেফটেন্যান্ট। 'সময় আছে।' পেটি অফিসারের দিকে তাকাল।

বলতে হলো না কিছু। নিজে থেকেই বলল অ্যালান, 'যাচ্ছি।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই যা যা উদ্ধার করা সম্ভব, তুলে নিয়ে এল সে। ডুবুরির পোশাক খুলে রেখে এল হেলিকপ্টারে।

লেফটেন্যান্ট বলল, 'আর দেরি করতে পারছি না।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে,' হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাগেন।

*

উত্তেজিত হয়ে দরজায় বসে আছে মুসা। কটেজে ফিরে ওকে দেখেই বুঝল কিশোর, কিছু হয়েছে। 'কি ব্যাপার?'

'তিনজন লোক এসেছিল,' কোন ভূমিকার মধ্যে গেল না মুসা। 'পেছন থেকে এসে চমকে দিল আমাকে।'

'টের পাওনি?'

'না। কি করে এল ওরা বুঝতেই পারিনি। তবে মাঠের ওপর দিয়ে আসেনি এ ব্যাপারে আমি শিওর। এলে কোনমতেই আমার চোখ এড়িয়ে আসতে পারত না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'ওরা যখন এল, তুমি কোন্ জায়গায় কি করছিলে?'

'শৈলশিরার ওপরে একটা পাথরের ওপর বসে ঝোপের আড়াল থেকে দূরবীন দিয়ে দুর্গটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এত নিঃশব্দে এসেছে ওরা, কিচ্ছু

শুনতে পাইনি।'

'কোন শব্দই না?'

'ঢেউয়ের শব্দ, সী-গালের চিৎকারে বোধহয় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ওদের পায়ের শব্দ। খসখস বা ওই জাতীয় কোন শব্দ হয়ে থাকলেও খেয়াল করিনি।'

'সেটা স্বাভাবিক,' রবিন বলল।

'ওরা কি বলল?' জানতে চাইল কিশোর।

'এখানে কি করছি জিজ্ঞেস করল।' লোকগুলোর সঙ্গে কি কি কথা হয়েছে খুলে বলল কিশোর।

'আমার যে সৈকতে গিয়েছিলাম, এ কথা কি জেনেছে ওরা?'

'মনে হয় না। তাহলে বলত।'

'দেখতে কেমন?'

'একজন, ওদের বসটাকে মনে হলো শহুরে লোক। স্যুট পরা। কালো মোচ আছে। বাকি দুজন গেঁয়ো।'

'হুঁ!' গাল চুলকাল কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। তারপর বলল, 'অনেক হয়েছে এই লুকোচুরি খেলা। ওমরভাই দেরি করছে কেন কে জানে—আবহাওয়া খারাপের জন্যেও হতে পারে।' নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল আবার, 'তাহলে নেভির কপ্টার এল কি করে?...যাই করুক, ফিরুক আর না ফিরুক, আমি আর লুকিয়ে থাকতে রাজি না। একটা কিছু করতেই হবে।'

'কি করবে?'

'দুর্গের মধ্যে গিয়ে খুঁজব। না পেলে লাইটহাউসে দেখব। নিশ্চয় বৃষ্টির মধ্যে খোলা জায়গায় ঘুমায় না ওরা। ঘোড়াটা অবশ্য দুর্গের দিকেই ইঙ্গিত করছে।'

'আমারও আর লুকিয়ে থাকতে ভাল লাগছে না,' হ্যাগেন বলল। 'ব্যাটাদের ভয়ে নিজের জায়গায় চোরের মত বাস করব নাকি! এখন ওরা জেনে গেছে, দ্বীপে ওরা ছাড়াও অন্য লোক আছে। মুসাকে দেখে গেছে। এবারকার মত ফিরে গেলেও আবার আসবে।'

'ঠিক,' সুর মেলাল মুসা, 'আমারও তাই ধারণা। ওরা কিছু করে বসার আগেই আমাদের করে ফেলা উচিত। রবিন, কি বলো?'

কিশোরের দিকে তাকাল রবিন।

'ব্যবস্থা একটা করতেই হবে। আগে এসো, জিনিসপত্রগুলো কোথাও লুকিয়ে ফেলি। খোয়া গেলে বেকায়দায় পড়ে যাব,' কিশোর বলল। 'তারপর ভেবে দেখব, কি করে এগোনো যায়।'

ছয়

কেটে গেল বাকি দিনটা। কিছু ঘটল না। শৈলশিরায় বসে চোখ রাখল ওরা।

কাউকে দেখল না।

লোকগুলো কোন্ পথে এসেছে, খোঁজাখুঁজি করে দেখেছে। পাহাড়ের গোড়া ধরে সাগরের ধার দিয়ে হেঁটে এসেছে। রাস্তা চোখে পড়েনি। তবে এটুকু বোঝা গেছে, অতিরিক্ত ঝুঁকি নিলে ভাটার সময় দুর্গের পেছন দিয়ে নেমে পাহাড় ঘুরে এসে, পিচ্ছিল, পাথুরে, খাড়া ঢাল বেয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

আরও একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়েছে, পাহাড়ের ওপর কেউ থাকলে যেমন সাগরের পাড় থেকে দেখা যাবে, সাগরের পাড়ে কেউ থাকলেও পাহাড় থেকে দেখা যাবে। নিচে যে থাকবে তার অসুবিধে বেশি। ওপরে গুলি করার চেয়ে ওপর থেকে গুলি করা সহজ। বড় বড় পাথরও মাথার ওপর গড়িয়ে ফেলতে পারবে ইচ্ছে করলে।

বন্দরের কাছে বসে আলোচনা করে কাটিয়ে দিয়েছে দিনের বাকি সময়টা।

আবহাওয়ার উন্নতি হয়েছে বেশ। পশ্চিমা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পাতলা করে দিয়েছে মেঘ। আকাশের রঙ কেমন সবজেটে। তাতে ছেঁড়া খণ্ড খণ্ড মেঘ যেন অদৃশ্য কোন দানবের তাড়া খেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। বাতাস পরিষ্কার হয়েছে বটে, তবে ঠাণ্ডা কমেনি। সেটা নিয়ে মাথাব্যথা নেই আর এখন কারও। অন্ধকার হলে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়বে। রাতে কিছু করার নেই।

রাতে পাহারা দেয়া নিয়েও মাথা ঘামাল না। ভুলটা করল এখানেই। শত্রুকে অবহেলা করা ঠিক হয়নি মোটেও।

আগের রাতের মতই জেগে গেল রবিন। আজ কোন শব্দ শুনে নয়, দম আটকে আসায়। প্রথমে ভাবল দুঃস্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্নের রেশ কাটতে, ধোঁয়ার গন্ধ বুঝতে দেরি হলো না।

ঘর ভরে গেছে ধোঁয়ায়।

সর্বনাশ! আগুন লাগল নাকি? ফায়ারপ্লেস থেকে স্ফুলিঙ্গ এসে বিছিয়ে রাখা শুকনো ঝোপে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে?

কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তুলল। ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকাল। শুকনো ডালপালা ফেলেছিল, তা-ই জ্বলছে। ঘরের আর কোথাও আগুন নেই। দরজার দিকে চোখ পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে বসল। কমলা রঙের আলো। চিৎকার করে দৌড় দিল দরজার দিকে।

বাইরে বেরিয়ে যেন ধাক্কা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মনে হলো, সারা দুনিয়াটা জ্বলছে! আকাশ লালচে হয়ে গেছে আগুনের আভায়। ধোঁয়ায় ভারী বাতাস। চতুর্দিকে স্ফুলিঙ্গ ছুটছে। চড়চড় শব্দ। দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে গেছে আশপাশটা। চিৎকার করে উড়ছে পাখির ঝাঁক। খরগোশের পাল আতঙ্কিত হয়ে ছুটাছুটি করছে পাহাড়ের ওপর। একটার লোমে আগুন ধরে গেল। আর কোন উপায় না দেখে ঝাঁপ দিয়ে গিয়ে সাগরের পানিতে পড়ল ওটা।

রবিনের চিৎকারে জেগে গেছে বাকি সবাই। হুড়াহুড়ি করে বেরিয়ে এসেছে দরজার বাইরে।

'খাইছে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পুরো দ্বীপেই আগুন ধরে গেল নাকি!'

'ধরতেই পারে,' শান্তকণ্ঠে বলল হ্যাগেন, 'বেনাবনে আগুন ছড়ায় খুব দ্রুত। ভেজা থাকলেও শুকাতে সময় লাগে না। আমি ভাবছি, যাচ্ছে কোন্দিকে আগুন? বাতাসের পরিবর্তন না হয়ে থাকলে এদিকেই আসবে।'

'এদিকেই আসছে,' কিশোর বলল। 'স্ফুলিঙ্গগুলো দেখছেন, আমাদের ওপর এসে পড়ছে। আগুনটা কত দূরে? পালানোর সময় পাব?'

'দাঁড়াও, দেখে আসি,' ঢাল বেয়ে দৌড় মারল রবিন। পাহাড়ে চড়ার ওস্তাদ সে। পাহাড়ী ছাগলের মত উঠে গেল ওপরে। ওপর থেকে যা দেখল, এমন দৃশ্য জীবনে দেখেনি। অনেক দিন মনে থাকবে। বেনায় আগুন লাগলে যে বাতাসের ঝাপটায় এমন করে ছুটতে থাকে, জানত না।

মাইলখানেক চওড়া, দশ ফুট উঁচু একটা আগুনের দেয়াল লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে আসছে। ওর কাছ থেকে একশো গজ দূরে রয়েছে। বাতাসের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সোজা ছুটে আসছে এদিকে, পুরো বন্দর এলাকাটাকে গ্রাস করার জন্যে। জ্বলন্ত লতাপাতা আর ঘাস-কুটোর বৃষ্টি হচ্ছে যেন। ঝটকা দিয়ে ওপরে উঠে ফোয়ারার মত ঝরে পড়ছে। আগুনের আঁচ লাগছে মুখে।

দৌড়ে নেমে এল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'এদিকেই আসছে!...পালাতে হবে!...জলদি!'

'যে যতটা পারো জিনিসপত্র তুলে নাও,' চিৎকার করে বলল কিশোর। 'সোজা সৈকতে। আর কোনদিকে গিয়ে বাঁচতে পারব না।'

'হাতে আছে আর মাত্র পাঁচ মিনিট,' সাবধান করে প্রায় ছোঁ মেরে দূরবীনটা তুলে গলায় ঝোলাল রবিন। একহাতে তুলে নিল হ্যাভারস্যাক, অন্য হাতে প্রাইমাস স্টোভটা।

'পাহাড়ের কাছে এসে থেমে যাবে,' মুসা বলল। 'পাথর জ্বলবে না।'

'তা জ্বলবে না। তবে কাছাকাছি থাকলে আগুনে না মরলেও ধোঁয়ায় দম আটকে মরব।' তাগাদা দিল কিশোর, 'জলদি করো!'

হাতে হাতে জিনিসপত্র তুলে নিয়ে সৈকতের দিকে ছুটল সবাই, কেবল মুসা রয়ে গেল পেছনে। হ্যাগেনের নিয়ে আসা খাবারগুলো কোনমতেই নষ্ট হতে দিতে রাজি নয় সে। যেগুলো বয়ে নেয়া যাবে না, সব তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল পাথরের ঘেরের মধ্যে এমন জায়গায়, যেখানে বেনা নেই, আগুন গিয়ে পৌঁছতে পারবে না। তারপর পোঁটলা-পাটলি নিয়ে দৌড় দিল অন্যদের পেছন পেছন।

কথা বলার সময় নেই। সামনে ভয়ানক বিপদ। সবাই কাশছে। মরিয়া হয়ে দৌড়াচ্ছে সৈকতের দিকে। কিন্তু ভয়ানক আঁচ থেকে বাঁচতে পারল না। গায়ে এসে লাগছে আগুনের হলকা। ঝাঁঝাল ধোঁয়া লেগে পানি গড়াচ্ছে চোখ থেকে। অন্ধ করে দিতে চাইছে। ফুসফুসে ঢুকে গিয়ে কামড় বসাচ্ছে। কাশি থামছে না কোনমতেই।

অবশেষে ছুটে বেরিয়ে এল বিপদ-সীমার বাইরে। সৈকতে, যেখানে শুকনো ঝোপঝাড় নেই, বেনা নেই। পেছনের পাহাড়টার গোড়ায় তখন দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্যে পানির একেবারে কিনারে সরে গেল ওরা। হাত থেকে মালপত্রগুলো ছেড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ল বালিতে। থাবা দিয়ে কাপড় থেকে আগুন নেভাতে লাগল, যেসব জায়গায় স্ফুলিঙ্গ লেগে পুড়তে আরম্ভ করেছে।

'উফ্! আরেকটু হলেই গেছিলাম!' মুখ দিয়ে বাতাস ছেড়ে বলল কিশোর। 'লাগল কি করে?'

'লাগানো হয়েছে,' জবাব দিল হ্যাগেন।

'মানে?'

'কেউ গিয়ে বেনায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে এসেছে।'

চোখ মিটমিট করল কিশোর। 'আপনি তাই ভাবছেন?'

'ভাবাভাবি নয়, আমি জানি। আর কোনভাবে লাগতে পারে না এই আগুন।' মলিন হাসি হাসল হ্যাগেন। 'পুরানো হাইল্যান্ড ট্রিক। আগের দিনে কারও সঙ্গে শত্রুতা থাকলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করত লোকে। খুব সহজ, কিন্তু খুব কাজের। যাকে দেখতে পারত না, তার বাড়ির কাছাকাছি বাতাসের উল্টো দিকে চলে যেত কেউ একজন। দিত শুকনো বেনায় আগুন ধরিয়ে। বাকি কাজটা সেরে দিত বাতাস। সব পুড়ে ছাই হত–ঘোড়া, পোষা জানোয়ার, বাড়িঘর, সব। মানুষ যদি সময়মত বেরোতে না পারত, সে-ও মরত।'

'বাহ্, দারুণ সব ভদ্রলোকদের বাস ছিল তো এই এলাকায়।'

'সেই তাদেরই বংশধর হবে আমাদের আজকের ভদ্রলোকেরাও।'

'শুনেছি বেনায় আগুন লাগলে নাকি সহজে নিভতে চায় না?'

'গরমকালে লাগলে সত্যিই খুব বিপজ্জনক। শুকনো বেনার ডাঁটা দ্রুত পুড়ে যায়, পোড়াতে পোড়াতে এগোয় আগুন। সামনে নদী কিংবা চওড়া রাস্তা না পড়লে আর থামে না। ওপরের অংশ পুড়ে যাওয়ার পরও আগুন থেকে যায় গোড়ায়। জট পাকানো শেকড় ধিকিধিকি জ্বলে ভেতরে ভেতরে। লোকে বলে, যতদিন বৃষ্টি না হয়, নেভে না ওই আগুন।'

'বাপরে, কি সাংঘাতিক!...যাহ্, ঘরটাও বোধহয় গেল,' পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা, যেখান থেকে এসেছে ওরা।

'তাহলে, ইচ্ছে করেই লাগিয়েছে বলতে চাইছেন?' হ্যাগেনের দিকে ফিরল কিশোর।

'গরমকালে দিনের বেলা রোদের তাপে জ্বলে ওঠে বেনা। এখন গরমকালও নয়, দিনও নয়। আপনাআপনি লাগার কোন সম্ভাবনাই নেই। তার ওপর বৃষ্টি হয়েছে। তাতে অবশ্য বেনার জ্বলতে তেমন কোন অসুবিধে হয় না। কোনমতে একখানে ধরিয়ে দিতে পারলেই হলো। আগুনের তাপ লাগে আর শুকায়, তাপ লাগে আর শুকায়, শুকিয়ে যাওয়া বেনায় আগুন লাগে, লাগতে লাগতে এগোয়।'

'তারমানে, নোংরা কুকুরগুলো আমাদের পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা।

'সেরকমই তো মনে হচ্ছে,' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর।

'আমি অবশ্য অতটা খারাপ ভাবতে পারছি না,' হ্যাগেন বলল। 'খুন করার সাহস বোধহয় হবে না ওদের। ভয় দেখিয়ে, বিপদে ফেলে, তাড়াতে চাইছে আমাদের।'

'আমার তা মনে হয় না। ওরা বেপরোয়া লোক, বোঝাই যাচ্ছে। আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমরা পালিয়ে বাঁচতে পারলে বাঁচলাম, না পারলে মরব। ঘর থেকে যদি সময়মত বেরোতে না পারতাম, পুড়ে না হলেও ধোঁয়ায় দম আটকে মরার সম্ভাবনা ছিল। সেটা ওরা জানে। জেনে বুঝে যখন লাগিয়েছে, খুনের উদ্দেশ্য ছিল না এ কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর, 'ভাগ্যিস হেলিকপ্টারটা নেই এখানে। তাহলে ওটাও পুড়ত। ভীষণ বিপদে পড়ে যেতাম। ফিরে যাওয়া আর হত না আমাদের।'

'তবে এখন আর সে-ভয় নেই। এদিকটায় বেনা সব পুড়ে গেছে। হেলিকপ্টারটা ফিরে এলে দূর থেকে আগুন লাগিয়ে আর নষ্ট করতে পারবে না।'

সময় কাটতে লাগল। অন্ধকার ফিকে হলো। পুব থেকে ছড়াতে শুরু করল ধূসর আলো। আগুন নিভে গেছে। এখানে ওখানে শুধু ধোঁয়া উড়ছে এখন।

'কতটা ক্ষতি হয়েছে, চলুন, দেখা যাক,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ঘরটার নিশ্চয় দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই এখন।'

ফিরে চলল ওরা। আগের দিন যে পথে সবুজ ছিল এখন সেটা পোড়া কয়লার মত কালো। পাহাড়ের ওপর থেকে যা দেখবে আশা করেছিল, তা-ই দেখতে পেল। যেখান থেকে আগুনটা লেগেছে, তার পর থেকে পাহাড়ের গোড়া পর্যন্ত সব কালো। সবুজের চিহ্নও নেই কোথাও। তার ওপাশে এখনও রয়েছে বেনা। মাঠের রঙ ফ্যাকাসে সবুজ।

'দ্বীপের চেহারাটা আগেও ভাল ছিল না,' মন্তব্য করল কিশোর, 'এখন তো বীভৎস।' সহকারীদের দিকে ফিরল সে, 'বসে থেকে আর কি হবে? চলো, বন্দরে ফিরে যাই।'

ফিরে চলল ওরা।

খাবারের টিনগুলো যেখানে ফেলে গিয়েছিল, সেখানে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মুসা। পাথরের ঘেরের মধ্যে আগুন ঢুকতে পারেনি। অক্ষতই আছে ওগুলো। পাহাড়ের পুরো ঢালটাই এখন কালো। ঘরটার চারটে পাথরের দেয়াল কেবল খাড়া হয়ে আছে।

'মনে হচ্ছে মাথা গোঁজার আরেকটা ঠাঁই খুঁজতে হবে আমাদের,' কিশোর বলল। 'এখানে আর থাকা যাবে না।'

'নেইই কিছু, থাকব কি?' রবিন বলল।

'বাকি ঘরগুলোরও এর চেয়ে ভাল অবস্থা হবে না,' বলল হ্যাগেন। 'ওগুলোও বেনায় ঘেরা ছিল, আর খড়ের চালা।'

'তারমানে আগুন লাগবেই,' কিশোর বলল, 'লাগার সঙ্গে সঙ্গে শেষ। তাই তো?'

মাথা ঝাঁকাল হ্যাগেন।
'দুর্গ থেকে দেখা যায় নাকি ঘরগুলো?'
'হ্যাঁ,' আবার মাথা ঝাঁকাল হ্যাগেন।
'তাহলে ওগুলো ভাল থাকলেও লাভ নেই। থাকতে পারব না। আমরা কি করছি না করছি সব দেখতে পাবে ব্যাটারা। কাল রাতের ঘটনার পর আর এমন কোন জায়গায় থাকতে রাজি না আমি, যেখানে ইচ্ছে করলেই পুড়িয়ে মারতে পারবে আমাদের।'
'কোথায় থাকব তাহলে?' বন্দরের পাথরগুলোর দিকে তাকাল মুসা, 'ওগুলোর ওপর?'
'না, খোলা আকাশের নিচে থাকতে পারব না। আবার বৃষ্টি নামতে পারে। পাহাড়ের ঢালে যে সব গুহা দেখে এসেছি, তার মধ্যে থেকেই কোনটা বেছে নিতে হবে, জোয়ারের সময়ও যেটার ভেতরে পানি ঢোকে না। আগুন জ্বালতে পারব, বাইরে থেকে ধোঁয়া দেখা যাওয়ার ভয় থাকবে না।'
'আমি বাবা গুহাটুহায় ঢোকার মধ্যে নেই,' দুই হাত নেড়ে সাফ মানা করে দিল মুসা। 'দুই হাজার বছর আগে আমার পূর্বপুরুষেরা গুহা থেকে সেই যে বেরিয়ে এসেছে, আর ওমুখো হওয়ার কথা ভাবেনি। এ মুহূর্তে আমিও আর গুহাবাসী হতে চাই না। একবার তো কোনমতে মরতে মরতে বাঁচলাম, গুহায় ঢুকে আর মারার পথ সুগম করে দিতে চাই না।'
'কে মারবে?' রবিনের প্রশ্ন।
'কে আবার, একটু আগে কারা মারতে চেয়েছিল? গুহামুখের চারপাশে ঝোপঝাড় রেখে আগুন জ্বেলে ধোঁয়া দিলেই দম আটকে মরব, গুহায় বন্দি করে ইঁদুরকে যেমন মারে। ওদের ওষুধ ওদেরকে দিলেই তো পারি। ব্যাটাদের তাড়িয়ে দুর্গটা দখল করব আমরা।'
'ওষুধ দিতে পারব না। বাতাস অন্য দিকে বইছে।'
'ঠিক দিকে বইলেও কিছু করতে পারতাম না,' হ্যাগেন বলল। 'দুর্গের চারপাশে পোড়ার মত কিছু নেই। খরগোশে খেয়ে রেখে যাওয়া কিছু শুকনো ঘাসের গোড়া আছে। বেনা থাকলেও কোন সুবিধে হত না। দুর্গের পাথরের দেয়াল পার হয়ে ভেতরে ঢুকবে না আগুন।'
কৃত্রিম বিষণ্ণতায় মাথা নাড়ল মুসা, 'হায়রে কপাল! আমার কোন পরামর্শই কোনদিন কাজে লাগল না।'
কিশোরের দিকে তাকাল হ্যাগেন, 'গুহায় ছাড়া আর কোথাও থাকা যায় না?'
'সেটা আপনি জানেন, অন্য কোন জায়গা আছে নাকি,' জবাব দিল কিশোর। 'আর আরেকটা কাজ করা যায়। সরাসরি দুর্গে ঢুকে একটা হেস্তনেস্ত করে নেয়া।'
'বেশ, তাহলে তাই করব,' কঠিন হয়ে উঠল হ্যাগেনের কণ্ঠ। 'চলো।'
'সামনে দিয়ে গেলে ওরা দেখে ফেলবে।'
'ফেলুক। দুর্গের মালিক আমি।'

'মালিক হলেও আপাতত দখলে নেই আপনার। ওমরভাই আসার আগেই চূড়ান্ত কিছু করতে যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। আমাদের কিছু হয়ে গেলে না জেনে এসে সে-ও পড়বে বিপদে। দুর্গে যদি ঢুকতেই হয় গোপনে ঢোকাটা ভাল হবে। ভাটার সময় পাহাড় ঘুরে গিয়ে পেছন দিক থেকে। ওরা কল্পনাই করবে না ওদিক দিয়ে ঢুকতে যাব আমরা। সাবধান থাকবে না। চমকে দিতে পারব।'

'আমি রাজি।'

'কারও কিছু বলার আছে?' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

রবিন বলল, 'দিনের আলোয় না ঢুকে রাতে গেলে কেমন হয়?'

কথাটা ভেবে দেখল কিশোর। 'যাওয়া যায়, কিন্তু মাঝপথে জোয়ার শুরু হয়ে গেলে বিপদে পড়ব। তবে যখনকারটা তখন দেখা যাবে। এখন প্রথম কাজ আমাদের মালপত্রগুলো নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলা। তারপর খাওয়া। এখনও ধোঁয়া উড়ছে। আগুন জ্বাললে কোন অসুবিধে হবে না। তবে এবার আর অসাবধান হচ্ছি না। পাহারা না রেখে কিছু করছি না। একবারেই আক্কেল হয়েছে। সবার একসঙ্গে যাওয়ার দরকার নেই। মুসা, পাহাড়ের গোড়ার দিকটায় গিয়ে নজর রাখো। রবিন, তুমি গিয়ে বসো শৈলশিরায়।'

দুজনে চলে গেলে হ্যাগেনের দিকে তাকাল কিশোর। 'আমাদের কাজেকর্মে, যে ভাবে এগোচ্ছি, বোধহয় সন্তুষ্ট হতে পারছেন না আপনি। সরাসরি অ্যাকশনে যেতে চাইছেন। নিশ্চয় যাব। সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে, শিওর হয়ে তবেই আঘাত হানব, যাতে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। আমাদের কাজের ধারাই এ রকম।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল হ্যাগেন। 'যা ভাল মনে করো, করো। আমি আমার জায়গার দখল পেলেই খুশি।'

সাত

কিশোর আর হ্যাগেন মিলে একটা গুহা খুঁজে বের করল। সাগরের দিকে মুখ। গুহা না বলে গর্ত বললেই ঠিক হয়। তবে আপাতত কাজ চালানো যাবে। পরে সময় করে ভাল দেখে আরেকটা খুঁজে নেবে ভেবে রবিন আর মুসাকে ডেকে আনল কিশোর।

কারও দেখা পায়নি ওরা।

সবাই মিলে মালপত্রগুলো বয়ে এনে গুহায় রাখল।

টিনের গায়ের লেবেল দেখল কিশোর। বিস্কুট, মাংস, ফল, চিনি, চা, কনডেন্সড মিল্ক আর আরও কিছু খাবার আছে। এ দিয়ে দিন তিনেক চালাতে পারবে। ইতোমধ্যে ওমর চলে এলে সমস্যা আর থাকবে না।

খাওয়া শেষ করে কিশোর বলল, 'ওমরভাই এলে আগেভাগেই তাকে সব

জানাতে হবে। নইলে কপ্টার ফেলে আমাদের খুঁজতে চলে আসবে। এই সুযোগে শত্রুরা গিয়ে যদি ওটা নষ্ট করে দেয়, বাইরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের একমাত্র ব্যবস্থাটাও শেষ হয়ে যাবে।'

'জানাতে অসুবিধে কি?' জানতে চাইল মুসা।

'অসুবিধে নেই। সেজন্যে এখানে একজনকে থাকতে হবে।'

'বাকিরা কি করবে?'

'দুর্গে যাব। রাতের অনেক দেরি। ভাটা যখন আছে, এখনই গিয়ে দুর্গটায় একবার ঢুঁ মেরে আসতে চাই।'

'কাকে থাকতে বলো?'

'তুমিই থাকো। কপ্টারের শব্দ শুনলেই দৌড়ে চলে যাবে সৈকতে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হলো মুসা। সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছেই বেশি ছিল তার।

বেরিয়ে পড়ল বাকি তিনজন। পাহাড়ের কিনার দিয়ে সৈকত ধরে এগোল। কিশোরের পকেটে পিস্তল। রবিনের গলায় দূরবীন। হ্যাগেনের হাতে তার বারো বোরের বন্দুক। কৈফিয়ত দিল : প্রিয় জিনিসটা কোথাও ফেলে যেতে রাজি নয়। কোন কারণে নষ্ট হলে ভীষণ দুঃখ পাবে।

যার জিনিস সে বহন করবে, তাতে কিশোরের আপত্তি করার কিছু নেই।

দুর্গটা যেদিকে রয়েছে সেদিকে এগিয়ে চলল ওরা। পানি আর পাহাড়ের গোড়ার মাঝে ফাঁক খুব সামান্যই। পাথরের গা আঁকড়ে আছে পরিচিত সব জিনিস—শামুক, গুগলি, শ্যাওলা। খাঁজে খাঁজে কুঁচো চিংড়ি আর ছোট ছোট সামুদ্রিক প্রাণী আটকে আছে, বেশির ভাগই মৃত। জোয়ারের সময় পানির সঙ্গে এসেছিল, ভাটার সময় আর নেমে যেতে পারেনি।

হাঁটার সময়ও অসতর্ক হচ্ছে না ওরা। মাঝে মাঝেই মুখ তুলে তাকাচ্ছে। পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে নিচে তাকিয়ে ওদের দেখছে কিনা কেউ দেখার জন্যে।

আধ ঘণ্টা হাঁটার পর দাঁড়িয়ে গেল হ্যাগেন। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দুর্গের কাছে চলে এসেছি। ওঠা যাক। কি বলো?'

ওপরে তাকিয়ে পাহাড়ের খাড়া দেয়ালটা দেখল কিশোর। সাগরের দিকে তাকাল। ভাটা শেষ। জোয়ারের সময় হয়েছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বুদ্ধিমান সৈনিক সে-ই যে আক্রমণ করার আগে পালানোর পথটা নিশ্চিত করে রাখে। এখন ওঠা শুরু করলে ওপরে উঠে যদি দেখি আর উঠতে পারছি না, কিংবা ওপর দিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ, ওদিকে জোয়ারও চলে এসেছে, কি করব তখন?'

'এটা আমার জায়গা!' রেগে উঠল হ্যাগেন। 'যেখানে খুশি, যখন খুশি যাব। কার কি?'

কথাটা ঠিক। জবাব দিল না আর কিশোর। উঠতে রাজি হয়ে গেল। 'বেশ, চলুন। ওঠা যাক।...রবিন, তোমার ওস্তাদী দেখাও।'

পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে শুরু করল রবিন। পাথর যেমন আছে, খাঁজও

আছে প্রচুর। বেয়ে উঠতে অসুবিধে হবে না। তবে আলগা পাথরের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। ওগুলো ধরা চলবে না, পা রাখাও চলবে না। ভার সইতে না পেরে খসে চলে আসবে। নিচে পড়ে ভর্তা হয়ে মরাটা তখন অবধারিত।

কোনটাই ঘটল না। নিরাপদেই ওপরে উঠে গেল রবিন। তার দেখানো পথে অন্য দুজনও উঠে গেল।

দেয়ালের কিনার দিয়ে ওপরে মাথা তুলে তাকিয়েই ঝট করে নামিয়ে ফেলল রবিন।

'কি হলো?' নিচ থেকে জানতে চাইল কিশোর।

'সামনেই দুর্গটা। বড়জোর পঞ্চাশ গজ।'

'তাতে অসুবিধে কি?' জিজ্ঞেস করল হ্যাগেন। 'কেউ আছে?'

'ছায়াও নেই।'

'তাহলে উঠে যাও।'

'যদি কেউ সামনে পড়ে যায়?' কিশোর বলল।

'বুকে বন্দুক ধরে জিজ্ঞেস করব, আমার দ্বীপে কি করছে ওরা,' জানিয়ে দিল হ্যাগেন।

ওপরে উঠে এল তিনজনে। আহামরি নয় দুর্গটা। দূর থেকে যতটুকুও বা লেগেছিল, কাছে থেকে তা-ও লাগল না। সাদামাঠা অতি সাধারণ দুর্গ। পাথরের দেয়াল। দোতলা, আয়তাকার একটা বিল্ডিং। তবে মজবুত। আগের দিনে এ সব দুর্গে যারা বাস করত, সারাক্ষণ শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল তাদের। কোন সেনাপতিই রাতে ঘুমাতে যাবার আগে জানত না, সকালে বেঁচে থাকবে কিনা।

দুর্গের একটা দরজাও চোখে পড়ল না ওখান থেকে। জানালা আছে বেশ কিছু, তবে সেগুলোকে জানালা না বলে ফোকর বললে মানায় ভাল—খুব সরু আর লম্বা। নিচে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে নিচটা নাগাল পাবে না কোন মানুষ।

দুর্গটা নীরব, নিস্তব্ধ। কবরখানার মত।

'দরজা কোথায়?' জানতে চাইল কিশোর।

'সদর দরজাটা সামনের দিকে,' জানাল হ্যাগেন। 'ওই একটাই দেখেছি। পেছনে ছোট আরেকটা ছিল, কোন কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।'

'এগোন।'

হাঁটতে হাঁটতে নাক কুঁচকাল কিশোর, 'পোড়া গন্ধ।'

'তাতে আর অবাক হওয়ার কি আছে? বেনা পোড়া গন্ধ এত সহজে কি আর মিলায়।'

'কিন্তু বাতাসের বিপরীতে রয়েছি আমরা। গন্ধ কখনও উল্টো দিকে আসে বলে শুনিনি। তা ছাড়া পোড়া জায়গাটা তো অনেক দূরে।'

জবাব দিতে না পেরে চুপ হয়ে গেল হ্যাগেন।

মোড় ঘুরে অন্যপাশে আসতেই ঘোড়াটা চোখে পড়ল ওদের। দেয়ালের গায়ে আঙটায় বাঁধা। পাথরের দেয়ালের কিনারে জন্মে থাকা খসখসে শক্ত ঘাস

চিবাচ্ছে।

সাবধানে আশপাশে নজর বোলাল কিশোর। মানুষ চোখে পড়ল না।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। গির্জার দরজার মত বড়, ভারী পাল্লা। ওপর দিকটা ধনুকের মত বাঁকানো। কালো ওক কাঠে তৈরি। কয়েক ইঞ্চি পর পরই লোহার পাত বসিয়ে বোতামের মত গোলমাথাওয়ালা মোটা পেরেক ঠুকে আটকে দেয়া হয়েছে। এতটাই শক্ত করে তৈরি, যুদ্ধ-কুঠার দিয়ে কুপিয়েও যাতে কাটা না যায়।

ঠেলা দিতেই নিঃশব্দে খুলে গেল পাল্লাটা। ভুরু কুঁচকে কজাগুলোর দিকে তাকাল কিশোর। নিয়মিত তেল দেয়া হয়। নইলে এত পুরানো আর ভারী দরজায় মরচে পড়ে থাকত, খুলতে জোর লাগত, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হত। আনমনে বিড়বিড় করল, 'তালা নেই!'

'না, চাবিটা বোধহয় পায়নি,' হ্যাগেন বলল। 'পেলে নিশ্চয় আটকে রাখত। আমার হাতেও পড়েনি চাবি।'

দরজার অন্যপাশের ঘরটায় ঢুকল ওরা। চারকোনা ছোট একটা ঘর। পেছনের দেয়ালে দরজা।

সেটা দিয়ে ঢুকল বড় আরেকটা ঘরে। এটাও ছোট। জানালার মাকড়সার জাল আর পুরু হয়ে জমে থাকা ধুলো-ময়লার ফাঁক দিয়ে আলো আসছে ভেতরে। ঘরের তুলনায় বিশাল একটা ফায়ারপ্লেস আছে। তাতে কাঠ নেই, কয়লা নেই, ছাই নেই; কিছু নেই। ঘরে কোন ধরনের আসবাব নেই–ঠিকই বলেছিল হ্যাগেন।

'দারুণ জায়গার মালিকানা পেয়েছেন আপনি, মিস্টার হ্যাগেন,' না বলে পারল না কিশোর, 'সত্যি!' গলা চড়িয়ে ডাকল, 'কেউ আছেন?'

বদ্ধ ঘরে প্রতিধ্বনি তুলল তার কণ্ঠ। সাড়া দিল না কেউ।

দুই সঙ্গীর দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসল কিশোর, 'তারমানে থাকলেও আমাদের স্বাগত জানাতে আসার ইচ্ছে নেই ওদের।'

'তোমার ধারণা সত্যি সত্যি কেউ ঢুকে বসে আছে?' বন্দুকটা শক্ত করে চেপে ধরল হ্যাগেন।

'হ্যাঁ।'

'এ ধারণা কেন হলো?'

'কিছু কিছু প্রমাণ তো পাওয়াই গেছে…যেমন, দরজার কজায় তেল…'

আরও প্রমাণের জন্যে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল কিশোর। পোড়া সিগারেট, ম্যাচের কাঠি, তামাকের ছাই…

কিছুই না দেখে বিড়বিড় করল, 'এত বোকা নয় ওরা। সব সরিয়ে নিয়ে গেছে, সাফ করে দিয়ে গেছে ঘর, যাতে আমরা বুঝতে না পারি কোন্‌খানে ছিল ওরা।'

'আমাদের কথাবার্তা শুনছে না তো কোনখান থেকে?'

'শুনতেও পারে…'

মেঝের দিকে চোখ পড়তে থমকে গেল কিশোর। নিচু হয়ে তুলে নিল

কি যেন।

'কি?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল রবিন আর হ্যাগেন।

জিনিসটা তালুতে রেখে ওদের দেখার জন্যে হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিল কিশোর।

'ওট!' রবিন বলল।

হ্যাগেনকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এ দ্বীপে ওটের চাষ হয় নাকি?'

'না।'

'এল কোত্থেকে?'

'ঘোড়াকে খাওয়ানোর জন্যে এনেছে হয়তো।'

'ঘোড়াটার যা চেহারা, ঘাসও তো ঠিকমত খাওয়ায় বলে মনে হয় না। তার জন্যে কষ্ট করে মেইনল্যান্ড থেকে ওট টেনে আনতে যাবে? তা ছাড়া, এটা ওট নয়; বার্লি।'

'তাতে তফাতটা কি হলো?' বুঝতে পারছে না রবিন।

'অনেক কিছু। ঘোড়াটাকে খাওয়ানোর জন্যে কষ্ট করে শস্যের দানা যদি আনেই—এতটা মানবিকতা ওদের থাকে, ওট আনবে, বার্লি নয়।'

'কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'বার্লি কেন আনা হয়েছে, আমার নিজের কাছেই এখনও পরিষ্কার নয়। তবে আমার ধারণা, বস্তায় ভরে আমদানী করা হয়নি; কাপড়-চোপড়ে লেগে কিংবা জুতোর খাঁজে আটকে চলে এসেছে। থাক, পরে ভাবা যাবে এটা নিয়ে। বাকি ঘরগুলো দেখা যাক।'

আট

বিশাল আরেকটা ঘরে ঢুকল ওরা।

'এর চেয়ে বড় আর কোন ঘর নেই দুর্গে,' হ্যাগেন বলল। 'নিচতলার অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে। রান্নাঘরটাও বিরাট। হবেই। প্রচুর লোকজন, চাকর-বাকর, প্রহরী ছিল। তাদের খাবার তৈরি করতে বড় রান্নাঘর দরকার। ওপরতলার শোবার ঘরগুলো অবশ্য ছোট ছোট। ঘুমানোর জন্যে জায়গা নষ্ট করতে নারাজ ছিল বোধহয় সেকালের লোকেরা। অলস ছিল না মোটেও।'

হলঘরটার পাশে আরেকটা খুদে ঘর। ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। দরজাটাকে ফোকরও বলা চলে। এখানকার অন্যান্য দরজার মত এটারও ওপরটা ধনুকের মত বাঁকা। ঘরটায় দরজা নেই। কখনও ছিল বলেও মনে হয় না। সরু একটা করিডর বেরিয়ে গেছে ঘরটা থেকে। তার দুই পাশে দু'একটা ঘরও আছে। সব পাথরে তৈরি। কেমন নিরানন্দ, বিষণ্ন পরিবেশ।

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়াল ওরা। সিঁড়ির নিচে ছোট একটা দরজার ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। দরজা না বলে চারকোনা

ফোকরের ঢাকনা বললে স্পষ্ট হয়।

হ্যাগেনের দিকে তাকাল কিশোর। 'অন্যপাশে কি আছে?'

মাথা নাড়ল হ্যাগেন, 'বলতে পারব না।'

'ঢোকেননি?'

'না। আগের বারও যখন এসেছিলাম, তালা দেখেছি। নিচে হয়তো সেলার আছে। কিংবা ডানজন। দুঃসময়ের জন্যে খাবার মজুদ করে রাখা হত আগেকার দিনে।'

কাছে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। ফিরে তাকিয়ে বলল, 'দরজাটা পুরানো, কিন্তু তালাটা নতুন। কার কাজ?'

'ওদেরই, যারা ঢুকে বসে আছে; আর কার হবে?'

'কিন্তু তালা লাগানোর প্রয়োজন পড়ল কেন?' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'সদর দরজাটা খোলা। যার খুশি ঢুকতে পারে। অথচ এখানে তালা...'

'কোন কারণ নিশ্চয় আছে,' রবিন বলল।

'তা তো আছেই। সেটাই তো জানতে চাই।'

'জানতে হলে তালা খুলতে হবে,' হ্যাগেন বলল। 'আমার কাছে চাবি নেই। গুলি করে তালাটা ভাঙার চেষ্টা করা যেতে পারে।'

'তাতে শব্দ হবে। এখনই সেটা করতে রাজি নই আমি। চলুন।'

কুয়ার মত একটা গর্ত দেখিয়ে হ্যাগেন বলল, 'ওই যে পানির ট্যাংক। ছাত থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে এসে পড়ে জমা হয়। তখনকার দিনে এটা বানানো জরুরী ছিল। শত্রু আক্রমণ করলে ঘরে বসেই যাতে পানি পেতে পারে, সেজন্যে বানিয়েছিল। ভেতরটা দেখবে?'

'নাহ্,' আগ্রহ বোধ করল না কিশোর। 'ভেতরে থাকলেই আর কি থাকবে? শ্যাওলা পড়া পানি। ও দেখে লাভ নেই।'

'রান্নাঘরটা দেখবে?'

চিন্তা করল কিশোর। 'পরে। আগে ওপরটা দেখে আসি।'

সিঁড়ির গোড়ায় আরেক দানা বার্লি পড়ে থাকতে দেখে তুলে নিল সে। হাতের তালুতে নিয়ে দেখতে দেখতে বলল, 'এগুলো এখানে কেন না জানা পর্যন্ত স্বস্তি নেই আমার।'

দোতলায় উঠে এল ওরা। ঘরগুলো সব ছোট ছোট। শূন্য। শুধু পাথরের দেয়াল আর মেঝে। আগ্রহ জাগানোর বা আকর্ষণ করার মত কিছু নেই।

দেখতে দেখতে রবিন বলল, 'দ্বীপে গাছপালা ছিল না, তাই ব্যবহার করতে পারেনি। দরজার জন্যেও নিশ্চয় বাইরে থেকে কাঠ আনতে হয়েছে। যতটা পেরেছে, সব কিছু পাথর দিয়েই বানিয়েছে।'

দোতলায় ওঠার সিঁড়িটাই ছাতে উঠে গেছে। সিঁড়ির মাথায় এক সময় কাঠের ঢাকনা ছিল। আছে এখনও, তবে ভাঙা। ছাতে উঠতে অসুবিধে হলো না।

ছাত থেকে প্রায় পুরো দ্বীপটাই চোখে পড়ে। আকর্ষণীয় কিছুই নেই।

পেছনে ধূসর সাগর। বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে চোখে পীড়া দেয়। একঘেয়ে লাগে। দিগন্তের কাছে দু'একটা কালো কালো ভাঙা দাগ। দ্বীপের চিহ্ন। দুর্গের সামনে ছড়ানো, ঢেউ খেলানো সেই একরঙা তৃণে ছাওয়া জমি। যার কোন রকম বৈচিত্র নেই। ফ্যাকাসে সবুজের কিনারে পোড়া কালো অংশটা প্রকট হয়ে চোখে পড়ে। তার ওপাশে সৈকতের খুব সামান্যই দেখা যায়। মুসা বা হেলিকপ্টারটা দেখা যাচ্ছে না। তারমানে ওমর এখনও আসেনি।

আধপাক ডানে ঘুরতেই লাইটহাউসটা চোখে পড়ল কিশোরের। পানির কিনারে খাড়া পাহাড়চূড়ায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে বেদনাভরা চোখে যেন তাকিয়ে রয়েছে শূন্য সাগরের দিকে। গোড়ার তৃণভূমিতে চরছে গোটা ছয়েক হরিণ। ওগুলো আর পাখির ঝাঁকই ওখানে একমাত্র প্রাণের লক্ষণ।

'দেখুন, যা-ই বলুন,' ফিরে তাকাল কিশোর, 'পোড়া গন্ধটা আমার ভাল লাগছে না।'

'পোড়া গন্ধ কারোরই ভাল লাগে না,' জবাব দিল হ্যাগেন। 'এত পোড়া পুড়েছে, গন্ধ তো আসবেই।'

আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ দেখার পর কিশোর বলল, 'চলুন। এখানে আর দেখার কিছু নেই।'

সিঁড়ির গোড়ায় নেমে বলল, 'রান্নাঘরটা দেখাবেন বলেছিলেন। চলুন।'

'চলো।'

ওক কাঠের আরেকটা দরজার সামনে দুই গোয়েন্দাকে নিয়ে এল হ্যাগেন। পাল্লার বাইরের দিকে হুড়কো লাগানো। একপাশের চৌকাঠ থেকে খাড়া হয়ে ঝুলছে মোটা লোহার চ্যাপ্টা একটা ডাণ্ডা। ওটার অন্য মাথায় আয়তাকার একটা ফুটো। ডাণ্ডাটা যে পাশে রয়েছে তার উল্টো দিকের চৌকাঠে 'ইউ' আকৃতির মোটা রিঙ কাঠের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। পাল্লা লাগিয়ে, তার ওপর ডাণ্ডাটা তুলে দিয়ে, আয়তাকার ফুটোটা রিঙে ঢুকিয়ে তালা আটকে দিলে রান্নাঘরে ঢোকা বন্ধ। দরজার লাঠির মতই কাজ করে জিনিসটা, তবে অনেক বেশি মজবুত আর নিরাপদ। মাঝে মাঝে খাবারের আকাল পড়ত সেকালে। রান্নাঘর থেকে তখন জিনিস চুরি ঠেকানোর জন্যেই বোধহয় এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

হুড়কো খুলে ভেতরে ঢুকল ওরা।

ঢুকেই নাক কুঁচকাল রবিন, 'উঁহু, কি গন্ধরে বাবা! এর মধ্যে শুয়োর পচাত নাকি?'

রান্নাঘর অনেক বড়, আগেই জানিয়েছে হ্যাগেন; তারপরেও এটার সাইজ দেখে অবাক হলো দুই গোয়েন্দা। মেঝে থেকে অনেক উঁচুতে দুটো জানালা আছে। এক দিকের দেয়ালের ঠিক মাঝখানে মস্ত একটা ফায়ারপ্লেস। তার ওপরে দেয়াল থেকে মোটা একটা লোহার ডাণ্ডা বেরিয়ে আছে। সেটা থেকে শেকল ঝুলছে। শেকলের মাথায় বড় বড় বাঁকা বড়শির মত কাঁটা। সব কিছু আঠাল কালিতে মাখামাখি। একপাশে পাথর কেটে বড় একটা চারকোনা চৌবাচ্চা বানানো হয়েছে। হাতা, কড়াই বা এ ধরনের জিনিস ঝুলিয়ে রাখার

জন্যে অসংখ্য হুক বসানো রয়েছে দেয়ালে। তারই একটাতে দূরবীনটা ঝুলিয়ে রাখল রবিন।

দেয়ালের গায়ে এক জায়গায় একটা অনেক বড় কুলুঙ্গি–তিন ফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া, চার ফুট উঁচু। তলাটা মেঝের সমান্তরাল। রান্নাঘরের মালপত্র রাখার জন্যে তৈরি হয়েছিল বোধহয়। বেশ কিছু শুকনো লাকড়ি পড়ে আছে। কোন্ সেই প্রাচীনকালে আগুন জ্বালানোর জন্যে এনে রাখা হয়েছিল সেগুলো, এখনও পড়ে আছে। আরও একটা জিনিস রয়েছে, দেখে বোঝা গেল না ওটা কোন্ কাজে ব্যবহৃত হত।

ভালমত দেখার জন্যে ঝুঁকে দাঁড়াল কিশোর, 'কি এটা?'

অলিন্দের মাঝামাঝি জায়গায় একটা লোহার শিক। দুদিকের দেয়াল ছিদ্র করে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে দুই মাথা। দশ ইঞ্চি ব্যাসের একটা চাকা লাগানো রয়েছে শিকের মাঝ বরাবর। লোহার তৈরি, অনেক ভারী জিনিস। জাহাজের হালের চাকার মত। বেশ জোরাজুরি করে চাকাটা আধপাক ঘোরাতে পারল কিশোর। সোজা হয়ে বলল, 'দুর্গের তো আর হাল নেই। রান্নাঘরে এ জিনিস দিয়ে কি করত ওরা?'

'কাবাব বানানোর সময় দেয়ালের ডাণ্ডাটাকে এদিক ওদিক সরাত হয়তো,' অনুমান করল হ্যাগেন।

'কি জানি!'

'শেকল আর কাঁটার সাইজ দেখেছ,' রবিন বলল। 'আস্ত হরিণ ঝুলিয়ে দিত হয়তো কাবাব করার জন্যে।'

'আসলেও তাই করত,' হ্যাগেন বলল। 'মানুষ ছিল অনেক বেশি। ঝামেলার মধ্যে যেত না। একবারেই যা রান্না করার করে ফেলত।'

'কি নোংরাটাই না হত,' নাক কুঁচকে বলল রবিন। 'রক্ত-চর্বির ছড়াছড়ি···জঘন্য জায়গা ছিল এই রান্নাঘরটা।'

'জীবনধারণটাও তখন জঘন্য ছিল,' কিশোর বলল। 'রান্নাঘর পরিষ্কারের জন্যে সাধারণ সোপ পাউডারও পেত না। তা-ও জীবনটা কোনমতে কাটিয়েই দিত মানুষ।'

খুট করে মৃদু একটা শব্দ হতে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। 'কিসের শব্দ?'

'দরজাটা লেগে গেছে,' হ্যাগেন জানাল।

'লাগল কি করে? বাতাস তো নেই।'

দরজার কাছে দৌড়ে এল কিশোর। ঠেলা দিল। খুলল না। আরও জোরে ঠেলা দিল। তা-ও খুলল না। আরও কয়েকবার ঠেলাঠেলি করে হাল ছেড়ে দিল। আনমনে বিড়বিড় করল, 'ডাণ্ডা লাগিয়ে দিয়েছে!'

কি ঘটেছে বুঝতে কিছুটা সময় লাগল অন্য দুজনের।

'তারমানে···তুমি বলতে চাইছ,' হ্যাগেন বলল, 'আটকা পড়েছি আমরা!'

'আপনাআপনি পড়িনি,' নিমের তেতো ঝরল কিশোরের কণ্ঠ থেকে, 'আটকে দেয়া হয়েছে। ইস্, সাবধান থাকা উচিত ছিল!···'

দরজার পাল্লায় কাঁধ রেখে ঠেলতে লাগল হ্যাগেন। কিছুই হলো না।

মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'কোন লাভ হবে না। দুর্গের সব কিছুই অতিরিক্ত মজবুত। ভাঙা যাতে না যায়, সেভাবেই তৈরি।'

'কি করব এখন?'

'কিছুই করার নেই।'

'মানে! হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব?'

'তো আর কি করব? যে বন্ধ করেছে, একমাত্র সে-ই খুলতে পারে এখন এই দরজা। বাইরে থেকে ছাড়া খোলার ব্যবস্থা নেই, সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, বেশ কিছুটা সময় এই গন্ধে ভরা রান্নাঘরেই কাটাতে হবে আমাদের।'

'তা কেন কাটাব?'

'বাধ্য হয়ে। দোষটা আমার। এতটা অসাবধান হওয়া ঠিক হয়নি। জানাই তো ছিল এখানে শত্রু আছে। দরজায় পাহারা রাখা উচিত ছিল।'

'হুট করে উদয় হলো কোন্‌খান থেকে?'

'দুর্গের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল কোনখানে।'

'আসার তো কোন শব্দ শুনলাম না।'

'আমাদের মত গর্দভ নয়, তাই শব্দ করেনি। সাবধান ছিল।'

'আটকাল কেন?'

'এ তো সহজ কথা। ওদের কাজে যাতে বাগড়া দিতে না পারি।'

'না খেয়ে মরার জন্যে ফেলে যাওয়ার দুঃসাহস নিশ্চয় হবে না।'

'কি করে বুঝব? পুড়িয়ে মারার চেষ্টা তো একবার করেছে।'

'তাহলে কি করব আমরা এখন?' অধৈর্য হয়ে উঠল হ্যাগেন।

'ওরা কি করে বসে বসে দেখা ছাড়া আর তো কোন উপায় নেই। জানালা দিয়ে বেরোনো যাবে না। চিমনি দিয়ে...দেখি তো?' ফায়ারপ্লেসের ওপরে চিমনির ফোকরটায় মাথা ঢুকিয়ে দিল কিশোর। ওপর দিকে তাকাল। জানাল, 'যথেষ্ট মোটা। আকাশ দেখা যাচ্ছে। বেরোনো যেত, কিন্তু শিকের মত কি যেন লাগানো রয়েছে।' বেরিয়ে এসে মাথা থেকে একগাদা ঝুলকালি ঝেড়ে ফেলল। 'খুবই সাবধান ছিল এই বাড়ির মালিকেরা। চিমনি দিয়ে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করে রেখেছে।'

'অত চিন্তা নেই,' রবিন বলল, 'মুসা আছে। আমাদের দেরি দেখলে কি হলো নিশ্চয় জানতে আসবে।'

'এবং এসে আমাদের মতই ফাঁদে পড়বে। যদি না-ও পড়ে, তিনজনের বিরুদ্ধে একা কিছু করতে পারবে না।'

'ওমরভাই চলে এলে ভাল হত। দুজন হলে...'

'তখনও একজনের বেশি এখানে আসত না। একজন রয়ে যেত হেলিকপ্টারের পাহারায়।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল রবিন। হাত নেড়ে বলল, 'উফ্, এত নিরাশার কথা বলো কেন! কিভাবে বেরোব তাহলে, তুমিই বলো?'

'সহজ সমাধান–যারা আটকেছে তারা বের করে দিলে বেরোতে পারব। নইলে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে হবে।'

দরজার বাইরে খসখস শব্দ হলো। সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। কিন্তু দরজা খুলল না। নিচের ফাঁক দিয়ে একটা কাগজের টুকরো ঢুকল। অন্যপাশ থেকে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

তাড়াতাড়ি গিয়ে তুলে নিল কিশোর। কাগজে কিছু লেখা রয়েছে। পড়ল। তারপর দুই সঙ্গীর দিকে মুখ তুলে বলল, 'লিখেছে, দ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার গ্যারান্টি দিলে দরজা খুলে দেয়া হবে।'

'ওদের খুলি ফাটাব আমি!' রাগে গর্জে উঠল হ্যাগেন।

'সামনে পেলে তবে তো ফাটাবেন,' ভোঁতা স্বরে বলল কিশোর।

'কি করব তাহলে? জবাব দেবে ওদের?'

'তাড়াহুড়া করে কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না। বিপদ আসলে কতটা, ভেবে দেখা দরকার।'

মেঝেতে বসে পড়ল কিশোর।

জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, মলিন হয়ে আসছে দিনের আলো।

'দরজায় গুলি করে দেখব নাকি?' হ্যাগেনের প্রশ্ন।

ওর দিকে তাকাল কিশোর, 'তাতে কি হবে?'

'হুড়কোটা উড়িয়ে দিতে পারব।'

'ভুলে যাচ্ছেন, ডাণ্ডা তুলে আটকে দেয়া হয়েছে। এ পাশ থেকে ওটা ভাঙবেন কি করে?'

'তাহলে বরং ডাক দিই ওদের। এলে বলব দরজা খুলে দিতে। বলব, কথা বলতে চাই।'

'তারপর? কি কথা বলবেন?'

'কথা বলে কে? সোজা গুলি করব!'

'মানুষ খুনের দায়ে পড়বেন তখন। ঝামেলা অনেক বাড়বে।' হাত নাড়ল কিশোর, 'ওসব চিন্তা বাদ দিয়ে কিছু স্বাভাবিক চিন্তা করা যাক এখন। দুর্গটা তৈরি করা হয়েছিল শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে। জরুরী মুহূর্তে পালানোর জন্যেও নিশ্চয় কোন ব্যবস্থা করে রেখেছিল। গোপন করিডর, লোহার সিঁড়ি, কিংবা অন্য কিছু। অতীতের সেই মানুষগুলোর অবস্থাটা কল্পনা করুন। সামনের ঘর দখল হয়ে গেলে তাড়া খেয়ে এই রান্নাঘরে ঢোকা ছাড়া উপায় ছিল না। এটাই শেষ আশ্রয়। তারপর? বদ্ধ ঘরে ঢুকে আটকা পড়ে না খেয়ে মরতে চাইবে না নিশ্চয় কোন বাড়ির মালিক। তাহলে কি করবে? বেরিয়ে যেতে চাইবে। বেরোনোর ব্যবস্থা আগে থেকেই করে না রাখলে বেরোবে কি করে?'

'তারমানে, বলতে চাইছ, এখান থেকে বেরোনোর ব্যবস্থা আছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় সেটা? কোনখানে দেখা তো বাদ রাখিনি। সামান্য একটা ফাটলও নেই যে বুঝব গুপ্তদরজা আছে।'

'গুপ্তদরজা গোপনই থাকে। সবাই দেখে ফেললে আর লাভটা হলো কি? যাদের জানার তারা ঠিকই জানত কোথায় আছে ওটা, কি করে খুলতে হয়।'

'তাহলে সেই দরজাটাই এখন খুঁজে বের করতে হয়...'

এই সময় টোকা পড়ল দরজায়। অন্যপাশ থেকে জিজ্ঞেস করল একটা কণ্ঠ, 'জবাবটা কি?'

'ভেতরে আসুন,' কিশোর বলল, 'কথা বলি।'

'বলাবলির কিছু নেই। "হ্যাঁ", অথবা "না"। কোনটা?'

'জাহান্নামে যা ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল হ্যাগেন।

হাসি শোনা গেল। 'যেতে আমার কোন আপত্তি নেই, হ্যাগেন সাহেব। আপনাদেরই ক্ষতি হবে। বেরোতে আর পারবেন না জীবনে। পূর্বপুরুষদের দুর্গে শেষমেষ ভূত হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। সময় দিচ্ছি। ভেবে দেখুন, বেরোতে চান কিনা। চাইলে, দরজায় বাড়ি মেরে শব্দ করবেন। তবে বেশি সময় দেয়া যাবে না। বেরোতে হবে আমাদের। কখন ফিরব ঠিক নেই। যা সিদ্ধান্ত নেয়ার, জলদি নিন।'

পদশব্দ সরে যেতে লাগল দরজার কাছ থেকে।

নয়

ভীষণ বিরক্তিকর আর একঘেয়ে মনে হলো মুসার কাছে কাজটা–সৈকতে বসে বসে চোখ রাখা। এত তাড়াতাড়ি কিছু ঘটবে বলে মনে হলো না তার। আসবে না ওমরভাই। মনকে বোঝাল: বেশিক্ষণ বসে থাকতে হবে না তাকে; শীঘ্রি চলে আসবে কিশোররা।

সাগর, পাহাড়, যেদিকেই তাকায় সেই একই রকম মন বিষণ্ণ করা প্রকৃতি। কোন দিকে তাকিয়েই সুখ নেই।

এখানে বসারও নানা সমস্যা রয়েছে। এমন কোন জায়গা দেখতে পাচ্ছে না, যেখানে আরাম করে লুকিয়ে বসা যায়। কেউ এলে সে দেখবে, কিন্তু ওকে দেখতে পাবে না।

সমস্ত তৃণলতা, ঝোপঝাড় পুড়ে ছাই করে দিয়েছে আগুন। পোড়া মাটি আর রুক্ষ পাথর যেন হাঁ করে রয়েছে। লুকিয়ে বসার কোন জায়গা না পেয়ে শেষে কতগুলো পাথর তুলে এনে একজায়গায় জড়ো করে বসার ব্যবস্থা করল। এ কাজ করতে গিয়ে করল হাত ময়লা। সাগরের নোনা পানিতেই ধুয়ে এল যতটা সম্ভব।

পাহাড়ের গোড়ায় যেখানে বসার বন্দোবস্ত করেছে, সেখানে ফিরে এসে বসার পর লক্ষ করল জিনিসটা। কাজে ব্যস্ত ছিল বলে এতক্ষণ চোখে পড়েনি। অনেক আগে পড়েনি বেনায় ঢেকে ছিল বলে। পুড়ে যাওয়াতে বেরিয়ে পড়েছে। সরু একটা পায়েচলা পথ চলে গেছে পাহাড়ের গোড়া দিয়ে। ভেড়া

চলার পুরানো পথের মত। বহুকাল আগে যখন ভেড়া ছিল দ্বীপটায়, তখনই তৈরি হয়েছিল সম্ভবত। আর কোন সন্দেহ রইল না–এ পথ ধরেই সেদিন লোকগুলো এসেছিল পেছন থেকে, তার অজান্তে।

পরের আধঘণ্টা সাগর আর আকাশের দিকে নজর রেখে কাটাল সে। কোন বোট কিংবা জাহাজ চোখে পড়ল না। আকাশে দেখা গেল না বিমান। পাহাড়ে চড়ল। দশ-পনেরো মিনিট ধরে দেখল পোড়া প্রকৃতি। দুর্গের দিকে তাকাল। কিছুই দেখল না সী-গাল ছাড়া। ওগুলো সারাক্ষণই আছে। নতুন কোন শব্দ নেই সাগরের ঢেউ আর গালের কর্কশ চিৎকার ছাড়া।

বেশির ভাগ সময়ই তাকিয়ে থাকছে সে বন্ধুদের ফিরে আসার পথের দিকে।

একটা বাজার পরেও যখন কাউকে দেখল না, একদৌড়ে গিয়ে গুহা থেকে বের করে আনল কয়েকটা বিস্কুট আর খানিকটা গরুর মাংস। পাথরের ওপর বসে ধীরে সুস্থে খেয়ে নিল। মনে উত্তেজনা থাকায় খাবারের স্বাদ পেল না।

যে ভাবেই হোক, গড়িয়ে গড়িয়ে হলেও কাটতে লাগল সময়। আকাশে ভারী হচ্ছে মেঘ। যে কোন মুহূর্তে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা। সব কিছুর রঙই কেমন ধূসর। সেই সঙ্গে তার মনের রঙও যেন ধূসর হয়ে গেছে।

বিকেল চারটে বেজে গেলেও যখন কেউ এল না, চিন্তায় পড়ে গেল সে। জোয়ার আসছে। পাহাড়ের গোড়ার রাস্তাটা পানিতে ভরে গেলে আবার ভাটা না নামা পর্যন্ত আর ফিরতে পারবে না ওরা। কয়েক ঘণ্টা আটকা পড়ে থাকতে হবে দুর্গের ভেতরে। জোয়ারের পানি রাস্তার ওপরে কয় ফুট উঁচু হয় জানা নেই তার। পাহারা বাদ দিয়ে জানতে যাওয়ার ইচ্ছেও নেই। শৈলশিরায় উঠে বসে রইল সে। নিচের রাস্তা যেহেতু বন্ধ হয়ে গেছে, আসতে হলে ওদেরকে এখন পাহাড়ের ওপরের এই শিরা বেয়েই আসতে হবে।

কোন দিক দিয়েই এল না ওরা। দুশ্চিন্তা বাড়ছে। কিন্তু জায়গা ছেড়ে যাওয়ার উপায় নেই। না গেলে কিছু করাও যাবে না।

ছয়টা বাজল। এল না ওরা। রীতিমত দুশ্চিন্তা হতে লাগল এখন। কি করছে এতক্ষণ? কোন অঘটন ঘটল? এত সময় লাগবে এ রকম কোন ইঙ্গিত তো দিয়ে যায়নি কিশোর।

সময় যেন আরও ধীর হয়ে গেছে। মুসার মনে হচ্ছে, এত দীর্ঘ একটা দিন আর কখনও কাটেনি ওর। কিছু ঘটেছে ওদের–ধারণাটা বদ্ধমূল হচ্ছে মনে। কিন্তু কি ঘটেছে? বসে বসে শুধু অনুমান করতে আর মনের উদ্বেগের বোঝা বাড়াতে ভাল লাগছে না তার।

আটটা বাজল। ওপর থেকে, নিচ থেকে, শেষবারের মত চতুর্দিকটা দেখে নিল সে। গোধূলির আলোও মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছুই দেখতে পাবে না। দুর্গটাকে দেখা গেল আবছামত। কয়েক মিনিট পর আর দেখা যাবে না। আকাশে মেঘ যেন জমাট বেঁধে রয়েছে। তবে বৃষ্টি নামছে না এখনও।

নিজের কথা ভাবতে লাগল। দিনটা তো পার করে দিয়েছে কোনমতে এই জঘন্য জায়গাটায় বসে, রাতে কি করবে? যদি বৃষ্টি নামে? কোথায় যাবে? আশ্রয় খুঁজে বের করারও আর সময় নেই এখন, অনেক দেরি করে ফেলেছে। দ্বীপে আরও ঘরবাড়ি আছে, কিন্তু সেগুলো কোন্‌খানে জানা নেই তার, চেনে না। দিনের বেলা হলেও এককথা ছিল, রাতের অন্ধকারে বৃষ্টির মধ্যে অচেনা জায়গায় সেগুলো খুঁজে বের করা অসম্ভব। একটা গুহা পেলেও কাজ চালানো যায়। কিন্তু অন্ধকারে গুহা খুঁজে বের করাও সহজ নয়। পকেটে দেশলাই আছে। শুকনো ডালের মাথায় আগুন ধরিয়ে মশাল তৈরি করে নিতে পারে। কিন্তু তাতেও সমস্যা। প্রথম সমস্যা, ডাল জোগাড় করা—পাবে কোথায়? দ্বিতীয় সমস্যা, আগুন জ্বাললে শত্রুপক্ষের চোখে পড়ার সম্ভাবনা।

মেঘে ঢাকা, চন্দ্রহীন আকাশ থেকে যেন ঝুপ করে খসে পড়ল অন্ধকারের কালো চাদর। মুহূর্তে ঢেকে দিল চারদিক। চুপচাপ পাথরের ওপর বসে রইল সে। কয়েক গজের বেশি দৃষ্টি চলে না। হাঁটুতে কনুই রেখে, হাতের তালুতে থুতনি নামিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল সে। কোন কিছুই চোখে পড়ছে না; না সাগর, না আকাশ। কানে আসছে শুধু ঢেউ আছড়ে পড়ার একটানা, একঘেয়ে শব্দ। জুতোর কিংবা শব্দ কিংবা কিশোরের ডাক শোনার আশায় অস্থির হয়ে আছে।

কতক্ষণ একভাবে বসে ছিল বলতে পারবে না। মনে হলো যেন সৃষ্টির শুরু থেকেই আছে এখানে। সময় নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছে না। ঘামিয়ে লাভ নেই। এ অবস্থায় ঘুমানোর প্রশ্নই ওঠে না। ওর কষ্টকে আরও বাড়িয়ে দেয়ার জন্যেই যেন সাগরের দিক থেকে বয়ে এল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস।

তারপর হঠাৎ করেই এই দীর্ঘ সময়ের মাঝে একটা ব্যতিক্রমী জিনিস নজরে পড়ল তার। আলো। খোলা সাগরে। কতটা দূরে, অনুমান করতে পারল না। তিনবার জ্বলল-নিভল। তারপর হারিয়ে গেল। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল সে, সত্যি দেখেছে তো? ভূতের আলোর কথা শুনেছে···তাড়াতাড়ি মন থেকে কুভাবনাগুলো দূর করে দিয়ে অস্বস্তি কমাতে চাইল।

অপেক্ষা করতে লাগল সে। আবার দেখার আশায়। দেখা গেল না। ধরেই নিল, চোখের ভুল। কিন্তু এতটা স্পষ্ট দেখেছে, ভুল হয় কি করে? সাগরের দিক থেকে, তারমানে নৌকা বা জাহাজের আলো! পিঠ সোজা করে ফেলল। বোট বা অন্য যে কোন ধরনের জলযানই হোক, স্বাভাবিক আলোগুলো জ্বালেনি। সব নিভিয়ে রেখেছে। অন্ধকার রাতে আলো নিভিয়ে চলাচল করে কারা? মনে পড়ল, হ্যাগেন বলেছে, রহস্যময় প্লেনটাও দ্বীপে নেমেছিল আলো নিভিয়ে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। সাগরের দিক থেকে কানে এল ছোট এঞ্জিনের ভট-ভট শব্দ। ওর পেছনে কোনখান থেকে কথা শোনা গেল। এগিয়ে আসছে। কিশোররা নাকি? তাহলে সাবধান করে দেয়া উচিত ওদের। পরক্ষণে বুঝতে পারল কিশোরদের কেউ নয়, কথা বলছে অন্য লোক। প্রচুর মদ গিলেছে। জড়ানো হাসি।

সৈকতের দিকেই আসছে লোকগুলো।
নিঃসাড় হয়ে অন্ধকারে গা মিশিয়ে বসে রইল মুসা। লোকগুলোর চোখে পড়তে চায় না।
আরেকটা বিচিত্র শব্দ কানে এল। মানুষের নয়, এঞ্জিনেরও নয়। কিসের? বুঝে ফেলল। ঘোড়ার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ। তারমানে ঘোড়াটাকে নিয়ে এগোচ্ছে দুর্গের লোকগুলো। বোঝা টানাচ্ছে নাকি? না নৌকা থেকে মাল নামিয়ে ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে নিয়ে যাবে?
কান খাড়া করে বসে রইল সে। এগিয়ে চলেছে পানির দিকে। পাথরে ওদের জুতো ঠোকা লাগার আওয়াজ হচ্ছে। ওদের এই অসাবধানতাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, গোপনীয়তার প্রয়োজন বোধ করছে না ওরা।
ব্যাপারটা অবাক করল মুসাকে। এতটা নিশ্চিন্ত আছে কেন ওরা? ভাল করেই তো জানে দ্বীপে শত্রুপক্ষ রয়েছে; আর রয়েছে সৈকত ও বন্দরের কাছাকাছি। মুখোমুখি হয়ে গেলে সংঘর্ষ বেধে যাওয়ার কথাটাও কি ধর্তব্যের মধ্যে রাখেনি?
নিচুস্বরে কি যেন বলল একজন। কোন রকম রাখঢাকের বালাই না রেখে জোরে জোরে জবাব দিল আরেকজন, 'মরুকগে না। বসে বসে ভাবতে থাকুক। সময় তো দিয়েছি।'
খিকখিক করে হাসল মাতাল লোকটা।
হাসির জবাবে হাসল প্রথমজনও।
শক্ত হয়ে গেছে মুসার পেশি। কাদেরকে কি ভাবার সময় দিয়ে এসেছে? কোন সন্দেহ নেই, কিশোরদেরকে। ওরা ছাড়া দ্বীপে আর কেউ নেই।
একটা আলো জ্বলল সৈকতের দিকে। উঁচু হলো আলোটা। এপাশ ওপাশ নড়তে লাগল। সঙ্কেত দিচ্ছে বোটকে। বোট থেকেও আলো জ্বলে তার জবাব এল। তারপর শোনা গেল ডাক। দাঁড়ের শব্দ। একটা কণ্ঠ ডেকে জানতে চাইল, 'সব ঠিক আছে তো?' জবাবে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, আছে। নিয়ে এসেছি।'
ইস্, চাঁদটা যদি বেরিয়ে আসত এখন! একটা মুহূর্তের জন্যেও বেরোত! কি ঘটছে দেখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল মুসা। কিন্তু ওর আবেদনে সাড়া দিল না চাঁদ।
এরপর নানা রকম শব্দ হতে লাগল। কি ঘটছে অনুমানে বোঝার চেষ্টা করল সে। হয় কোন ভারী মাল বোট থেকে নামানো হচ্ছে, নয়তো বোটে তোলা হচ্ছে।
আর সহ্য হচ্ছে না। দমাতে পারছে না কৌতূহল। দ্বীপটাকে কেন জবরদখল করে রাখতে চাইছে লোকগুলো, তার জবাব রয়েছে মাত্র কয়েক গজ সামনে। গিয়ে দেখলেই হয়ে যায়। কিন্তু মস্ত ঝুঁকি আছে তাতে। ভয় তার কৌতূহলকে ঠেকাতে পারল না বেশিক্ষণ। আস্তে উঠে পড়ল পাথর থেকে। পা টিপে টিপে এগোল। পায়ের নিচে অসংখ্য পাথর পড়ছে। নিঃশব্দে এগোনো অসম্ভব। শব্দ হয়েই গেল।

'কিসের শব্দ?' শোনা গেল একজনের সতর্ক কণ্ঠস্বর।

'ও কিছু না,' জবাব দিল আরেকজন। 'অত কান দেয়ার দরকার নেই। বাতাসে পাথর গড়িয়ে পড়েছে। আর কি হবে?'

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। লোকগুলো আবার যখন স্বাভাবিক হয়ে এল, আবার পা বাড়াল সে। লণ্ঠনের আলোর কাছে ছায়া ছায়া নড়াচড়া চোখে পড়ছে এখন। একজন লোককে দেখতে পেল ক্ষণিকের জন্যে। কাঁধে করে কি যেন একটা বয়ে নিচ্ছে। একটা টর্চ জ্বলতে দেখল। মুহূর্তের জন্যে টর্চের আলোও ঘুরে গিয়ে পড়ল নৌকার পালের ওপর।

আরও কয়েক মিনিট পর শোনা গেল একজন বলছে, 'হয়ে গেছে, হ্যারি।'

'সব তোলা হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'গুড। চলি তাহলে। বিষ্যুদবারের আগে আর দেখা হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে। ততদিনে আরও মাল রেডি করে ফেলব।'

আলো নিভে গেল। ঝনঝন করে উঠল শেকল। দাঁড়ের শব্দ হলো। ঘোড়ার নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ। ঠাস করে একটা বাড়ি পড়ল। মৃদু আর্তনাদ করে উঠল ঘোড়াটা।

পিছিয়ে যাওয়ার জন্যে পা ফেলল মুসা। পা পড়ল একটা পাথরে। পিছলে গেল। শব্দ হলো জোরে। গর্জে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কে! কে ওখানে?'

টর্চ জ্বলল। আলো পড়ল এসে মুসার গায়ে। দৌড় দিতে গেল সে। কিন্তু কপাল খারাপ। আবার পা পিছলাল। সামলানোর চেষ্টা করেও পারল না। উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

উঠে বসতে না বসতে কাঁধ চেপে ধরল কঠিন আঙুল। ঘাড়ের পাশে ঠেসে বসল পিস্তলের নল। খসখসে একটা কণ্ঠ সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে হেঁকে বলল, 'আই, ল্যানি, তুমি না বললে সব কটাকে আটকেছ?'

'তাই তো মনে করেছিলাম। একটা যে রয়ে গেছে, কি করে জানব?'

'কি করা যায় একে?' জিজ্ঞেস করল অন্য আরেকজন।

'কি আর করব? নিয়ে গিয়ে বাকিগুলোর সঙ্গেই ভরে রাখব। পরে দেখা যাবে।'

দশ

দিনের উজ্জ্বল আলোও রান্নাঘরের সরু জানালা গলে তেমন প্রবেশ করতে পারে না। আর এখন রাতের বেলা, তার ওপর মেঘে ঢাকা আকাশ; এতটাই অন্ধকার, একে অন্যকেও দেখতে পাচ্ছে না কিশোররা।

অন্ধকারে বসে থাকতে ভাল লাগার কথা নয়, বিশেষ করে এ রকম

পরিস্থিতিতে। কুলুঙ্গি থেকে লাকড়ি তুলে এনে আগুন জ্বালল ওরা। তাতে একে অন্যকে দেখতে পেল। বেশি বড় করল না কুণ্ডটা। রাত শেষ হওয়ার আগেই সব লাকড়ি পুড়িয়ে শেষ করে ফেলার ইচ্ছে নেই।

লাকড়ি আনতে গিয়েই ব্যাপারটা লক্ষ করল কিশোর। লাকড়ি সরানোয় বেরিয়ে পড়েছে কুলুঙ্গির মেঝে। উবু হয়ে বসে দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে উঠল, 'এই দেখো, এটা কি?'

পাশে এসে বসল হ্যাগেন আর রবিন।

'কি দেখেছ?' জানতে চাইল রবিন।

হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে চোখ দুটোকে মেঝের আরও কাছে নিয়ে গেল কিশোর। মেঝেতে হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে। জবাব দিল না।

'কি, বলছ না কেন?' জিজ্ঞেস করল হ্যাগেন।

'আলো কম। ভালমত দেখা যাচ্ছে না।'

'দাঁড়াও, ম্যাচ জ্বেলে দিচ্ছি,' পকেট থেকে দেশলাই বের করে একটা কাঠি জ্বালল হ্যাগেন। ধরল মেঝের কাছাকাছি।

'এই দেখুন,' বলল কিশোর। 'ফাটল। আস্ত একটা পাথর। আলগা করে বসিয়ে রাখা হয়েছে।'

হ্যাগেনও হাত বোলাল মেঝেতে। 'তাই তো! তারমানে গুপ্তপথের দরজা। এতক্ষণে বোঝা গেল চাকাটার মর্ম। এটা ঘুরিয়েই সরাতে হবে পাথরটা।'

আবার চাকাটা ধরে ঘোরানোর চেষ্টা করল কিশোর। সামান্য একটু ঘুরেই আটকে গেল। পাথর আর মেঝের ফাঁকটা বড় হলো। প্রথমবার চাকাটা আধপাক ঘুরিয়ে রাখাতে পাথরটা সরেছে। ফাটলটা দেখতে পেয়েছে। নইলে মেঝের সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকত, এত সহজে চোখে পড়ত না।

'আসুন তো,' হ্যাগেনকে ডাকল সে, 'হাত লাগান। একা পারছি না।'

দুজনে মিলে চাপ দিল চাকায়। রবিনও হাত লাগাল ওদের সঙ্গে। তিনজনের মিলিত শক্তিকে আর উপেক্ষা করতে পারল না চাকাটা। ঘুরতে লাগল।

গোপন মেকানিজমে ঘড়ঘড় শব্দ তুলে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছে বিশাল চারকোনা পাথরের একটা পাশ। বেরিয়ে পড়ল একটা ফোকর। দেশলাই জ্বেলে কাঠি সহ হাতটা নিচে বাড়িয়ে দিল কিশোর। সিঁড়ি চোখে পড়ল। নিচে নেমে গেছে।

মাথা বাড়িয়ে রবিনও দেখতে পেয়েছে সিঁড়ি। আনন্দে চিৎকার করে উঠল। 'এই তো পাওয়া গেছে পথ!'

'আস্তে,' সাবধান করল কিশোর। 'ওরা শুনলে আবার কোন্ চাল চালবে কে জানে। আটকে দেবে। আর বেরোতেই পারব না তখন।'

'নিশ্চয় সুড়ঙ্গ। রাতের বেলা এখন নামবে এতে?'

'সুড়ঙ্গের মধ্যে দিন-রাতের কোন তফাত নেই। সব সময় অন্ধকার। রাস্তা যখন পাওয়া গেছে, বসে থাকার কোন মানে হয় না।'

'টর্চ তো নেই সঙ্গে। অন্ধকারে এগোব কি করে?'

'এটা কোন সমস্যাই না,' হ্যাগেন বলল। 'লাকড়ির মাথায় আগুন ধরিয়ে নেব। মশালের কাজ দেবে।'

*

সাগর পাড়ে বেরিয়ে এল ওরা। পাহাড়ের খাড়া দেয়ালের গায়ে রয়েছে সুড়ঙ্গমুখ। আট ফুট নিচে সাগরের উত্তাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গোড়ায়।

'এসে কোন লাভ হলো না,' নিচের দিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'জোয়ার শুরু হয়েছে। এখন যেতে পারব না। ভাটার জন্যে বসে থাকতে হবে।'

'নাকি রান্নাঘরে ফিরে যাব আবার?' রবিনের প্রশ্ন।

'তাতেই বা লাভটা কি হবে? আবার ফেরত যাওয়া, আবার আসা। ঝামেলা হবে। তারচেয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে কষ্ট হলেও বসে থাকাই উচিত।'

'রান্নাঘরে আমাদের সাড়া না পেয়ে কেউ যদি দেখতে আসে?'

'এলে কি হবে?'

'সঙ্গে পিস্তল আনতে পারে।'

'তা পারে। তবে এগোতে সাহস করবে না। ওরা জানে, আমাদের কাছেও পিস্তল আছে। সরু সুড়ঙ্গ দিয়ে এগোনোর সময় গুলি খাওয়ার ভয় আছে। সামনে থাকবে যে লোকটা সে সবার আগে গুলি খাবে। এই রিস্ক নিতে চাইবে না একজনও। ...আমাদের কথা আর ভাবছি না এখন। ভাবনা হচ্ছে মুসাকে নিয়ে। ওরা গিয়ে ওকে না ধরে নিয়ে আসে! তাহলে আবার আমাদেরকে ফেলে দেবে বেকায়দায়।'

জোয়ার নেমে যাওয়ার অপেক্ষায় সুড়ঙ্গমুখের কাছে বসে আছে ওরা। পেছনে খসখস শব্দ শুনে ঝট করে ঘুরে তাকাল কিশোর। কেউ আসছে। তাড়াতাড়ি পিস্তল বের করল পকেট থেকে।

আলোকিত হয়ে উঠছে সুড়ঙ্গ। মশাল হাতে এগিয়ে আসছে কেউ। আলো বাড়ছে।

পিস্তল তুলে ধরল কিশোর।

বাঁক পেরিয়ে এল মশালধারী।

হাতে ধরা লাকড়ির আলোর নিচে স্পষ্ট দেখা গেল মুখটা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত যেন বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর অস্ফুট স্বর বেরোল, 'মুসা, তুমি!'

'খাইছে! কিশোর!' মশাল হাতে দৌড়ে আসতে গিয়ে মাথা ঠুকে গেল ছাত থেকে বেরিয়ে থাকা পাথরে। 'উহ্!' করে উঠল।

'তুমি এলে কোত্থেকে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

জবাব না দিয়ে মুসা বলল, 'তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছি, তোমরাই বেরিয়েছ গুপ্তপথটা দিয়ে। বড় ভয়ে ভয়ে এগিয়েছি, বুঝলে। পুরানো সুড়ঙ্গ...'

'যদি ভূত থাকে!' কথাটা শেষ করে দিয়ে হাসতে লাগল রবিন। 'তা এলে কোন্‌খান থেকে? তোমাকে না সৈকতে পাহারায় বসিয়ে রেখে আসা হয়েছিল?'

'পাহারা না ছাই! উফ্‌, জানটা কাবার হয়ে গেছে! এর চেয়ে দোজখে বসে থাকলে আরামে থাকতাম!...তোমরা এখানে বসে আছ কেন? জোয়ারের পানি?'

'হ্যাঁ। ভাটা শুরু হতে এখনও দেরি আছে...'

সকাল ন'টা নাগাদ গুহা থেকে খাবার বের করে খেয়েদেয়ে সৈকতে এসে বসল ওরা সবাই। দশটায় শোনা গেল এঞ্জিনের শব্দ। কয়েক মিনিটের মধ্যে ল্যান্ড করল ওমরের হেলিকপ্টার।

দরজা খুলে নেমে এল ওমর। হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর?'

'অনেক কিছু ঘটে গেছে,' জবাব দিল কিশোর। 'আগে আপনার খবর বলুন। বোট তোলার লোক আসছে?'

'আসবে। সরকারি টীম পাঠানোর চেষ্টা করছেন মিস্টার ফিলিপ। সেজন্যে দেরি হচ্ছে। চলে আসবে দু'একদিনের মধ্যেই।'

'খাবার-টাবার এনেছেন?'

'হ্যাঁ।'

হেলিকপ্টারের পাশে দাঁড়িয়েই কথা বলছে ওরা।

কিশোর বলল, 'আবার মনে হচ্ছে ফিরে যেতে হবে আপনাকে। অনেক কিছু ঘটে গেছে...'

সব কথা ওমরকে জানাল ওরা।

শোনার পর ওমর জানতে চাইল, 'তাহলে কি করতে চাও এখন?'

'এখনও ঠিক করিনি কিছু,' কিশোর বলল, 'আপনার জন্যে বসে ছিলাম।...আচ্ছা, বোতলের ওপর আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে?'

'হ্যাঁ। একটা সম্ভবত মিস্টার হ্যাগেনের। পুলিশের রেকর্ডে নেই। অন্যটা চিনতে পেরেছে, হেপক্যাট হেলম নামে এক দাগী আসামীর। তিন বছর সাজা খেটে আট মাস আগে পেনটনভিল জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। তার মাস দুই পর দুজন আসামী পালিয়েছে ওই একই জেল থেকে। পুলিশের সন্দেহ, ওদের পালানোর ব্যাপারে হেলমের হাত আছে, তার সাহায্য পাওয়াতেই পালাতে পেরেছে ওরা।'

'ওর সাজা হয়েছিল কিজন্যে?'

'গ্রেট নর্থ রোডে হুইস্কি ডাকাতির দায়ে। ড্রাইভারকে ঘুষ খাইয়ে একগাড়ি মদ নিয়ে কেটে পড়েছিল। হজম করতে পারেনি। তার আগেই ধরা পড়ে যায়।'

'বোতলে হেলমের আঙুলের ছাপ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল হ্যাগেন, 'তারমানে ওই ডাকাতটাই এসে লুকিয়ে আছে আমার দুর্গে। শয়তানিগুলো করছে। তাহলে তো ওকে ধরা সহজ। পুলিশকে গিয়ে জানালেই ক্যাঁক করে এসে ধরবে।'

মাথা নাড়ল ওমর, 'না, এত সহজ নয়। ও ওর শাস্তির মেয়াদ পুরো করে তবেই জেল থেকে বেরিয়েছে। নতুন কোন অপরাধ না করলে আর তাকে অ্যারেস্ট করতে পারবে না পুলিশ...'

'আমার দ্বীপে বেআইনীভাবে ঢুকেছে, সেটা অপরাধ নয়?'

'অপরাধ, তবে সে এখনও আছে কিনা এখানে, জানতে হবে আগে। বোটে কিংবা প্লেনে করে এসে আবার চলেও গিয়ে থাকতে পারে। শিওর না হয়ে পুলিশকে গিয়ে কিছু বলা ঠিক হবে না।'

'বেশ, হেলম নাহয় কেটেই পড়েছে। অন্য লোক তো আছে এখানে। ওরা তো আমার অনুমতি নিয়ে ঢোকেনি। তাদের কথা বলা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা যেতে পারে,' একমত হয়ে বলল কিশোর। 'দুর্গে এখন কমপক্ষে তিনজন লোক আছে, পিস্তল আছে ওদের কাছে। পুলিশকে খবর দেয়ার আগে আমরাই যদি কোন ভাবে ওদের কাবু করে ফেলতে পারি, কাজটা অনেক এগিয়ে যায়। দ্বীপে কি করছে ওরা, সেটাও জেনে নেয়া যায়। হেলিকপ্টারটা এখন একটা সমস্যা আমাদের জন্যে। এটা এখানে বিনা পাহারায় ফেলে যাওয়া চলবে না। শত্রুরা এসে নষ্ট করে দিয়ে গেলে দ্বীপ থেকে বেরোনোই মুশকিল হয়ে যাবে আমাদের। তারমানে দুর্গে ওদের ওপর হামলা চালাতে গেলে একজনকে এখানে পাহারায় রেখে যেতেই হবে। তাতেও ঝুঁকি থাকে। আমরা একদিক দিয়ে গেলাম, ওরা তিনজন অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে চলে এল এখানে। একজনের তখন তিনজনের সঙ্গে পারা কঠিন। তারমানে পাহারা রেখে গেলেও হেলিকপ্টারটা নষ্ট হওয়ার রিস্ক থেকেই যাচ্ছে। আর যদি সবাই থেকে যাই, অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে–কিছুই জানতে পারব না দুর্গে কি ঘটছে।'

'কি করতে চাও তাহলে?' ভুরু নাচাল ওমর। 'যা করতে বলবে তা-ই করব।'

'ওই যে বললাম, আপনাকে আবার ফিরে যেতে হবে। মিস্টার ফিলিপকে গিয়ে এখানকার অবস্থা সব খুলে বলবেন। স্যালভিজ টীম যদি পাঠিয়ে না থাকেন এখনও, তার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশও যেন পাঠান, লোকগুলোকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।'

'আর তোমরা কি করবে?'

'হেলিকপ্টারের ঝামেলা না থাকলে আবার দুর্গে ঢোকার চেষ্টা করব।'

'একবার তো ঢুকেছ...'

'একটা জায়গা দেখা বাকি আছে এখনও। তালা দেয়া ঘরটা। আমার বিশ্বাস, আমরা যা খুঁজছি, ওখানেই আছে। মুসা কাল রাতে যা ঘটতে দেখেছে, তাতে মনে হয় স্মাগলারই ওরা। দুর্গের সেলারে বেআইনী মাল স্টক করে রাখে। রাতে নৌকা এলে ঘোড়ার পিঠে করে বয়ে নিয়ে গিয়ে পাচার করে। সেলারে কি আছে দেখে নিয়ে লোকগুলোকেও ধরার চেষ্টা করব। না পারলে যার যার মত চুপ করে বসে থাকব–আমাদের জায়গায় আমরা, ওদের জায়গায় ওরা–পুলিশ আসার অপেক্ষায়। বৃহস্পতিবারের আগে আর আসছে না ওদের

বোট। সুতরাং পালাতে চাইলেও পালাতে পারবে না। দ্বীপটা এখন ওদের জন্যে এক ধরনের জেলখানাই হয়ে গেছে।'

'হুঁ।' খানিকক্ষণ চিন্তা করল ওমর। তারপর বলল, 'আবার যে দুর্গে ঢুকবে, ওরা তো নিশ্চয় সতর্ক থাকবে। ওদের সামনে দিয়ে ঢুকবে কি করে?'

'ঢুকতে পারব। একটা বুদ্ধি বের করেছি, ওদের সামনে দিয়ে নয়, সরিয়ে দিয়ে।'

'কি করে সরাবে?'

হাসল কিশোর। 'এখানেই আপনার আর মিস্টার হ্যাগেনের সাহায্য দরকার।' হ্যাগেনের দিকে তাকাল সে, 'মিস্টার হ্যাগেন, এমন কোন কটেজ আছে, দুর্গ থেকে যেটা স্পষ্ট দেখা যায়?'

'আছে। একটা গোলাবাড়ি।'

'ব্যস, হয়ে গেল তাহলে। মন দিয়ে শুনুন এখন, কি করতে চাই। হেলিকপ্টারে করে সেই ঘরটার সামনে গিয়ে নামব আমরা এখন। মালপত্র সব নামাব। তারপর আপনাকে একা রেখে বাকি সবাই আবার কপ্টারে চড়ব। ফিরে আসব এখানে। কপ্টার মাটিতে না নামিয়ে ওপর থেকেই লাফিয়ে নেমে পড়ব আমি, মুসা আর রবিন। আমরা নেমে গেলে ওমরভাই রওনা হয়ে যাবে মেইন ল্যান্ডে। আমাদের নামতে না দেখলে শত্রুরা মনে করবে আপনাকে একা ফেলে আমরা সবাই চলে গেছি। আপনার সঙ্গে কথা বলতে আসবে তখন। আমরা তার আগেই গিয়ে লুকিয়ে থাকব দুর্গের কাছে। ওরা বেরোলেই ঢুকে পড়ব। আপনি ওদের কথা বলার ছুতোয় আটকে রাখবেন। আমরা এই সুযোগে দেখে ফেলব সেলারে কি আছে। প্রয়োজন মনে করলে, ওরা আপনার ওখান থেকে ফিরে আসার পর আর ঢুকতে দেব না। কিংবা যে কায়দায় আমাদের সেদিন বন্দি করেছিল, আমরাও ওদের বন্দি করে ফেলব। তবে অবশ্যই রান্নাঘরটায় নয়। কেমন লাগছে আমার প্ল্যান?'

এক এক করে সবার মুখের দিকে তাকাল কিশোর।

বুদ্ধিটা ভালই মনে হলো সবার।

তুড়ি বাজাল হ্যাগেন, 'আমি রাজি। কখন যেতে চাও?'

'দেরি করে লাভ কি? এখনই। কি বলেন, ওমরভাই? আপনার খিদেটিদে পেয়েছে?'

'না। সকালে পেট ভরে খেয়েছি। মালপত্র নামানোর পর যদি খিদে পায়, চা খেয়ে নিতে পারব। চলো। যাই।'

এগারো

সামনের সীটে ওমরের পাশে উঠে বসল হ্যাগেন। গোলাবাড়িটা দেখিয়ে দেয়ার জন্যে। পেছনে গাদাগাদি করে বসল তিন গোয়েন্দা।

তিন মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে গেল হেলিকপ্টার। পাথরের একটা ভাঙা বাড়ির কাছে নামল।

বাড়িটার খড়ের চালা মোটামুটি ঠিকই আছে এখনও। পাশে গরু রাখার ছাউনি।

ঘরের ভেতরে ঢুকে অবাক হলো ওরা। এতটা ভাল অবস্থায় দেখবে আশা করেনি। খটখটে শুকনো। জিনিসপত্র রাখতে সুবিধে হবে।

হেলিকপ্টার থেকে মাল নামাতে শুরু করল ওরা। সেই সঙ্গে দুর্গের দিকেও নজর রাখল। অসাবধান থেকে আবার একটা উটকো ঝামেলায় জড়াতে চাইল না।

কাউকে চোখে পড়ল না।

সব মাল নামিয়ে ঘরের ভেতর নিয়ে রাখা হলো। বেরিয়ে এল গোয়েন্দারা।

বন্দুক হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল হ্যাগেন।

একে একে হেলিকপ্টারে গিয়ে উঠল ওমর, মুসা আর রবিন। কিশোর ওঠার আগে ফিরে তাকাল, 'গুড লাক, মিস্টার হ্যাগেন। যে ভাবে বলেছি, ঠিক সেই ভাবে।...ওরা শুরু না করলে আপনি গুলি করতে যাবেন না।'

হাতের জ্বলন্ত সিগারটা নাড়ল হ্যাগেন। 'মনে আছে।'

শৈলশিরার ওপর দিয়ে সৈকতে ফিরে এল কপ্টারটা। বালির কয়েক ফুট ওপরে স্থির হয়ে ঝুলে রইল।

হ্যাঁচকা টানে দরজা খুলে ফেলল কিশোর। তাগাদা দিল, 'নামছ না কেন? জলদি করো!'

একবার দ্বিধা করে লাফ দিয়ে বালিতে পড়ল মুসা। তার পর পর নামল রবিন। ওমরের দিকে তাকাল কিশোর, 'গুড লাক, ওমরভাই।'

বলেই নিচে ঝাঁপ দিল সে।

দুলে উঠল হেলিকপ্টার। নাক উঁচু করে সোজা উড়ে চলল দক্ষিণ-পুবে। হ্যাঁচকা টানে আপনাআপনি লেগে গেল খোলা দরজাটা।

'লেগেছে?' প্যান্টের হাঁটু থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

মাথা নাড়ল দুজনেই।

'হাঁটো। জোয়ার আসার আগেই উঠে যেতে হবে।'

বন্দরের কাছে এসে পাহাড়টার অন্যপাশে চলে এল ওরা। সাগর আর খাড়া দেয়ালের মাঝের সরু পথ দিয়ে এগিয়ে চলল দুর্গের দিকে, আগের বার যেটা ধরে গিয়েছিল।

আজও নিরাপদেই দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে এল ওরা। পাথরের অভাব নেই। একটা বড় পাথরের আড়ালে হুমড়ি খেয়ে পড়ে লোকগুলোর বেরোনোর অপেক্ষা করতে লাগল।

'মাথা নামিয়ে রেখো,' সাবধান করল কিশোর। 'কোনমতেই যাতে দেখা না যায়। সব কষ্ট ভেস্তে যাবে তাহলে।'

যেখানে রয়েছে ওরা, সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে খুদে গোলাবাড়িটা। হ্যাগেনকেও দেখা গেল বাইরে বসে কাজ করতে।

অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে গেল রবিন।

অধৈর্য হয়ে পড়ল মুসা, 'বেরোবে না নাকি?'

দুপুর হলো। কিশোরও যখন ভাবতে আরম্ভ করেছে, ওরা বেরোবে না, তার প্ল্যানটা কোন কাজে লাগল না, এই সময় দেখা গেল ওদের। দুজন লোক মাঠের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে গোলাবাড়ির দিকে।

'গুড,' বলল কিশোর, 'দুর্গে আর মাত্র একজন রইল। কাবু করে ফেলতে পারব। দাঁড়াও, দেখে আসি, কোথায় আছে ও।'

দেয়ালের ধার ঘেঁষে হেঁটে সদর দরজার কাছে চলে এল কিশোর। লোকটাকে দেখতে পেল। দরজার বাইরে একটা পাথরের ওপর বসে তাকিয়ে আছে ওর দুই সঙ্গীর দিকে।

আস্তে পিছিয়ে এল কিশোর। মুসা আর রবিনকে জানাল। ফিসফিস করে বলল, 'একসঙ্গে দৌড় দেব দুজনে। পিস্তলের ভয় দেখাব। পালিয়ে গেলে যাবে। তাতে আমাদের কাজের কোন অসুবিধে হবে না। আর ভেতরে ঢুকে পড়লে আটকাব।'

'হাতে বন্দুক-টন্দুক নেই তো?' জানতে চাইল মুসা।

'দেখলাম না তো।'

'রেডি! গো!' বলেই পিস্তল হাতে দৌড় দিল কিশোর। পাথরের কাছে এসে দেখল না লোকটাকে। ভেতরে ঢুকে গেছে নিশ্চয়।

দুই সহকারীকে দুদিকে থাকতে বলে সোজা দরজার দিকে এগোল কিশোর। পাল্লাটা হাঁ করে খোলা। মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। গোলাঘরের দিকে নজর ছিল, তিন গোয়েন্দাকে দেখে মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল মুখ। চিৎকার করার আগেই ধমকে উঠল কিশোর, 'খবরদার, মুখের মধ্যে গুলি ঢুকিয়ে দেব!'

পিছিয়ে যেতে চাইল লোকটা।

পিস্তল নাচাল কিশোর, 'উঁহু, নড়লেই মরবেন!'

এগিয়ে গেল সে। দুদিক থেকে উদ্যত পিস্তল হাতে এগোল তার দুই সহকারী।

লোকটাকে আদেশ দিল কিশোর, 'পিছিয়ে যান। ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ুন। কোন চালাকির চেষ্টা করলে, ওই যে বললাম, গুলি খাবেন।'

পিছিয়ে গেল লোকটা। চালাকির চেষ্টা করল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

রবিনকে বলল কিশোর, 'রবিন, দরজার কাছে থাকো। পাহারা দাও। ওই দুজন কি করছে? দেখা যায়?'

'যায়,' দরজার কাছ থেকে জবাব দিল রবিন। 'গোলাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দরজায় বেরিয়ে এসেছে হ্যাগেন।'

'হুঁ। থাকুক ওখানে। আমাদের কাজ সেরে ফেলি।'

ভাল করে লোকটার দিকে তাকাল কিশোর। সাধারণ চেহারার খাটো

একজন মানুষ।

কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'দুর্গে আপনি একা, না আরও কেউ আছে?'

'একা,' তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল লোকটা। কিশোরকে ভয় পাচ্ছে না, পাচ্ছে তার পিস্তলকে।

'মিথ্যে বললে...'

'মিথ্যে বলছি না।'

'এখানে কি করছেন?'

'সেকথা তোমাকে বলব কেন?'

'ঠিক আছে, না বললে নেই, সব খবরই বের করে নেব। হাঁটুন, সোজা ওই করিডর ধরে। তালা দেয়া দরজাটার সামনে গিয়ে থামবেন। দৌড় দিলে গুলি খাবেন পিঠে।'

'বার বার এককথা বলতে হবে না,' হাঁটতে শুরু করল লোকটা।

তালা লাগানো দরজাটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

'ঠিক আছে, দাঁড়ান,' বলল কিশোর। 'চাবিটা দিন।'

'আমার কাছে নেই।'

'কোথায়?'

'বসের কাছে।'

'কে বস? হেপক্যাট হেলম?'

চোখ গোল গোল হয়ে গেল লোকটার। 'নাম জানি না।'

'মিথ্যে যে বলছেন, বোঝাই যাচ্ছে। মুসা, পকেট দেখো।'

লোকটার পকেট হাতড়ে একটা পিস্তল বের করল মুসা। চাবি পেল না। 'চাবি নেই।'

'ঠিক আছে। পিস্তল ধরে রাখো,' মুসাকে বলে লোকটার দিকে ফিরল কিশোর, 'দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়ান। হাত তুলে রাখুন।'

দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর। তালাটা দেখল। গুলি করা ছাড়া উপায় নেই। শব্দটা পাথরের দেয়াল ভেদ করে কি গোলাবাড়ি পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে?

গেলেও কিছু করার নেই। তালাটার কয়েক ইঞ্চি দূরে পিস্তলের মুখটা রেখে দুই হাতে বাঁট চেপে ধরল সে। তারপর একটা কড়া সই করে গুলি করল।

বন্ধ ঘরে গুলি ফোটার শব্দ শুনে মনে হলো কেয়ামত শুরু হয়েছে। কিন্তু গুলিটা জায়গামত লাগেনি। কড়ার ইঞ্চিখানেক দূরে কাঠের মধ্যে ঢুকে গেছে। ফুটো হয়ে অন্যপাশে বেরোতে পারেনি। আটকে আছে। কাঠ কতখানি পুরু আর শক্ত, বোঝা গেল।

আবার গুলি করল সে। চারবারের চেষ্টায় খুলতে পারল তালাটা। কড়া ভেঙে ঝটকা দিয়ে সরে গেল একপাশে। তালাটা ছিটকে এসে যদি কপালে কিংবা মুখে লাগত, গুরুতর জখম হত।

বাতাসে বারুদের কড়া গন্ধ।

মুসার দিকে ফিরল কিশোর, 'যাও তো, চট করে দেখে এসো, লোকগুলো আসছে নাকি।'

দৌড়ে চলে গেল মুসা।

লোকটার দিকে পিস্তল ধরে রাখল কিশোর।

মুসা ফিরে এসে জানাল, 'আসছে না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। শব্দ ওখানে গিয়ে পৌঁছায়নি।

'গুড। আটকে রাখো একে। আমি দেখে আসি ঘরের মধ্যে কি আছে।'

ঘরের মধ্যে একটা টেবিল। তার ওপরে হ্যারিকেন জ্বলছে। দরজার কাছ থেকে পাথরের সিঁড়ি নেমে গেছে। গোটা ছয়েক ধাপ। ঘর একটা নয়। অনেকগুলো দরজা দেখে বোঝা গেল সারি সারি ঘর।

যে ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে, সেটাকে মনে হচ্ছে একটা রাসায়নিক গবেষণাগার। মেঝেতে রাখা বড় বড় পিপা, বোতল, বস্তা, বাক্স, আরও নানা টুকিটাকি জিনিস।

লম্বা, পাথরের দেয়ালে ঘেরা, জানালাবিহীন ঘরটার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল কিশোর। ধীরে ধীরে ভাবান্তর হলো চেহারায়। মুসার দিকে ফিরল, 'কি করছে ওরা এখানে, বুঝতে পেরেছি।'

'কি?' আগ্রহে ফেটে পড়ছে মুসা।

'মদ বানায়। হুইস্কি।'

এতে অপরাধটা কোথায় বুঝতে পারল না মুসা।

মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'আরও আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার। সব সূত্র হাতে ছিল—কয়লার স্তূপ, বার্লি, স্কচ হুইস্কি আর হেপক্যাট হেলম, যে একজন হুইস্কি চোর। গ্রেট নর্থ রোডে মদ ডাকাতি করার চেয়ে মদ বানিয়ে নেয়াটা সহজ মনে হয়েছিল তার কাছে। পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ভাল জায়গাই বেছেছে। কেন হ্যাগেনকে থাকতে দিতে চায় না সে, জানি এখন। আমাদের তদন্ত শেষ।'

'কি করব এখন?' মুসার প্রশ্ন।

লোকটার দিকে তাকাল কিশোর, 'আপনাকে নিয়ে কিছুই করার নেই আমাদের। যা করার পুলিশ এসে করবে। যেখানে খুশি যেতে পারেন এখন। দ্বীপ ছেড়ে যাবার চেষ্টা করবেন না জানি। করে লাভ নেই। কিসে করে যাবেন? আপনাদের নৌকা কিংবা প্লেন না আসা পর্যন্ত বেরোতে পারবেন না দ্বীপ থেকে। এখন কয়েকটা প্রশ্ন করি। যদি জবাব দেন...'

'সবই তো জেনে গেছ,' বিড়বিড় করল লোকটা। 'বলার আর কিছুই নেই। হেপক্যাট হেলমকে আগেই বলেছিলাম আমি, অন্যের জায়গায় এই ব্যবসা চালানো যাবে না।'

'তাহলে যোগ দিলেন কেন তার সঙ্গে?'

'আমাকে সাহায্য করেছিল...' চুপ হয়ে গেল লোকটা।

'কি সাহায্য? পেনটনভিল জেল থেকে পালাতে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন করল? কি লাভ ছিল তার?'

'ও জানত আমি ডিসটিলারিতে কাজ করেছি। নিজে হুইস্কি বানাতে না পারলেও কি করে বানায় জানি। চেষ্টা করলে বানাতে পারব।...আইডিয়াটা ওর ছিল, আমার নয়।'

'বাহ্, এতক্ষণ তো কিছুই জানতেন না–হেপক্যাট হেলমের নামটাও না, এখন তো বেশ মনে পড়ছে। যাকগে, আপনার নিজের নামটা কি?'

'ল্যানি।'

'তা মিস্টার ল্যানি, প্লেনটা কে নিয়ে আসে এখানে?'

'হেলমের এক বন্ধু। ও পাইলট।'

'তা তো বটেই, নইলে প্লেন চালাবে কি করে। ওর লাভটা কি?'

'টাকার জোগান দিয়েছে সে। নিজের যা ছিল দিয়েছে। নিয়মিত হুইস্কি সাপ্লাই দেবে কথা দিয়ে কয়েকজন বন্ধুর কাছ থেকেও নিয়েছে। ওদের সবারই লন্ডনে নাইটক্লাব আছে। তার নিজেরও আছে একটা।'

'ক্লাবের নামে সবগুলোতেই নিশ্চয় অবৈধ কাণ্ডকারখানা চলে। কি, ঠিক বললাম না?'

দ্বিধা করছে ল্যানি।

'বলুন। সবই তো বলে দিলেন, এটা বলতে আর অসুবিধে কি? তাড়াতাড়ি কথা শেষ করলে তাড়াতাড়ি বেরোতে পারবেন।'

'অবৈধ বলতে কি বোঝাতে চাইছ তুমি?'

'এই, অবৈধ মদের চালান, জুয়া খেলা, স্মাগলিঙ, হেরোইনের ব্যবসা, এই সব আরকি।'

নিচের দিকে চোখ নামাল ল্যানি। 'হ্যাঁ।'

'কদ্দিন ধরে চলছে এ সব?'

'মাস ছয়েক।'

'জেল থেকে পালানোর পর?'

'হ্যাঁ।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'ভালই চালাচ্ছিলেন। বোকামি না করলে আরও বহুদিন চালাতে পারতেন। মেইনল্যান্ডের মানুষ এতে জড়িত হলো কিভাবে?'

'ওরাই তাহলে আমাদের ফাঁসিয়েছে! জানতাম। এত লোকের মুখ কি আর বন্ধ রাখা যায়...'

'ওরা ফাঁসায়নি। ফেঁসেছেন আপনারা নিজেরাই, বেশি বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে। হ্যাগেনের বোটটা ডোবানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। যার দ্বীপে থাকছেন, তার সঙ্গেই খোঁচাখুঁচি। সে ছাড়বে কেন?'

'তা ঠিক। এটাও আমি হেলমকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। শুনল না।...স্থানীয়দের মুখ বন্ধ করা হয়েছিল হুইস্কি ঘুষ দিয়ে। বিনে পয়সায় দেয়া হয়। ব্যবস্থা করেছে ওখানকারই লোক, মার্টি ড্যানফোর্থ...'

'হেলমের সঙ্গে যে লোকটা গেছে এখন?'

মাথা ঝাঁকাল ল্যানি। 'হুইস্কির জন্যে পাগল এখানকার লোকে। একটা বোতলের জন্যে নিজের মায়ের গলা কাটতে রাজি।...তোমাদের যে এত কথা বলে দিলাম, হেলমকে বোলো না কিন্তু!'

'আচ্ছা, বলব না। আপনি না বললেও এ সব কথা আমরা বের করে নিতাম...এক কাজ করবেন, দুর্গ থেকে বেরোবেন না। তাহলেই আর হেলম বুঝতে পারবে না কিছু। বাঁচতে চাইলে আমাদের কথা যা হোক বানিয়ে বলে দেবেন।...মুসা, চলো যাই। আর কোন কাজ নেই এখানে।'

ল্যানিকে ওখানেই দাঁড় করিয়ে রেখে মুসাকে সঙ্গে নিয়ে দরজার দিকে এগোল কিশোর। রবিন আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। ইশারায় ওকে বেরোতে বলে দরজার বাইরে পা রাখল কিশোর। মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে শ্বাস নিল। দুর্গের বাতাসে অক্সিজেনের কমতি না থাকলেও কেমন একটা গন্ধ, অস্বস্তিকর। রবিনের কাছ থেকে দূরবীনটা নিয়ে গোলাঘরের দিকে তাকাল। দুই সহকারীকে জানাল, 'ওরা এখনও আছে। তবে ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে কথা শেষ হয়েছে ওদের।'

দূরবীনটা আবার ফিরিয়ে দিল কিশোর।

'আমাদেরও তো কাজ শেষ,' রবিন বলল। 'কি করব?'

'হ্যাগেনের কাছে ফেরত যাব।'

'সরাসরি? মাঠের ওপর দিয়ে?'

'অসুবিধে কি?'

'ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে না?'

'হোক না। ওদের বলে দেব সব জেনে গেছি আমরা। খেল খতম। বলব, ওমরভাই গেছে মেইনল্যান্ডে, পুলিশ নিয়ে আসতে; খুন করার সাহস আর তখন পাবে না ওরা। চলো। খিদে পেয়ে গেছে আমার।'

তুড়ি বাজাল মুসা, 'একদম মনের কথাটা বলেছ আমার।'

বারো

বেনায় ঢাকা তরাই ধরে গোলাঘরের দিকে হেঁটে চলল তিন গোয়েন্দা। উল্টো দিক থেকে এগিয়ে আসছে লোক দুজন—হেপক্যাট হেলম আর মার্টি ড্যানফোর্থ। ওরা দেখে ফেলেছে গোয়েন্দাদের। কিন্তু গতি কমানোর কোন লক্ষণ নেই। সোজা আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে মুসা বলল, 'সাধারণ হুইস্কি, তার জন্যে এত কিছু করতে যাওয়ার কোন অর্থ দেখছি না আমি।'

'তুমি আমেরিকার কথা বলছ,' জবাব দিল কিশোর। 'এখানে হুইস্কি পাওয়া বড় কঠিন। যা-ও পাওয়া যায়, ট্যাক্স, একসাইজ ডিউটি আর বানানোর খরচ মিলিয়ে আকাশ ছোঁয়া হয়ে যায় দাম। সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার

বাইরে।'

'কিন্তু চোলাই করে যা বানাচ্ছে ওরা এখানে, হেলম-বাহিনীর কথা বলছি,' রবিন বলল, 'নিশ্চয় খুব বাজে জিনিস। তৃতীয় শ্রেণীর হুইস্কি।'

'কিংবা তারচেয়েও খারাপ। র-স্পিরিটই থেকে যাচ্ছে, খাওয়ার অযোগ্য। মদের স্বাদ তো আর জানি না কোন্‌টা খেতে কেমন, তবে বইপত্র পড়ে আর শুনে শুনে যা বুঝতে পারছি, এরা যা বানায় সেটা ভীষণ কড়া, ধাক্কা বড় প্রচণ্ড। ওই যে, মদের গুণাগুণ বোঝাতে গিয়ে লোকে বলে—বুনো ঘোড়ার মত লাথি মারে, অনেকটা তা-ই। ওই লাথিই গলা দিয়ে ঢেলে আনন্দ পায় ওরা। প্রথম শ্রেণীর হুইস্কি তো পায় না, বাজেটাই খায়, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটায়।'

'মদের লাথি খেয়ে যে কোন্ আনন্দ পায় ওরা, কোনকালেই মাথায় ঢোকে না আমার,' মুসা বলল। 'মরুকগে ব্যাটারা। আসল কথা বলো। এখানে মদ বানিয়ে নিয়ে গিয়ে বেচত কোথায়?'

'ল্যানি কি বলল ভুলে গেছ? লন্ডনে অনেকগুলো নাইটক্লাবের মালিক টাকা খাটিয়েছে এতে। ওরাই নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে।'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না, ঝুঁকির তুলনায় লাভটা কত বড়?'

'নিশ্চয় অনেক বেশি, নইলে করছে কেন? এখানে যা বানায় ওরা, পচা জিনিস, আসল জিনিসের চেয়ে খরচ অনেক কম পড়ে, কোন সন্দেহ নেই। সেগুলোকেই বড় কোম্পানির আসল হুইস্কির লেবেল লাগিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই দামেই বিক্রি করে। ট্যাক্স দিতে হয় না, বানানোর খরচ বাদে অন্য কোন খরচও নেই। বড় কোম্পানিগুলো প্রচুর খরচ করার পরেও অনেক লাভ করে, ওদের জমজমাট ব্যবসা দেখেই বোঝা যায়। আর ওদের চেয়ে অনেক কম খরচ করে হেলমের লাভটা কি পরিমাণ হয় আন্দাজ করা কি খুব কঠিন? পানির কোন দামই নেই, বিনে পয়সায় পাওয়া যাচ্ছে। কয়লা আর বার্লির দামও কম। আর যন্ত্রপাতি যা এনেছে, সব সস্তা।...এসে গেছে।'

মুখোমুখি হলো দুটো দল।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল ইংরেজ লোকটা। কড়া গলায় বলল, 'তোমরা যাওনি?'

'গেলে কি আর কথা বলতে পারতেন?' বাঁকা জবাব দিল কিশোর। ~~'আপনি নিশ্চয় হেপক্যাট হেলম?'~~

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল লোকটা। 'কি করে জানলে?'

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রয়েছে ওর সঙ্গী, মার্টি ড্যানফোর্থ। চোখে ক্ষুধার্ত হায়েনার দৃষ্টি। হুকুম পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তিন গোয়েন্দার ওপর।

'আমরা গোয়েন্দা,' জবাব দিল কিশোর, 'জানাটাই আমাদের কাজ।'

'কি ওদের সঙ্গে ক্যাচর-ক্যাচর করছ!' কর্কশ কণ্ঠে মার্টি বলল। 'ছেড়ে দাও আমার হাতে, ঘাড় মটকে দিই!'

হাত নেড়ে ওকে চুপ থাকতে ইশারা করল হেলম। কিশোরকে জিজ্ঞেস করল, 'গোয়েন্দাগিরি করে কি কি জানতে পারলে?'

'সব। এখানে যা যা হচ্ছে। আপনাদেরকে আবার জেলে পাঠানোর জন্যে

যথেষ্ট। জেল থেকে পালানো আর পালাতে সাহায্য করার জন্যেও একটা শাস্তি পাওনা হয়ে আছে আপনাদের। এখানকার ঘটনা তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শাস্তির পরিমাণ বাড়াবে কয়েক গুণ।'

রাগ দমাতে না পেরে পকেটে হাত দিতে গেল মার্টি। ওর আগেই পিস্তল বেরিয়ে এল কিশোরের হাতে। মুচকি হেসে বলল, 'এটা যে ব্যবহার করতে জানি, আশা করি বুঝতে পারছেন। তবে নেহায়েত প্রাণ বাঁচানোর দরকার না হলে করব না। ওমরভাই, মানে আমাদের পাইলট চলে গেছেন মেইনল্যান্ডে। যে কোন সময় পুলিশ নিয়ে এসে হাজির হবেন। তার আগে আপনাদের বোট কিংবা প্লেন আসবে না...'

'কি করে জানলে?'

'ওই যে বললাম, গোয়েন্দা, জানাটাই আমাদের কাজ,' মার্টির দিকে তাকাল কিশোর। 'নৌকাটৌকা কিছু না এলে দ্বীপ থেকে বেরোতেও পারবেন না, পালাতেও পারবেন না। আপনাদের জারিজুরি খতম। আমাদের বোটটা ডুবিয়ে দিয়ে অনেকগুলো ভুল করেছেন–সন্দেহ জাগিয়েছেন আমাদের, নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করে দিয়েছেন; আর সবচেয়ে বড় ভুলটা হলো, ওটা ভেসে থাকলে আমাদেরকে কোনভাবে কাবু করে ওটা নিয়েই পালানোর চেষ্টা করতে পারতেন। এখন আর সে-সুযোগও নেই।'

জ্বলন্ত চোখে মার্টির দিকে তাকাল হেলম। 'তোমার বাড়াবাড়ির জন্যেই হলো এ সব। তখনই বলেছিলাম, দরকার নেই...'

'এখন গিয়ে তুলে নিলেই পারি!' গোঁ-গোঁ করে বলল মার্টি।

হাসল কিশোর। 'তোলার সরঞ্জাম ছাড়া? যান, সুযোগ দিচ্ছি, পারলে গিয়ে তুলে নিয়ে পালান।'

'বোকার মত কথা বোলো না!' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল হেলম। 'তুলতে পারলে কি আর বসে আছে নাকি ওরা? কখন তুলে ফেলত।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'তোমরা কি করবে এখন?'

'আমরা আর কি করব? পুলিশ আসার অপেক্ষায় বসে থাকব। আমাদের কাজ শেষ। যে উদ্দেশ্যে এসেছিলাম, হয়ে গেছে। জেনে গেছি, দ্বীপের রহস্যটা কি। অপরাধের আখড়া বানিয়েছেন দ্বীপটাকে।...চলি, খিদে পেয়েছে। গুড বাই।'

দুজনের পাশ কাটিয়ে এল কিশোর। সঙ্গে চলল তার দুই সহকারী।

কয়েক পা এগিয়ে ফিরে তাকাল সে। তেমনি দাঁড়িয়ে আছে হেলম আর মার্টি। ওদের দিকে তাকিয়ে।

হেসে বলল কিশোর, 'দুর্গে গিয়ে বসে থাকুনগে। অন্য কোনখানে থেকে বৃষ্টিতে ভিজে কষ্ট করার দরকার নেই।'

আর কিছু না বলে ঘুরে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল সে। ফিরে তাকাল না।

গোলাঘরের দরজার সামনে ওদের জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাগেন। কি করে এসেছে জানার জন্যে অস্থির। ওরা কাছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে

জিজ্ঞেস করল, 'কি আছে? কি করছে ওরা এখানে?'

'আছে মদের ভাঁড়ার। হুইস্কি চোলাইয়ের কারখানা খুলেছে আপনার দুর্গের পাতালঘরে। বলেছিলাম না বার্লির মধ্যে লুকিয়ে আছে এই রহস্যের সমাধান। দুর্গে ঢুকে পোড়া গন্ধও সেদিন পেয়েছিলাম এ কারণেই। চোলাইয়ের কাজ চলছিল তখন।'

গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে আছে হ্যাগেন। 'ঘটনাটা কি, খুলে বলো তো?'

'তালা দেয়া ওই দরজাটা সেলারের দরজা,' কিশোর বলল। 'প্রথমবার যখন এসেছিলেন, তখনই যদি খুলে ফেলতেন, দেখে ফেলতেন সব। তবে না খুলে ভাল করেছিলেন। একা ওদের সঙ্গে পারতেন না। খুন করত আপনাকে। যাই হোক, সেলারে অনেক জায়গা। অনেক ঘর। প্রাচীনকালে সেনাবাহিনী থাকার জন্যে বানিয়েছিল। বন্দিদেরও নিয়ে গিয়ে ওখানে আটকে রাখা হত হয়তো। এরাও মোটামুটি তা-ই করছে এখানে। জেল পালানো কয়েদী কিংবা অপরাধীদের সাময়িক আশ্রয় দেয়, মোটা টাকার বিনিময়ে লুকিয়ে রাখে, পরিস্থিতি শান্ত হলে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়। পাশাপাশি করে বেআইনী হুইস্কি চোলাইয়ের ব্যবসা। লন্ডন আর আশেপাশের অন্যান্য শহরের আজেবাজে নাইটক্লাবগুলো–যেগুলোতে হরদম বেআইনী আর অসামাজিক কাজকারবার চলে, সেগুলোর সদস্যরা হলো এদের খদ্দের।'

কি ভাবে দুর্গে ঢুকে ল্যানিকে পাকড়াও করেছে, কিভাবে সব জেনেছে, খুলে বলল কিশোর।

'এ কারণেই!' মাথা দোলাতে দোলাতে বলল হ্যাগেন। 'এই তাহলে কারণ! তাই তো বলি, দ্বীপটা নেয়ার জন্যে এত আগ্রহ কেন ওদের?'

'কি কথা বলল হেলম?' জানতে চাইল কিশোর।

'দ্বীপটা কিনতে চাইল আমার কাছে থেকে।'

'কিনতেই চাইল?'

'প্রথমে পাঁচ বছরের জন্যে ভাড়া চাইল। টাকা কোন সমস্যাই না, জানাল আমাকে। আমি বললাম, আমারও টাকার কোন সমস্যা নেই। তারপর কিনেই নিতে চাইল, বর্তমান বাজার দরের চেয়ে বেশি দিয়ে। রাজি হলাম না। তখন বলল, আমি যে কোন একটা দাম বলতে। যত বলব তত দিয়েই কিনবে। ওরা যত চাপাচাপি করতে লাগল, আমারও জেদ চেপে গেল। বললাম, বেচবই না। অন্য পথ ধরল তখন হেলম। নরম কথা বলে বোঝানোর চেষ্টা করতে লাগল। বলল, ফালতু একটা দ্বীপের জন্যে এত জেদ করছি কেন আমি। আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, ফালতু একটা দ্বীপের জন্যে এত টাকা সে-ই বা খরচ করতে চাইছে কেন? গাঁইগুঁই করে, জবাব দিতে না পেরে, গেল রেগে। ওর সঙ্গের গাধাটা পিস্তল বের করতে যাচ্ছিল। বারো বোরোর নলের মুখটা সোজা তুলে ধরলাম ওর কপাল সই করে। ধমক দিল ওকে হেলম। শেষে, আমাকে দ্বীপ বিক্রির কথাটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করে ফিরে গেল...'

'কোন হুমকি-টুমকি দিল না?'

'শুরুর দিকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন বুঝল, কাজ হবে না, নরম হয়ে

গেল।'

'ওরা বুঝতে পেরেছে, একবার যখন দ্বীপের ওপর নজর পড়েছে আপনার, জোর-জবরদস্তি করে আর কিছু করতে পারবে না। তাতে সন্দেহ বাড়বে আপনার, পুলিশ আসবে, তদন্ত হবে। ব্যবসা তো যাবেই, হাতে হাতকড়া পড়বে আবার। সেজন্যেই সহজ সমাধানটায় যেতে চেয়েছে–দ্বীপটাই কিনে ফেলা। আপনার ভাগ্য সত্যিই ভাল, প্রথমবার একা এসে যে সেলারের তালা খোলার চেষ্টা করেননি। খুললে কোনমতেই ফিরে যেতে দিত না ওরা আপনাকে।'

'হুঁ! তাই তো মনে হচ্ছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল হ্যাগেন। 'এখন ওরা কি করবে বলে মনে করো?'

'কি আর করবে? কিছুই করার নেই। চার-চারজনকে খুন করার সাহস করবে না। করে যে লাভ নেই, সেটা বুঝে গেছে। আমাদের খুন করেও খবরটা চাপা রাখতে পারবে না। ওমরভাই হাতছাড়া হয়ে গেছে। পুলিশ নিয়ে ফিরে আসবে, জানিয়ে দিয়েছি। অতএব বসে বসে ধরা পড়ার অপেক্ষা করা ছাড়া আর পথ নেই ওদের। ওরা এখন পরাজিত।'

'খালি বকর বকরই করবে?' তাড়া দিল মুসা, 'খাওয়ার ব্যবস্থা তো করতে হয়। পেটের মধ্যে ছুঁচো নাচছে।'

হাসল হ্যাগেন। 'এসো, ঘরে এসো। খাবার রেডিই করে রেখেছি আমি।'

***

কিশোর জাদুকর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

'রবিন এত দেরি করছে কেন,' মুসা বলল, 'কি হলো ওর?'

ঘড়ি দেখল কিশোর, 'মাত্র তো পনেরো মিনিট। কি আর হবে?'

উজ্জ্বল রোদ। চমৎকার দিন। পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে রবিনের জন্যে অপেক্ষা করছে দু'জনে।

'এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না আমার। গেল কোথায় ও?' গলা লম্বা করে রাস্তার দিকে তাকাল মুসা। রবিন আসছে কিনা দেখছে।

'আর পাঁচ মিনিট দেখব।'

'না এলে সোজা বাড়ি চলে যাব আমি। খিদেয় পেট জ্বলছে।' চারপাশে তাকিয়ে বসার কোন জায়গা না পেয়ে দেয়ালে হেলান দিল মুসা। 'খিদেয় আমার গা কাঁপছে।'

'সব সময়ই তো খিদেয় তোমার গা কাঁপে। কাঁপুক। বাড়ি যেতে পারবে না। একটা হপ্তা ধরে লাইব্রেরিতে যাব যাব করে যাওয়া হচ্ছে না। এ নেই তো ও নেই...ফেসটিভ্যালে যাওয়ার ইচ্ছে নেই নাকি তোমার?'

বার্ষিক রকি বীচ ফেসটিভ্যালে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। এ বছর খুব জাঁকজমকের সঙ্গে উৎসব পালনের চিন্তাভাবনা করছে শহরবাসী। পুরানো আমলে কিভাবে এ উৎসব পালন করা হত এখানে, সেটা জানার জন্যে লাইব্রেরিতে যেতে চাইছে ওরা। ওদের স্কুল থেকে ব্যতিক্রমী কিছু করার কথা ভাবছে কিশোর।

'ওই যে আসছে,' সোজা হয়ে দাঁড়াল কিশোর। 'সঙ্গের ছেলেটা কে?'

ছেলেটার কালো চুল। রবিনের চেয়ে দু'এক ইঞ্চি লম্বা। অ্যাথলেটদের মত স্বাস্থ্য। লম্বাটে, চোখা মুখ।

'কে ও?'

'চিনি না...না না, মনে পড়েছে, ওটা ওই নতুন ছেলেটা। কি যেন নাম?...আমাদের এক ক্লাস ওপরে পড়ে। টম জুবের।'

'ও, তাই তো,' মুসাও চিনতে পারল। জুবেররা রকি বীচে নতুন, কয়েক হপ্তা আগে এসেছে। 'ওর বাবা-মাকে নিয়ে লোকে নানা কথা বলছে, শুনেছ? কাল মা মার্কেট থেকে শুনে এল।'

'কি শুনেছেন?' বিশেষ আগ্রহ দেখাল না কিশোর।

'ওর মা নাকি ঝাড়ফুঁক করে জটিল রোগ সারাতে পারে। ওর বাবা ম্যাজিশিয়ান। ম্যানার স্ট্রীটে একটা দোকান নিয়েছে ওরা...অ্যাই, রবিন, অনেক

দেরি করে ফেললে।'

কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। পেছনে টম।

'টমকে নিয়ে এলাম,' রবিন বলল, 'ও তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিল। টম, ও কিশোর। তোমার মতই বুদ্ধি...'

'বুদ্ধিমান লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে আজকাল,' আফসোস করে বলল মুসা। 'দুনিয়ায় কেবল আমিই বোকা রয়ে গেলাম।'

'ও মুসা,' হেসে টমকে বলল রবিন। 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না। ও এভাবেই কথা বলে।'

'না না, মনে করব কি,' হেসে বলল টম। মুসা আর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'শুনলাম, তোমরা শখের গোয়েন্দা। অনেক রহস্যের সমাধান করেছ। ইনটারেস্টিং মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'ইনটারেস্টিং তো বটেই,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'মাঝে মাঝে আল্লার দেয়া জানটা খোয়ানো বাকি থাকে আরকি!'

মুসার কথায় কান না দিয়ে টমকে বলল কিশোর, 'রহস্যের সমাধান করতে আমাদের ভাল লাগে।'

'কিশোর,' রবিন বলল, 'টমকে বললাম, কেরির সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের স্কুল ম্যাগাজিনে ম্যাজিকের ওপর একটা কলাম লিখতে পারে টম। দারুণ জনপ্রিয়তা পাবে।'

কেরি জনসন সবচেয়ে ওপরের ক্লাসে পড়ে। স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা।

'তা মন্দ হয় না।' টমের দিকে তাকাল কিশোর, 'তুমি ম্যাজিক জানো নাকি?'

'অল্পস্বল্প। আব্বার কাছে শিখেছি।'

'অতি বিনয়।' মুসা আর কিশোরের দিকে ফিরল রবিন, 'খুব ভাল ম্যাজিক জানে ও। ঘড়ি উধাও করে দেয়ার ম্যাজিকটা তো অসাধারণ। এই টম, দেখাও না ওদের।'

'বেশ,' হাত বাড়াল টম, 'একটা ঘড়ি দেবে?'

'আমারটার দিকে চেয়ে লাভ নেই,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল মুসা, 'অনেক দাম। কিছু হলে মা আমাকে খুন করে ফেলবে।'

আস্তে করে নিজের ঘড়িটা খুলে টমের তালুতে রেখে দিল কিশোর। 'কোনখান থেকে এসেছ তোমরা?'

'রিভারসাইড কাউন্টি,' একটা রুমাল বের করে ঘড়িটা জড়িয়ে নিল টম।

'রিভারসাইড কাউন্টির কোথায়? গেছি আমি ওখানে। চিনতে পারি।'

'চিনবে না। ইয়েলো লীফের একটা সরু গলি। থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল আমার আব্বা-আম্মা। শেষে ভাবল, অনেক হয়েছে, আর না, এবার বেরোনো যাক। পালিয়ে এল রকি বীচে।'

'পালিয়ে এল বলছ কেন?'

'থাকতে মন চায়নি। পালিয়েই তো এসেছে।'

'হুঁ।'
'এখানে মনে হয় ভালই থাকা যাবে, দোকানটা যদি চলে। ইনকাম মন্দ হবে না। কি বলো?'
'কিসের দোকান?'
'ম্যাজিক দেখানোর জিনিসপত্র। ভেষজ ওষুধ। তা ছাড়া হোলফুড—এই যে আজকাল স্বাস্থ্য সচেতন লোকেরা খাওয়া শুরু করেছে। আরও নানা রকম জিনিস। দেখলেই বুঝবে। যাবে নাকি?'
'আমার তো এক্ষুণি যেতে ইচ্ছে করছে,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল মুসা, 'এ শহরটায় তো ম্যাজিক আর খাবারের আকাল পড়েছে আজকাল।'
রুমালে মোড়া ঘড়িটা ফুটপাথে রাখল টম। 'সরো। সরে যাও। মন্ত্র পড়ব।'
সরে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা।
দুই হাত সামনে বাড়িয়ে চোখ আধবোজা করে, একঘেয়ে কণ্ঠে বিড়বিড় করে বলল টম, 'হোকাস-পোকাস, সব বোগাস, ঘড়ি ফুটুস-ঠুস্‌স্‌! লাগ ভেলকি লাগ! কিশোরের ঘড়ি ভাগ!…ব্যস, চলে গেছে।'
রুমালের পুঁটলিটার দিকে তাকাল মুসা। 'ওর মধ্যে ছিলই না। আগেই তুমি তোমার শার্টের হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছ।'
'তাহলে দেখো আমার দেহতল্লাশি করে,' নির্দ্বিধায় জবাব দিল টম।
রুমালটা তোলার জন্যে নিচু হলো কিশোর।
বাধা দিল টম, 'এক সেকেন্ড।'
কেউ কিছু বোঝার আগেই পা তুলে জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিল রুমালটা, ভেতরে কিছু থাকলে ভর্তা হয়ে যাবে। কড়মড় করে শব্দ হলো। হাঁ হয়ে গেল কিশোরের মুখ।
'হায় হায়,' চমকে গেল টম, 'মন্ত্রে কাজ হয়নি!'
'আমার ঘড়ি!' চিৎকার করে উঠল কিশোর।
মুখ কালো করে রুমালটা তুলে নিয়ে খুলতে শুরু করল টম। বেরোল ঘড়ির ভাঙা কাঁচের টুকরো আর যন্ত্রপাতি। কিশোরের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে টম বলল, 'মন্ত্রে কাজ তো হয়েছে এতদিন, আজ এমন হলো কেন!'
নির্বাক হয়ে গেছে কিশোর।
ভাঙা টুকরোগুলো সহ রুমালটাকে হাতের তালুতে দলামোচড়া করে টম বলল, 'ঠিক আছে, দাম দিয়ে দিচ্ছি। কত?'
'দাম দিয়ে কি করব আমি?' তিক্তকণ্ঠে বলল কিশোর, 'চাচী আর আস্ত রাখবে না আমাকে। গত জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল।'
পকেট থেকে পেটমোটা একটা মানিব্যাগ বের করল টম। 'ঠিক আছে, নতুন আরেকটা ঘড়ির দামই নাহয় দিচ্ছি। এক রকম দেখে কিনে নিও। তোমার চাচী বুঝতে পারবে না।'
'কিন্তু ওটা ছিল উপহার…নতুন আরেকটা কিনলেও সেটার আর উপহারের মূল্য থাকবে না…' থেমে গেল কিশোর। পেটমোটা ব্যাগ খুলে একটা ঘড়ি

টেনে বের করছে টম। দুই আঙুলে ফিতের মাথা টিপে ধরে উঁচু করল ঘড়িটা।
শব্দ করে হেসে উঠল রবিন।
'ওটার বদলে তাহলে এটা নাও,' কিশোরের নাকের সামনে দোলাতে দোলাতে বলল টম। 'চলবে এতে?'
কিশোর দেখল, ওর নিজের ঘড়িটাই। সামান্যতম দাগও পড়েনি কোথাও।
কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল মুসা। 'খুব একচোট নিল তোমাকে ও। রবিন ঠিকই বলেছে, বুদ্ধি আছে। আমি বলেছি না, রুমালের মধ্যে তোমার ঘড়িটা ছিলই না। আগেই সরিয়ে ফেলেছে। ভাল হাতসাফাই।'
ঘড়িটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি করে করলে?'
'ম্যাজিক,' হাসিমুখে জবাব দিল টম।

দুই

ঘড়িটা কব্জিতে পরে নিল কিশোর। হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু স্বাভাবিক হাসি ফুটল না। ধোঁকা খাওয়ার কথাটা ভুলতে পারছে না। নিজের ওপরই বিরক্ত।
'বলেছি না খুব ভাল ম্যাজিক জানে টম,' রবিন বলল। 'খুবই ভাল, তাই না?'
'হ্যাঁ, সত্যি চালাক,' টমের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল কিশোর। 'তবে ওই একবারই। আর আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।' অস্বস্তির ভঙ্গিটা ধীরে ধীরে কেটে গেল চেহারা থেকে। 'যাকগে, ভালই বোকা বানিয়েছ।'
'আরও অনেক রকম ম্যাজিক জানে ও,' রবিন বলল।
'আর আধঘণ্টার মধ্যেই কিন্তু লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবে,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'নাকি আজও যাওয়া বন্ধ?'
'না না, যাব,' কিশোর বলল। 'মাত্র আছে আর দুই হপ্তা। আজ না গেলে হবে না।'
'ঠিক আছে, যাও তোমরা,' রবিন বলল। 'আমি টমের সঙ্গে এক জায়গায় যাচ্ছি। একটা মজার জিনিস দেখাবে বলেছে টম। পরে বলব তোমাদের।'
রাস্তা পার হয়ে চলে গেল দু'জনে। তাকিয়ে রইল মুসা আর কিশোর।
'লাইব্রেরিতে যেতে রবিনের অনীহা!' বিড়বিড় করল মুসা। 'স্বপ্ন দেখছি না তো?'
'না, ঠিকই দেখছ,' শুকনো কণ্ঠে বলল কিশোর। 'নিশ্চয় লাইব্রেরির চেয়েও মজার কোন কিছুর খোঁজ দিয়েছে ওকে টম। ছেলেটা কেমন যেন...ওদের রিভারসাইড কাউন্টিতে বাস করার ব্যাপারটাও।'
'ওতে আবার কি দেখলে? রিভারসাইড কাউন্টিতে থাকে না নাকি মানুষ।'

'থাকে। কিন্তু ও বলল ইয়েলো লীফের একটা সরু গলিতে থাকত ওরা। ইয়েলো লীফটা রিভারসাইড কাউন্টিতে নয়, ওরিংটনে। ওটা একটা অতিমাত্রায় সম্ভ্রান্ত এলাকা। ওরকম জায়গায় কেবল বড় বড় কোটিপতিরাই থাকতে পারে।'

'হয়তো ওরা কোটিপতিই।'

'কোটিপতি? বাবা দেখায় ম্যাজিক, মা করে ঝাড়ফুঁক; এ সব করে ক'টাকা পায়? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'হয়তো ওর বাবা অনেক বড় ম্যাজিশিয়ান। কিংবা বাড়িয়ে বলে আমাদের চমকে দেয়ার চেষ্টা করেছে টম। এটা নিয়ে এত ভাবার কি হলো?'

'অদ্ভুত লাগছে আরকি।'

লাইব্রেরির দিকে এগোল দু'জনে।

'ঘড়িটা কি করে উধাও করেছে আমি বুঝে গেছি,' মুসা বলল। 'দাও দেখি তোমার ঘড়িটা, একবার চেষ্টা করে দেখি।'

'জীবনেও কাউকে দেব না আর। তোমার ওই বিশাল পা'টা তুলে দিলে ঘড়ি বলেই চেনা যাবে না আর। কি বাঁচাটাই না বেঁচেছি, চাচীর বকা থেকে। আরেকটু হলেই হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাচ্ছিল। ইচ্ছে করে আমাকে ভড়কে দিয়েছে ও।'

লাইব্রেরিতে ঢুকল ওরা। ডেস্কে রাখা একটা কম্পিউটারের সামনে বসল কিশোর। দ্রুতহাতে চাবি টিপতে আরম্ভ করল।

'কি খুঁজছ?' জানতে চাইল মুসা।

'এফ ফর ফকলোর।'

দ্রুত একসারি সবুজ লেখা ফুটল স্ক্রীনে। দেখতে দেখতে বলে উঠল কিশোর, 'পেয়েছি।' উঠে দাঁড়াল সে, 'এসো।'

তাক থেকে মোটা মোটা আধডজন বই নামিয়ে আনল দু'জনে। ডেস্কে রেখে ওল্টাতে শুরু করল কিশোর। মুসা তাকিয়ে রইল। বই ঘাঁটাঘাঁটি ভাল লাগে না ওর।

'ঠিক জায়গাতেই খুঁজছি,' কিশোর বলল। 'বহু জিনিস আছে এখানে। কিছু না কিছু পেয়েই যাব।'

পাশের টেবিলে বসা দু'জন মহিলা কথা বলছে। কানে আসছে মুসার।

'এ নিয়ে গত পনেরো দিনে দু' দুটো বড় চুরির ঘটনা ঘটল,' একজন বলছে। 'এ রকম তো ছিল না আমাদের রকি বীচ। রাতে দরজা-জানালা খুলেও শুয়ে থাকতাম। এখন তো ঘুমই হারাম করে দিল।'

'হ্যাঁ,' সায় দিল দ্বিতীয় মহিলা। 'দরজা লাগিয়ে শুয়েও আজকাল ঘুম হতে চায় না আমার।'

'শুধু কি দরজা, জানালায়ও তালা লাগিয়ে দিয়েছি আমি,' বলল প্রথমজন। 'শুনেছি, জানালার কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খোলে। সেজন্যেই তালা। সাবধান থাকা ভাল।'

কিশোরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা,

'ছিটকানি খোলা চোরের কথা আমিও শুনেছি। আমাদের গলিতেই চুরি দুটো হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চুরির কথা শুনে বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতেই কান খাড়া করে দিয়েছে সে।

'মা আজকাল রোজ ঘুমাতে যাওয়ার আগে দরজা-জানালা চেক করে,' মুসা বলল। 'আমিও চিন্তায় পড়ে গেছি। কোনদিন যে আমার ফায়ারকে চুরি করে নিয়ে যায়!'

'ফায়ার' একটা ঘোড়ার নাম। মাঝে মাঝেই জন্তু-জানোয়ার পোষার শখ হয় মুসার। রাস্তায় জখম হয়ে ঘুরতে দেখে একবার একটা কুকুর আর গাধাকেও ধরে নিয়ে এসেছিল। তবে এই ঘোড়াটা ধরে আনেনি। কম দামে এক কারনিভ্যলের মালিকের কাছ থেকে কিনেছে। টাকার অভাবে বিক্রি করে দিয়েছে মালিক।

'ঘোড়া নেবে না,' আশ্বস্ত করল কিশোর। 'বড় জিনিস, তার ওপর প্রাণী, লুকানোর অসুবিধে হবে। নিয়েই তো আর বেচে দিতে পারবে না।...এই যে, পেয়েছি।'

'কি?'

বইয়ের খোলা পাতাটায় আঙুল রাখল কিশোর। রঙিন ঝলমলে মহিলার পোশাক আর মুখোশ পরা একটা ছবি। দেখে মনে হয় মেয়ে। আসলে ছেলে। কারণ আসল ছবিটা ছাপা আছে কলামের মধ্যে। পাশে আরও একটা ছবি। ছেলেটারই বয়েসী একটা কিশোরী মেয়ের। মেয়েটা সুন্দরী।

'কারনিভ্যল কুইন সেজেছিল,' কিশোর বলল। 'বহুকাল আগে এই মেয়েটাকে শহরের লোকে কারনিভ্যলের রানী সাজিয়েছিল। ঠেলাগাড়িতে ফুলের বিছানা পেতে তার ওপর ওকে দাঁড় করিয়ে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুই পাশ আর পেছন থেকে নানা রকম জানোয়ারের মুখোশ পরে মিছিল করে গেছে লোকে। ওদের সঙ্গে ছিল ভাঁড়ের পোশাক পরা একজন। ওর ভাঁড়ামিতে হেসে গড়াগড়ি খেয়েছে লোকে। শহর প্রদক্ষিণ করে সবশেষে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে পৌঁছায় ওরা। অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে রাতে খাবারের ব্যবস্থা করে। নানা রকম খেলাধুলা, হাসি-আনন্দ আর প্রচুর খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে শেষ হয় রাতটা। কেমন লাগছে শুনতে?'

'প্রচুর খাওয়া, তাই না? দারুণ। চমৎকার। এর চেয়ে ভাল কিছু আর হতেই পারে না।'

'এত ঘটা করে উৎসব আজকাল আর করতে চায় না লোকে। ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে। খালি তাড়াহুড়া করে।'

'কারনিভ্যল কুইন কাকে বানাতে চাও? আমাকে?'

'নাহ্, তুমি অতিরিক্ত লম্বা। রানী মানাবে না। ঢ্যাঙা রানী হয়ে যাবে। রবিনকে করা যেতে পারে। পোশাকগুলো স্কুলে বসেই বানিয়ে নিতে পারব আমরা। ভাল লাগছে না শুনতে?'

'খাবারের মেন্যুটা কি?'

'এখানে যা লিখেছে, তোমার পছন্দই হবে।'

'ভাল, খুব ভাল। তাহলে কারনিভল কুইনই সই। স্কুলের ফ্লোটটাকেই রানীর ফুলগাড়ি বানানোর পরামর্শ দেব। মিছিলের মেইন ফ্লোট। শহরের লোক যদি রাজি হয়ে যায়, দিলাম সেরে; অন্য স্কুলগুলোর মুখ চুন হয়ে যাবে। কখনও তো কোন স্কুলের ফ্লোটকে প্রাধান্য দেয়া হয় না, রেকর্ড করে ফেলব আমরা। কিন্তু রবিন যদি রানী হতে রাজি না হয়?'

'সেটা আমিও ভাবছি।'

'না হওয়ার অবশ্য কোন কারণ দেখছি না। বিরাট সম্মান ওর জন্যে। ফ্লোটে দাঁড়িয়ে যাবে। সারা শহরের লোকের নজর থাকবে ওর ওপর। ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে যাবে সে, আসল রানীর মতই। ভাবতেই রোমাঞ্চিত হচ্ছি আমি।'

'কি জানি। ওর মতিগতি ভাল ঠেকল না আমার আজকে,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'যাকগে। পরের মীটিঙেই স্কুলের ফেসটিভ্যাল কমিটিকে আমাদের আইডিয়াটা জানাব। দেখি কি বলে।'

'ভাঁড় সাজবে কে? তোমাকে পার্টটা দেয়ার পরামর্শ দেব কমিটিকে।'

'মাপ চাই, আমি ওসবে নেই। কিভাবে কি করতে হবে সেই পরামর্শ দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে চাই না আমি।'

'কাল সকালেই রবিনকে জানাব সব।' কানে হাত রেখে শোনার ভঙ্গি করল মুসা, 'আরে, কিসের শব্দ–বাড়িতে ফ্রিজের মধ্যে চকোলেট চিপ আইসক্রীম মচমচ করছে না? ডাকছে আমাকে। আসছি, আসছি, আইসক্রীম, এক্ষুণি চলে আসছি। দেরি নেই।' কিশোরের দিকে তাকাল, 'এই, ওঠো। আমার আর খিদে সহ্য হচ্ছে না।'

চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল কিশোর, 'চলো।'

হেঁটে যেতে ইচ্ছে করল না। বাসে চাপল দু'জনে।

বাড়ি এসে রান্নাঘরে ঢুকেই ফ্রিজ থেকে আগে আইসক্রীম বের করল মুসা। কিশোরকে নিয়ে খেতে বসে গেল।

মুসার আম্মা ঢুকলেন। মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচালেন, 'কখন এলি তোরা?'

'এই তো, এইমাত্র,' জবাব দিল মুসা। 'মা, পার্টিটা কি সত্যি সত্যি হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কিসের পার্টি?' মুসার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল কিশোর।

'বলতে ভুলে গেছি তোমাকে,' বিষণ্ন কণ্ঠে বলল মুসা, 'এক মাসের জন্যে লস অ্যাঞ্জেলেসের বাইরে চলে যাচ্ছে বাবা, শূটিং আছে। সেজন্যে একটা পার্টি দেবে মা।'

'তোর মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে পার্টি নয়, ডেন্টিস্টের কাছে যেতে বলা হয়েছে,' মা বললেন। 'তোর বন্ধুদের না বলতে বলেছিলাম?'

'ভুলে গিয়েছিলাম,' বাড়িতে বড়দের সঙ্গে এ ধরনের পার্টিগুলো ভাল লাগে না মুসার। ঝামেলা মনে হয়। 'বলব।'

'বলিস, একটা সারপ্রাইজ আছে।'

উদ্বেগ ফুটল মুসার চোখে, 'কি সারপ্রাইজ?'

'বলে দিলে সারপ্রাইজ কি আর সারপ্রাইজ থাকল নাকি?' পাশের ঘরে চলে গেলেন মিসেস আমান।

তিন

ওঅর্কশপে ঠকঠক শব্দ শুনে উঁকি দিল কিশোর। কাঠের কতগুলো পুরানো চেয়ার মেরামত করছেন রাশেদ পাশা। কিশোরকে দেখে কাজ থামিয়ে হাসলেন। 'ছয়টা চেয়ার, বুঝলি। ডাইনিং রুমে বসিয়ে দেব। ভালই হবে, কি বলিস?'

'হ্যাঁ।'

'এলি কোত্থেকে?'

'মুসাদের বাড়ি।'

হাসি ফুটল রাশেদ পাশার চোখে। 'চুরির তদন্ত করতে গিয়েছিলি নাকি?'

'নাহ্। কেন?'

'এই জানতে চাইলাম আরকি। পত্রিকায় লিখেছে তো, চুরি হয়েছে। ওদিক থেকে এসেছিস শুনে ভাবলাম, খোঁজ-খবর করতে চলে গেছিস।'

'মুসাদের বাড়ি গিয়েছিলাম অন্য কারণে। চাচা, চেয়ারগুলো মেরামত করতে কত দেরি হবে তোমার?'

'কেন?'

'না, এমনি।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ভাতিজার দিকে তাকিয়ে রইলেন রাশেদ পাশা। মাথা নাড়লেন, 'উঁহু, এমনি এমনি কোন প্রশ্ন করার ছেলে তুই নোস। আসল কথাটা বলে ফেল।'

ফেসটিভ্যালের কথাটা চাচাকে জানাল কিশোর।

'তারমানে তুই জানতে চাচ্ছিস, ফ্লোট বানানোর কাজে আমি তোকে সাহায্য করব কিনা?'

মোলায়েম হাসি হাসল কিশোর, 'করলে ভাল হত, চাচা। তোমার মত ফিনিশিং খুব কম লোকেই দিতে পারে...'

'থাক, আর ফোলাতে হবে না। কবে দরকার?'

'এখনও ঠিক হয়নি। স্কুলের ফেসটিভ্যাল কমিটির মীটিঙে আগে কথাটা তুলি। তারপর জানাব তোমাকে।'

মাথা ঝাঁকালেন রাশেদ পাশা। 'ঠিক আছে।' আবার হাতুড়ি তুলে নিলেন

তিনি।

ঘরের দিকে রওনা হলো কিশোর। মন জুড়ে আছে আগামী উৎসবের পরিকল্পনা।

*

পরদিন সকালেও রবিনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হলো না কিশোর আর মুসার। গিটার শেখে রবিন। টীচারের বাড়ি যাবে ওই সময়। মীটিঙে হাজির থাকার একান্ত ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও থাকতে পারল না।

'যা সিদ্ধান্ত হয় পরে জানাব ওকে,' মীটিঙ যে ঘরে হবে, সেদিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল মুসা। 'আমাদের বাড়িতে পার্টির দাওয়াতটাও ওই সময়ই দেব ওকে।'

'পার্টিটা তোমার এত অপছন্দ কেন বলো তো?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'আরে ধুর, ও কিছু হয় নাকি! কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করা ছাড়া আমার আর কিছুই করার থাকবে না। মা গিয়ে তার সব বন্ধুদের বলে আসবে। ওরা হাজির হবে একগাদা ছানাপোনা নিয়ে। আর ছানাও যা ছানা, ইবলিস একেকখান!' করুণ চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'ওগুলোকে সামলানোর দায়িত্বটাই হয়তো আমার ওপর চাপিয়ে দিল মা। তখন কি করব? তোমাদের মুসা আমানকে খুঁজে পাবে না আর কোনদিন। জ্যান্ত চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে...'

হেসে ফেলল কিশোর। 'অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? দরকার হয় আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

ভরসা পেল না মুসা। ওই 'ইবলিসগুলোর' কাছে কিশোরও নস্যি!

ঘরে ছয়-সাতজন লোক জমায়েত হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছে স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা কেরি জনসন। কিশোরের সঙ্গে সরাসরি গণ্ডগোল না বাধালেও মনে মনে একটা রেষারেষির ভাব আছে কেরির। এর কারণ কিশোরকে ভয় পায় সে। কিশোরের বুদ্ধি তার চেয়ে অনেক বেশি। ম্যাগাজিনের বিষয়বস্তু নিয়ে যে সব পরামর্শ দেয়, কোনটাই অগ্রাহ্য করতে পারে না কেরি। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক হয়, এগুলো তার মাথায় আসেনি কেন? তার ভয়, কোনদিন সম্পাদনার দায়িত্বটা কিশোরের হাতে চলে যায়।

মিস ওয়াভার, কমিটির সভানেত্রী, একটা টেবিলে বসে পা দোলাচ্ছেন। সদস্যদের আসার অপেক্ষা করছেন। বেশ হই-চই হচ্ছে ঘরে।

কিশোর আর মুসাকে ঢুকতে দেখে সবার উদ্দেশ্যে হাত তুললেন, 'এই, থামো। চুপ করো। ফ্লোট নিয়ে ভাবতে বলেছিলাম যে, ভেবেছ কিছু?'

সবাই জানাল, ভেবেছে।

'বেশ, শোনা যাক তাহলে। এক এক করে বলো।'

কয়েকটা আইডিয়ার কথা বলা হলো। তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা চলল সেগুলো নিয়ে। চীনা আগুন-ঝরানো ড্রাগন বানানোর পরামর্শ দিল একজন। পছন্দ হলো না। বহুবার করা হয়েছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে নাটিকা অভিনয় করতে করতে এগোনোর কথা বলল একজন। অতিরিক্ত জটিল। শুরু

থেকে শেষ পর্যন্ত সবটা না দেখতে পারলে দর্শকরাও মজা পাবে না। এত ঠেলাঠেলির মধ্যে সবটা দেখা বড় কঠিন কাজ। নাটক হলো এক জায়গায় বসে দেখার জিনিস। অতএব ওটাও বাদ। সবশেষে কিশোর বলল তার কার্নিভল কুইনের কথা।

'হ্যাঁ, এইটা নিয়ে ভাবা যেতে পারে,' মিস ওয়ান্ডার বললেন। 'এর মধ্যে নতুনত্ব আছে।'

কিভাবে কি করবে বলতে লাগল কিশোর। 'মধ্যযুগীয় পোশাক পরব আমরা। প্রাচীন পোশাক পরা একজন বীনাবাদকও রাখা যেতে পারে। বাজাতে বাজাতে মিছিলের সঙ্গে যাবে সে।'

'একজন কুইনের দরকার হবে আমাদের। কাকে রানী বানানো যায়?' কেরির দিকে তাকালেন মিস ওয়ান্ডার।

রানী হওয়া সোজা কথা নয়। শহরের সমস্ত মানুষের নজর তার ওপর থাকবে। ভুলচুক হলে হাসির পাত্র হতে হবে। কি ঘটবে তখন ভাবতেই কুঁকড়ে গেল কেরি। দু'হাত নেড়ে মানা করে দিল, সে হতে চায় না।

ঘরে মেয়ে যারা আছে, তাদের কেউই রানী হতে চাইল না। কিশোর প্রস্তাব দিল শেষে, 'মেয়েদের কেউ হতে না চাইলে ছেলেদের মধ্যে থেকেই বানানো যেতে পারে। এটা আগেও হয়েছে। রবিনকে রানী বানালে কেমন হয়?'

'সে কি হতে চাইবে?'

'আমি বললে হবে।'

আবার আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক চলল। শেষে মিস ওয়ান্ডার বললেন, 'হাতে সময় খুব কম, মাত্র পনেরো দিন, এর মধ্যে অনেক কাজ সারতে হবে। স্কুলের ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো করতে হবে তোমাদের। তবু, আজকেই তাড়াহুড়া করে সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার নেই। কাল আবার বসব। কাকে কোন দায়িত্বটা দেয়া যায়, সেটাও ঠিক করব কাল।'

লাঞ্চের সময় রবিনের খোঁজ করল কিশোর আর মুসা। ক্যানটিন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল বিড ওয়াকারকে।

'রবিনকে দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'ওই নতুন ছেলেটার সঙ্গে গেছে।'

তাড়াহুড়া করে ক্লাসের দিকে চলে গেল বিড।

মৃদু কণ্ঠে মুসা বলল, 'ঘটনাটা কি রবিনের? ছেলেটার সঙ্গে এত খাতির কিসের? দেখা হলে জিজ্ঞেস করতে হবে।'

'না,' মানা করে দিল কিশোর। চিন্তিত ভঙ্গি। 'এখনই কিছু বলতে যেয়ো না। আগে দেখতে চাই কি করে।'

'এর মধ্যে কোন রহস্য আছে ভাবছ নাকি?'

'দেখতে থাকি। বোঝা যাবে।'

অবশেষে রবিনকে খুঁজে বের করল ওরা। কেয়ারটেকারের ছাউনির কাছে একটা নিচু দেয়ালে চড়ে বসে আছে। সঙ্গে রয়েছে টম জুবের। ওদের ঘিরে রেখেছে কয়েকটা ছেলেমেয়ে।

টমের সঙ্গে তিন তাস খেলছে রবিন। তিনটে তাস দেয়ালের ওপর উপুড় করে রেখেছে টম।

'ওই যে ওটা,' বাঁ পাশের তাসটা দেখাল রবিন।

তাসটা তুলে নিল টম। চিত করল। একটা রানী।

'সহজ,' বলল রবিন।

'তোমার খেয়াল রাখার ক্ষমতা অসাধারণ,' প্রশংসা করল টম। 'কিন্তু আর বলতে পারবে না।...বাজি ধরবে? এক ডলার। হয়ে যাক, কি বলো?'

'ঠিক আছে।'

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর।

তিনটে তাসকে দ্রুত ওলট-পালট, চালাচালি করে দেয়ালে উপুড় করে রাখল আবার টম। 'এবার বলো তো, কোনটা রানী?'

'মাঝেরটা,' বলে দিল রবিন। 'এ কোন ব্যাপার হলো নাকি।'

তুলে নিল টম। চিত করল। চিড়িতনের তিন। গুঙিয়ে উঠল রবিন। হেসে উঠল দর্শকরা।

'আরেকবার চেষ্টা করবে?' টম বলল, 'দেখো, তোমার ডলারটা ফেরত নিতে পারো নাকি।'

'নাহ্, থাক। তুমি অনেক বেশি চালাক। পারব না তোমার সঙ্গে।' কিশোর আর মুসার ওপর চোখ পড়ল রবিনের। 'দেখলে?' মাথা দুলিয়ে প্রশংসার সুরে ওদেরকে বলল, 'সাংঘাতিক হাত চালু ওর!'

'ও তো জুয়া খেলছে!' বাঁকা চোখে টমের দিকে তাকাল মুসা। রবিনকে বলল, 'মীটিঙের খবর শুনবে?'

দেয়াল থেকে নেমে এল রবিন। সরে এল ছেলেদের ঘের থেকে। অন্য একটা ছেলে বাজি ধরছে তখন টমের সঙ্গে।

কারনিভ্যল কুইনের কথাটা জানানো হলো রবিনকে। রানী হবে কিনা জিজ্ঞেস করল কিশোর। জ্বলজ্বল করে উঠল রবিনের চোখ। এক কথায় রাজি।

'আমি জানতাম তুমি হতে চাইবে,' খুশি হলো মুসা। 'ফ্লোটে চড়ে শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, সবার চোখ থাকবে তোমার ওপর, দর্শকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে যাবে প্রেসিডেন্টের মত...ইস্, কেন যে এত লম্বা হলাম আমি!'

'নিশ্চয় ভিডিও করা হবে গত বছরের মত?' জানতে চাইল রবিন।

'তা তো হবেই,' কিশোর বলল। 'এত্তবড় একটা ঘটনা। আমার তো ধারণা টেলিভিশনেও দেখানো হবে।'

'গত বছর ভিডিও করেছিল কেরি,' মুসা বলল। 'ভাল হয়নি। এবার মিস ওয়ান্ডারকে বলব, তোমাকে যেন করতে দেন।'

চুপ করে রইল কিশোর।

রবিনকে পার্টির দাওয়াত দিল মুসা।

'টমকে বলবে না?' অনুরোধের সুরে বলল রবিন।

'বলব!' চট করে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। রবিনের দিকে ফিরল। 'ঠিক আছে, আসতে চাইলে আসুক। তুমিই বলে দিয়ো।'

'আচ্ছা। ও খুব খুশি হবে। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্যে পাগল হয়ে আছে সে। যাই, বলিগে ওকে।'

টমকে বলার জন্যে তাড়াহুড়া করে ভিড় ঠেলে গিয়ে ভেতরে ঢুকল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'তোমাদের পার্টিটা বোধহয় জমতে যাচ্ছে এবার।'

চার

মোটেও খুশি নয় মুসা। তার ভবিষ্যদ্বাণীই ঠিক হয়েছে। যে সব বন্ধুদের দাওয়াত দিয়েছেন তার আম্মা, তাদের বাচ্চাকাচ্চায় বোঝাই হয়ে গেছে বাড়ি। একটা ক্যাটারিং ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে বুফের ব্যবস্থা করেছেন মিসেস আমান। পার্টির জন্যে ধোপদুরস্ত পোশাক পরতে বাধ্য করেছেন মুসাকে, যে পোশাকগুলো তার মোটেও পছন্দ নয়।

হলঘরে এখানে ওখানে জটলা করছে বয়স্করা। কথা বলছে মর্টগেজ, সেভিংস অ্যাকাউন্ট আর মুসার মতে ওই ধরনেরই একঘেয়ে বিরক্তিকর সব নীরস বিষয় নিয়ে। অবশেষে চুরির কথায় এল কয়েকজন। সারা ঘর আর সিঁড়িতে দৌড়াদৌড়ি করছে বাচ্চারা। বাড়ি মাথায় করেছে।

সবার কাছ থেকে দূরে এককোণে দাঁড়িয়ে আছে মুসার বন্ধুরা–বিড, কিশোর, রবিন আর টম।

একনাগাড়ে কথা বলছে টম। খালি নিজের বাহাদুরির কথা। ভাল লাগছে না কিশোরের। ছেলেটা বিরক্তিকর।

এতবড় বাড়ি মুসাদের, ভাবতে পারেনি সে। বলল, 'তোমাকে দেখে তো মনে হয় না এ রকম বাড়ির ছেলে।'

'কোন্ রকম বাড়ির মনে হয়?'

মুসার প্রশ্নের জবাব দিল না টম। আপনমনে বলতে লাগল, 'এত টাকা থাকলে শোফারে চালানো রোলস রয়েসে চড়ে স্কুলে যেতাম। আমার ওপর নজর দিতে বাধ্য করতাম সবাইকে।'

'যতটা ভাবছ ততটা বড়লোক নই আমরা,' বিনীত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'অনেকখানি জায়গা, এটা অবশ্য বলতে পারো। র‍্যাঞ্চ হাউসগুলো এ রকম বড়ই হয়। বাবা একজনের কাছ থেকে সস্তায় কিনেছে।'

'সেই "সস্তাটাও" নিশ্চয় একটা বিরাট অঙ্ক।'
প্রসঙ্গটা ভাল লাগল না মুসার। চুপ হয়ে গেল।
হেসে বলল রবিন, 'রোলস রয়েসে না গেলেও ইচ্ছে করলে ফায়ারে চড়ে যেতে পারে মুসা।'
বুঝতে পারল না টম। অবাক হয়ে জানতে চাইল 'ফায়ার' জিনিসটা কি? নতুন কোন কোম্পানির গাড়ি নাকি?
বুঝিয়ে দিল রবিন।
'ঘোড়া! ঘোড়ার মত পচা জানোয়ার দিয়ে কি করো তুমি?' ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগল টম, যেন ঘরের মধ্যেই ঘোড়া বেঁধে রাখা হয়েছে, 'কোথায় ওটা?'
ফায়ারের ব্যাপারে কারও কোন খারাপ মন্তব্য সহ্য করতে পারে না মুসা। মনে মনে রেগে গেলেও দাওয়াত করে আনা মেহমানকে কিছু বলল না। চুপ করে রইল।
টম যদি ফায়ারের ব্যাপারে এ রকম করে বলতেই থাকে বেশিক্ষণ সহ্য করবে না মুসা, বুঝতে পেরে প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'কই, আন্টির সারপ্রাইজটা কোথায়? এখনও প্রকাশ করছেন না কেন?'
ঘড়ি দেখল টম। 'দশ মিনিটের মধ্যেই করবেন।'
ভুরু কুঁচকাল মুসা, 'তুমি জানলে কি করে?'
টমের হয়ে হেসে জবাব দিল রবিন, 'আপাতত গোপন রাখা হচ্ছে সেটা। জানতে পারবে।'
'তাজ্জব ব্যাপার! আমার বাড়িতে কি ঘটছে আমিই জানি না, অথচ বাইরের সবাই জানে!...নাহ্, না খেয়ে আর কথা বলতে পারব না। পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। কারও খিদে পেয়ে থাকলে এসো,' লোভনীয় সব খাবারে ভরা লম্বা বুফে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল মুসা। সে বাদে আর কারও খাওয়ার ইচ্ছে নেই এত সকাল সকাল। তবে কিশোর এগোল তার পেছন পেছন। টম আর রবিন দাঁড়িয়ে রইল আগের জায়গায়।
'ঘাড়টা মটকে দিতে ইচ্ছে করছিল,' একটা প্লেটে খাবার তুলে নিতে নিতে বলল মুসা, 'ফায়ারকে পচা বলে! কসম খোদার, ওর মত বাজে ছেলের সঙ্গে জীবনে দেখা হয়নি আমার। আমার মা কি করবে সেটাও নাকি সে জানে। স্রেফ ধাপ্পাবাজি! আমাকে তাক লাগানোর চেষ্টা।' খাবারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'নিচ্ছ না কেন?'
মাথা নাড়ল কিশোর, 'এখন না, পরে।...রবিনও কিছু জানে বলে মনে হলো। সে-ও নিশ্চয় ধাপ্পা দেয়নি। আন্টি হয়তো সারপ্রাইজটা কি হবে বলেছেন তাকে, সে বলে দিয়েছে টমকে। তবে একটা কথা ঠিক, টম ছেলেটাকে আমারও পছন্দ হচ্ছে না। কেমন যেন!'
'বিডকে জিজ্ঞেস করে দেখোগে, একই কথা বলবে...'
এই সময় কোলাহল ছাপিয়ে মিসেস আমানের কণ্ঠ শোনা গেল, 'ড্রইং-রুমে চলে আসুন সবাই; সামান্য আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'ওই যে,' মুসা বলল, 'মা'র জঘন্যতম সারপ্রাইজের আহ্বান।'

লম্বা, বড় ড্রইং-রুম। জানালায় ভারী পর্দা। ফ্রেঞ্চ উইনডো টাইপের বড় বড় জানালা দিয়ে পেছনের বিরাট বাগানটা দেখা যায়। ঘরের আসবাবগুলো সব একপাশে জড় করে রাখা হয়েছে। মাঝখানের খালি জায়গায় একদিকে মুখ করে বসানো হয়েছে সারি সারি চেয়ার।

দরজায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন। টমকে দেখা যাচ্ছে না।

মুসা আর কিশোরকে দেখে রবিন বলল, 'চলো সামনের সারিতে গিয়ে বসি। ভালমত দেখতে পারব।'

সামনের একটুখানি খোলা জায়গার পেছনে পর্দা টানানো। সামনে একটা টেবিলে রাখা নানা রকম জিনিস। তার পাশে মেঝেতে রাখা ট্রাংকের মত দেখতে একটা কালো বাক্স। বাক্সের গায়ে লেখা :

দি গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

'অ, ম্যাজিক শো,' মুসা আর রবিনের মাঝখানে বসে পড়ল কিশোর।

মেহমানরা সবাই বসল। কে একজন গিয়ে সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিল। পর্দার ওপরে একটা আলো জ্বলে রইল কেবল। গোল হয়ে আলো এসে পড়ছে মেঝেতে।

বুম করে বোমা ফাটার মত শব্দ হলো, তীব্র আলোর ঝলকানি, তারপর এক ঝলক লাল ধোঁয়া। পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল লম্বা একজন মানুষকে। পরনে কালো আলখেল্লা। মাথায় বাবরি চুল।

ইনিই তাহলে 'দি গ্রেট মিসটিরিয়োসো'—ভাবছে কিশোর।

'গুড ইভনিং, লেডিজ, জেন্টলমেন অ্যান্ড চিলড্রেন,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল লোকটা, 'আমার জাদুর ভুবনে স্বাগতম। প্রথমে আমার সহকারী সারালিন দ্য ক্লাউনের সঙ্গে পরিচিত হোন।'

আড়াল থেকে বেরিয়ে এল এক মহিলা। দর্শকদের দিকে ফিরে বাউ করল। পরনে লাল ট্রাউজার, তাতে কালো কালো ফুটকি। গায়ে রামধনু রঙের ব্রেইস। মুখে রবারের মুখোশ, ভাঁড়েরা যেসব পরে। পেছনে ফুলে-ফেঁপে রয়েছে সোনালি রঙের চুল। পরচুলা পরেছে।

'টমের আম্মা,' ফিসফিস করে মুসা আর কিশোরকে বলল রবিন।

'তুমি জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'গ্রেট মিসটিরিয়োসো হলেন টমের বাবা,' রবিন বলল। 'টম আমাকে বলেছে। চুপ করে দেখতে থাকো এখন।'

শো শুরু হলো। ভাঁড়ের মুখ থেকে টেনে টেনে একের পর এক রঙিন নিশান বের করল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। রুমালের ভেতর থেকে বোতল বের করল, আবার গায়েব করে দিল। কতগুলো লাল বল বের করে লোফালুফি করল ভাঁড়, তারপর ছুঁড়ে দিল গ্রেট মিসটিরিয়োসোর দিকে। তার হাতের তালুতে গিয়ে পড়তে লাগল বলগুলো, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়েব। তারপর নাক-মুখ-চোখ-কান, যেখান থেকে খুশি সেগুলো আবার বের করতে লাগল গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

অনেক ভেবেও বুঝতে পারল না মুসা, কি করে এটা করছে লোকটা। মনে মনে তার হাত সাফাইয়ের প্রশংসা না করে পারল না।

'এখন,' ঘোষণা করল গ্রেট মিসটিরিয়োসো, 'আমি দেখাব এক মজার খেলা। আপনাদের মধ্য থেকে একজন সাহসী লোক দরকার। কে আসবেন?'

এগিয়ে এসে রবিনের হাত চেপে ধরল ভাঁড়। টেনে নিয়ে গেল গ্রেট মিসটিরিয়োসোর কাছে।

'বাহ্, ভাল একজনকে নিয়ে এসেছ,' বলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'নাম কি তোমার, ব্রেভ বয়?'

'রবিন,' বলে কিশোর আর মুসার দিকে ফিরে চোখ টিপে হাসল সে।

কালো বাক্সের ডালা তুলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'দেখা যাক তোমার কত সাহস। ঢুকে পড়ো তো দেখি আমার জাদুর বাক্সের মধ্যে।'

বাক্সের ধার ডিঙিয়ে ভেতরে পা রাখল রবিন। বসে পড়ল উবু হয়ে। ডালা নামিয়ে, হুড়কো লাগিয়ে, তাতে তালা আটকে দিল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। চাবিটা দিল ভাঁড়ের হাতে। ভাঁড় সেটা পকেটে রেখে দিল। রাখতে দেখল সবাই।

বাক্সের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'এখন, আপনাদের চোখের সামনে আমি রবিনকে গায়েব করে দেব।'

আবার আলোর ঝিলিক, রঙিন ধোঁয়া। আগের মতই রয়েছে বাক্সটা। কোন পরিবর্তন নেই।

ভাঁড়ের দিকে হাত বাড়াল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'চাবিটা, প্লীজ।'

পকেটে হাত দিল ভাঁড়। বের করে আনল শূন্য হাত। চিৎকার করে উঠল, 'হায় হায়, নেই তো!'

'সর্বনাশ! কি বলছ! তালা খুলতে না পারলে দম আটকে মরবে ছেলেটা। এখনও গায়েব হয়নি।' হতাশ ভঙ্গিতে দর্শকদের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো, 'আজকাল যোগ্য লোকের বড় অভাব। ভাল একজন সহকারীও পাওয়া যায় না।'

বাক্সের সামনে গিয়ে দাঁড়াল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। দর্শকদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এই তালায় লাগার মত চাবি আছে কারও কাছে?'

সামনের সারিতে বসা দর্শকদের ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে মুসার ওপর এসে থামল তার দৃষ্টি। এগিয়ে এসে হাত চেপে ধরে টেনে তুলল তাকে। 'ইয়াং ম্যান, তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তালাটার চাবি আছে তোমার কাছে।'

'না না, নেই!' জোরে জোরে মাথা নাড়ল মুসা।

'কোন চাবি নেই?'

'কোন চাবি...আমাদের ঘরের চাবি আছে, কিন্তু...'

'নিয়ে এসো।'

দৌড়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে চাবির গোছা নিয়ে এল মুসা।

হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল ম্যাজিশিয়ান। একটা চাবি

বেছে বের করে রিঙ থেকে খুলে নিল সেটা। 'মনে হয় চলবে এতে।'

'এটা আমাদের সামনের দরজার চাবি। বাক্সের তালা খুলবে বলে তো মনে হয় না।'

'দেখা যাক, জাদুটাদু করে কিছু করা যায় কিনা,' চাবিটা ফিরিয়ে দিল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। 'যাও, তালায় ঢোকাও।'

বাক্সের সামনে বসে তালায় চাবি ঢোকাল মুসা। খাপে খাপে ঢুকে গেল মোচড় দিতেই খুলে গেল তালাটা।

'খাইছে!' ইলেকট্রিক শক খেয়ে যেন ছিটকে পিছিয়ে এল মুসা।

'খবরদার, হাত দেবে না ডালায়!' সাবধান করল ম্যাজিশিয়ান। 'হাত পুড়ে যাবে!' বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার ভান করল। ডালাটা একপাশ থেকে চেপে ধরে একটানে উঁচু করে ফেলল।

ভেতরে খালি।

রবিন নেই।

মুগ্ধ দর্শকদের তুমুল করতালি ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠল মুসা, 'বাক্সের পেছনে লুকিয়ে আছে ও!'

আলখেল্লার ঝুল দুলিয়ে চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। নিচু হয়ে পটাপট কতগুলো 'ক্যাচ' খুলে দিয়ে সরে দাঁড়াল। ধসে পড়ল বাক্সটা। পেছনেও কেউ নেই। ভেতরে থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ বাক্সটাই আর বাক্স নেই।

দর্শকদের করতালি আরও বেড়ে গেল।

মুসার হাত থেকে চাবি আর গোছাটা নিয়ে আবার আগের মত রিঙে ঢোকাল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। ফিরিয়ে দিল মুসাকে।

কিছুতেই পরাজয় মেনে নিতে পারল না মুসা। চিৎকার করে উঠল, 'পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে রবিনকে।'

'এত অবিশ্বাসী ছেলে তো জীবনে দেখিনি,' চোখ বড় বড় করে ফেলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো। দর্শকদের দিকে নজর রেখে বলল, 'সারালিন দ্য ক্লাউন দয়া করে এখানে এসো তো একবার।'

ফিরে তাকাল কিশোর। ভাঁড় যে ওখানে নেই, খেয়াল করেনি এতক্ষণ। ঘরের পেছন থেকে এগিয়ে এল সারালিন।

'পর্দা সরিয়ে দেখিয়ে দাও,' আদেশ দিল তাকে গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

টেনে পর্দা সরিয়ে দিল সারালিন। সোনালি চুল এক মহিলা বেরিয়ে এল পর্দার অন্যপাশ থেকে।

চোখ মিটমিট করতে লাগল মুসা। চোয়াল ঝুলে পড়ল।

'আমার স্ত্রী সারার সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি,' গ্রেট মিসটিরিয়োসো বলল। 'সারালিন দ্য ক্লাউনের আড়ালে কার মুখ লুকিয়ে আছে, তা-ও দেখাচ্ছি আপনাদের।...মুখোশ খোলো।'

মুখোশ খুলে ফেলল ভাঁড়। বেরিয়ে পড়ল রবিনের হাসি হাসি মুখ।

দর্শকদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়তে লাগল সে।

তিনজনে হাত ধরাধরি করে দর্শকদের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে বাউ করল।

নতুন করে করতালি আর উল্লসিত চিৎকার শুরু হলো।

হতাশ ভঙ্গিতে বসে পড়ল মুসা।

বেরিয়ে গেল তিন জাদুকর।

উঠে দাঁড়িয়ে মেহমানদের শান্ত হতে অনুরোধ করলেন মিসেস আমান। 'বাচ্চাদের জন্যে পার্টি গেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাশের ঘরে চলে যাও,' বললেন তিনি। 'বড়দের জন্যে মিউজিক। আসুন, নাচে যোগ দিন।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'কি বুঝলে?'

'কিছুই বুঝলাম না,' জবাব দিল মুসা। 'কিভাবে যে ঘটনাটা ঘটাল…তবে অন্য চাবি দিয়ে তালা খোলার রহস্যটা জানি। রিঙ থেকে খুলে নিয়ে যে চাবিটা আমার হাতে দিল, ওটা আমাদের চাবি নয়। দেখতে প্রায় এক রকম হলেও তফাৎটা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। আমাদের চাবিটা হাতের তালুতে লুকিয়ে রেখে অন্য একটা দিয়েছে, যেটা দিয়ে বাক্স খোলা যায়। তারপর আবার কায়দা করে ওদেরটা ফেরত নিয়ে আমাদেরটা দিয়ে দিয়েছে।'

আগ্রহী হয়ে উঠল কিশোর, 'কি করে বুঝলে?'

হাসল মুসা। 'বুঝলাম, ওটাতে আমার নামের আদ্যক্ষরটা আঁচড় কেটে লিখে দিয়েছিলাম–এম। নজরে পড়েনি।' চাবির গোছা বের করে দেখাল মুসা। 'এই দেখো। টিন ওপেনারের চোখা মাথা দিয়ে লিখেছি। তখনই ফাঁস করে দিতে পারতাম, কিন্তু মা'র শো'টা পণ্ড করতে চাইনি।'

'দেয়া উচিত ছিল। ফাঁস হত না, সেটা বরং বেশি মজার হত। গ্রেট মিসটিরিয়োসোর কাঁচুমাচু মুখ দেখে অনেক বেশি মজা পেত দর্শকরা।'

'কিন্তু এখন আর হবে না, সুযোগটা হারিয়েছি,' উঠে দাঁড়াল মুসা। 'সবার খেয়াল এখন নাচের দিকে। বুফে টেবিলের কাছে কেউ নেই। এই সুযোগটা আর হারাতে চাই না। সময় থাকতে থাকতে আরেক প্লেট সাবাড় করে ফেলি। যাবে?'

টেবিলের কাছে কেউ নেই বললেও বিডকে দেখা গেল দাঁড়িয়ে আছে। ওদের দেখে বলল, 'খিদে পেয়েছে। ওখানে হট্টগোলের মধ্যে থাকতেও ভাল লাগছিল না।'

'শুরু করে দাও,' মুসা বলল। 'সবাই এসে গেলে হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। একটা টুকরোও আর মুখে দিতে পারবে না।'

প্লেটে খাবার নিতে নিতে বিড বলল, 'কিন্তু রবিনের ব্যাপারটা কি বলো তো? জুবের পরিবারের সঙ্গে বেশ খাতির জমিয়ে ফেলেছে। বিকেল থেকে টমের সঙ্গে ছিল। তোমাদের চেয়ে বড় বন্ধু হয়ে গেছে টম এখন ওর।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে বিডের দিকে তাকাল কিশোর। জবাব দিল না।

মুসা বলল, 'আমার অবাক লাগছে। সত্যি সত্যি জাদু শিখে গেছে ও। বাক্স থেকে পালাল কি করে?'

'জানলে তো আমিও ম্যাজিশিয়ান হয়ে যেতাম,' বিড বলল। 'তবে খুবই

সহজ কোন উপায়ে পালিয়েছে, সন্দেহ নেই।'

চুপচাপ খেতে থাকল তিনজনে।

খাওয়া শেষ হলে বিড বলল, 'আমার বড্ড মাথা ধরেছে। আর থাকতে পারছি না। মুসা, কিছু মনে কোরো না, ভাই, আমি যাচ্ছি। আন্টিকে বোলো।'

'ট্যাবলেট আছে। এনে দেব?'

'না, লাগবে না, থ্যাংক ইউ। বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকব।'

দরজার দিকে এগোল বিড।

আগের ঘরে ফিরে এল কিশোর আর মুসা। বড়রা নাচছে। একধারে টমের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে রবিন।

'রবিনকে জাদু করে ফেলল নাকি ছেলেটা!' না বলে পারল না আর মুসা।

'কাল জিজ্ঞেস করব রবিনকে,' কিশোর বলল। 'কি করে বাক্স থেকে পালাল ও, সেটাও জেনে নেব।'

'যদি না বলে? জাদুকরের "সিক্রেট" বলে এড়িয়ে যেতে চায়? হয়তো শেখানোর আগে কাউকে না বলার জন্যে তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে গ্রেট মিসটিরিয়োসো। শুনেছি, ম্যাজিশিয়ানরা তাই করে।'

পাঁচ

'আরে বলো না। বলে ফেলো। কিছু হবে না,' কিশোর বলল।

পরদিন সকালে ক্লাসরুমে কথা বলছে ওরা। ফেসটিভ্যাল মীটিং শুরু হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

মাথা নাড়ল রবিন, 'না, ভাই, আমি গোপন রাখব প্রতিজ্ঞা করেছি ওদের কাছে। কাউকে বলা যাবে না।'

'কিন্তু "কাউকে"র মধ্যে পড়ি না আমরা,' মুসা বলল। 'তিন গোয়েন্দা–মানে তিনজন মিলে একজন, তাই তো? কারও কথা কারও কাছে গোপন রাখি না আমরা। তোমার মনে থাকা আর আমাদের মনে থাকা একই কথা। অন্য কাউকেই বলতে যাচ্ছি না আমরা।'

হেসে ফেলল রবিন, 'আহা, কি যুক্তি। ঠিক আছে, টেনশনে রেখে লাভ নেই তোমাদের–বলেই ফেলি। কিশোরকে নিয়ে চিন্তা নেই, ও কাউকে বলবে না; কিন্তু তুমি সাবধান থাকবে। পেট থেকে যেন কোনমতেই না বেরোয়।'

'নিশ্চিন্তে বলে ফেলো।'

'বাক্সের পেছনে একটা ফোকর আছে, ঝাঁপ লাগানো। সহজে বোঝা যায় না। ধোঁয়ার মধ্যে গা আড়াল করে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম আমি। তারপর জানালা দিয়ে সোজা বাগানে। দর্শকদের অলক্ষে টমের মা-ও বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁর ভাঁড়ের পোশাকটা আমি পরে নিলাম। তিনি তখন জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়লেন। একেবারেই

সহজ, তাই না?'

'জানালার তো ছিটকানি লাগানো থাকে,' মুসা বলল। 'সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে খুললে কি করে?'

'আগেই খুলে রাখা হয়েছিল। আমি শুধু পাল্লাটা ঠেলে ফাঁক করে বাগানে নেমে গিয়েছিলাম।'

'বিড ঠিকই বলেছিল–সহজ কোন উপায়ে কাজটা সারা হয়েছে। তাই তো দেখছি এখন।'

'কাল নাচের সময় দেখলাম না ওকে। কোথায় ছিল?'

'মাথা ধরেছিল। খেয়েই বাড়ি চলে গিয়েছিল। টমের সঙ্গে তোমার মাখামাখিটা ওর নজরেও পড়েছে।'

হঠাৎ রেগে গেল রবিন, 'নজরে পড়ল তো কি হয়েছে? ও কি আমার মালিক নাকি? কার সঙ্গে মাখামাখি করব না করব, সেটা আমার ব্যাপার। ওকে জিজ্ঞেস করে করতে হবে নাকি?'

'খামাখা রাগছ। ও কিন্তু তেমন করে বলেনি...'

আর কিছু বলার সুযোগ হলো না। ফেসটিভ্যালের বাকি সদস্যরা ঘরে ঢুকতে শুরু করল।

মিস ওয়াভার গিয়ে তাঁর গতদিনের আসনটায় উঠে বসলেন। টেবিলের ওপর। সরাসরি কাজের কথায় এলেন, 'শোনো সবাই, আজকে যার যার কাজ ভাগ করে দিয়ে তবেই বেরোব। সময় কম। কাজ অনেক। আলোচনা সংক্ষেপ করা দরকার।'

প্রচুর হই-হট্টগোল, তর্কাতর্কির পর অবশেষে যার যার কাজ ভাগ করে দিলেন মিস ওয়াভার। মুসা আর কিশোরের ওপর পড়ল ফ্লোট বানানোর দায়িত্ব। ওদের সাহায্য করবে উডওয়ার্ক আর আর্ট ডিপার্টমেন্ট। ফাইনাল সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, রবিনই সাজবে কারনিভল কুইন।

মীটিং শেষে মিস ওয়াভারকে বলল রবিন, 'রানীর কাজটা কি হবে, মোটামুটি একটা ধারণা পেয়েছি কিশোরের কাছে। ভাবছি, টমের বাবার সঙ্গে কথা বলব। ম্যাজিশিয়ান তো, নতুন কোন আইডিয়া দিতে পারবেন। রানী প্লাস ম্যাজিক–ভাল হবে, কি বলেন?'

'হ্যাঁ, চমৎকার হবে,' মাথা ঝাঁকালেন মিস ওয়াভার, 'দেখো কথা বলে।'

ক্লাসের বাইরে রবিনকে পাকড়াও করল মুসা। 'ম্যাজিশিয়ান নতুন কি আইডিয়া দেবে? রানীর হ্যাটের নিচ থেকে জ্যান্ত কবুতর আর খরগোশ বের করার প্ল্যান করেছ নাকি? রানীর আর ইজ্জত থাকবে না তাহলে।'

'না থাকার কি হলো? ম্যাজিক ম্যাজিকই। যে কোন ক্ষমতা অর্জন করা মানেই বাড়তি গুণের পরিচয়। ফ্লোটের ওপর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থেকে শুধু হাত নাড়ার চেয়ে অনেক ভাল। টমকেও বলতে পারি সাহায্য করার জন্যে। মিস ওয়াভার যখন রাজি হয়েছেন, এটা নিয়ে আর তর্কাতর্কির কিছু নেই।'

'জাদু করে ওই টম ছোঁড়াটাকে যদি চিরকালের জন্যে গায়েব করে দেয়া যেত, সবচেয়ে ভাল হত।'

ভ্রূকুটি করল রবিন। 'ওর বিরুদ্ধে এত আক্রোশ কেন তোমার? দেখতেই পারো না।'

'দেখার মত চরিত্র হলে তো দেখতে পারব। ওর বাগাড়ম্বর আমার একেবারে সহ্য হয় না।'

'কথা একটু বেশি বলে বটে, তবে ছেলে ও খারাপ না। মিশলেই বুঝতে। চলি। পরে কথা হবে।'

করিডর ধরে দ্রুত হেঁটে গেল রবিন।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'শুনলে কি বলল? ছেলে নাকি খারাপ না।'

'হতেও পারে।'

চোখ গোল গোল করে ফেলল মুসা, 'তুমিও বলছ! ও একটা শয়তান! রবিন বিশ্বাস করুক আর না করুক।'

মুখে যাই বলুক, মনে মনে দুশ্চিন্তা কিশোরেরও হচ্ছে। চিন্তিত ভঙ্গিতে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল। তার আশঙ্কা হচ্ছে, ওদের তিনজনের বন্ধুত্বে মস্ত এক ফাটল ধরাতে যাচ্ছে টম ছেলেটা।

ছয়

পরদিন সকালে ডাকবাক্স থেকে একগাদা চিঠি বের করে এনে নাস্তার টেবিলে বসলেন রাশেদ পাশা। একটা লীফলেটও পেয়েছেন ডোরম্যাটের নিচে।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কাগজটার দিকে চোখ পড়তে দাঁড়িয়ে গেলেন মেরিচাচী। পড়লেন, 'ফেইথ হীলার সারালিন জুবেরের চ্যালেঞ্জ। শুধু বিশ্বাস আর মনের জোরে কত জটিল রোগ সারানো সম্ভব, নিজের চোখে এসে দেখুন।' লেখার বাকি অংশটা নীরবে পড়ে হাসলেন তিনি। 'বাহ্, টাউন হলে আবার পাবলিক মীটিঙেরও ব্যবস্থা করেছে দেখা যাচ্ছে আজ রাতে।'

টেবিলে বসে খাচ্ছে তাঁর বোনের ছেলে ডন। 'ফেইথ হীলার জিনিসটা কি?'

'জিনিস নয়। ফেইথ হীলিং–একটা ক্ষমতা। যারা সেটা অর্জন করে, তাদের বলে ফেইথ হীলার। এরা দাবি করে, ওষুধ ছাড়াই যে কোন রোগ সারিয়ে দিতে পারে। যত্তসব ফালতু কথা।'

চাচার কাঁধের ওপর দিয়ে লীফলেটটার দিকে তাকাল কিশোর। চাচীর দিকে ফিরল। 'বিশ্বাস করো না তুমি?'

'না, একেবারেই না। রীতিমত ঠগবাজি। যত বুলিই ঝাড়ুক, সত্যিকারের অসুস্থ কোন মানুষের রোগ সারানোর ক্ষমতা নেই এই সারালিন জুবেরের।'

চাচার হাত থেকে লীফলেটটা নিল কিশোর। 'সারালিনের ছেলে টম আমাদের স্কুলে নতুন ভর্তি হয়েছে।'

টম আর তার বাবা-মা'র সম্পর্কে যতটুকু জেনেছে, চাচা-চাচীকে জানাল

সে।

কিশোর যখন কথা বলছে, তার হাত থেকে লীফলেটটা নিয়ে সেটা দিয়ে অ্যারোপ্লেন বানাতে শুরু করল ডন।

'আরে আমি পড়িনি তো,' কাগজটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

হাত সরিয়ে নিল ডন। দিল না।

'আহ্, কি শুরু করলি!' ধমক দিলেন মেরিচাচী। 'নাস্তার টেবিলেও ঝগড়া। বনাবনতি কি কোনদিন হবে না তোদের? এই ডন, দে কাগজটা। স্কুলের ব্যাগ গোছাগে জলদি। দেরি হয়ে যাবে।'

ডনের বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক বড় বিজ্ঞানী। অ্যারিজোনায় বাড়ি। বেশ কিছুদিনের জন্যে ডনের বাবা-মা বিশেষ কাজে দেশের বাইরে চলে যাওয়ার সময় ডনকে রেখে গেছেন রকি বীচে। খালি খালি বসে থাকবে বাড়িতে, তাই কিশোরদের স্কুলেই ভর্তি করে দিয়েছেন মেরিচাচী।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা কিশোরকে দিয়ে উঠে গেল ডন।

সেদিন স্কুলে এসে কিশোর জানতে পারল, ওরকম বহু লীফলেট বিলি করা হয়েছে শহরে।

'মহিলা একটা ঠগ,' মুসা বলল, 'বাজি রেখে বলতে পারি।'

'চাচীও তাই বলল। তবু নিজের চোখে দেখতে চাই আমি ব্যাপারটা।'

'অন্যেরটা দেখে কিছু বোঝা যাবে না, প্রমাণ করতে হবে। তোমার কোন জটিল রোগ আছে?'

'নেই।...রবিন কোথায়? যাবে কিনা জিজ্ঞেস করতাম ওকে।'

'আর যা-ই বলো না বলো, টমদের সম্পর্কে কিছু বলতে যেয়ো না। আমার ধারণা, তোমার কথাও সহ্য করবে না এখন ও। কেমন যেন হয়ে গেল রবিনটা!'

টাউন হলে দু'শো লোক বসার ব্যবস্থা আছে। কিশোর আর মুসা যখন ঢুকল, অর্ধেকের বেশি ভরে গেছে।

কিশোরের কানে কানে ফিসফিস করে বলল মুসা, 'কি মনে হয়, এরা সবাই জটিল রোগের রোগী?'

'বলা মুশকিল,' চেয়ারে বসা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। কিন্তু মুখ দেখে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব না।

মঞ্চে লোক নেই। আছে একটা মাইক্রোফোন স্ট্যান্ড। উঁচু একটা টুল রাখা হয়েছে ওটার পেছনে।

দরজা দিয়ে অনবরত লোক ঢুকছে। দেখতে দেখতে ভরে গেল হলটা।

'সবাই ওরা রোগী,' মুসা বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।'

কিশোর জবাব দেবার আগেই হলের সব আলো নিভে গেল। তেরছাভাবে একটা বৃত্তাকার আলো এসে পড়ল স্ট্যান্ড আর টুলের ওপর।

ধীরে সুস্থে হেঁটে গিয়ে মঞ্চে উঠল সারালিন। টুলটায় বসল।

'সবার শুভকামনা করছি,' নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল সে। 'আমার নাম সারালিন জুবের। আজ রাতে মনে রাখার মত কিছু ঘটনা দেখতে পাবেন আপনারা। দেখবেন, কিভাবে শুধু বিশ্বাসের জোরে বহু বছরের পুরানো রোগ, রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে ভাল হয়ে ওঠে রোগী। আমি বলব না আমি কোন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, মানুষের মনে সুপ্ত প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তোলার উপায় আমি শিখেছি।'

'সুপ্ত ইচ্ছাশক্তি বলতে কি বোঝাতে চাইছে ও?' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'রোগীকে সুপার হিরোটিরো গোছের কিছু বানিয়ে দেবে নাকি?'

'চুপ করো! শুনি!'

টুল থেকে উঠে এসে মঞ্চের কিনারে দাঁড়াল সারালিন। সামনের সারির দিকে আঙুল তুলল, 'ম্যাডাম, আপনি। দেখেই বুঝতে পারছি বেদনা-রোগ আপনার। সারাতে চান?'

বকের মত গলা লম্বা করে কেউ, কেউ মোরগের মত গলা বাঁকিয়ে দেখতে চাইল কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে সারালিন। চেয়ার থেকে উঠে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মঞ্চের দিকে এগোল এক মাঝবয়েসী মহিলা। মঞ্চের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

ডান হাতটা লম্বা করে মহিলার মাথায় রাখল সারালিন। 'অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেছেন আপনি। আপনার মনের ইচ্ছাশক্তি জেগে উঠুক। শক্তি জোগাক আপনাকে। দূর করে দিক যত অশান্তি।'

পিনপতন নীরবতা।

'গেছে ব্যথাটা?' জানতে চাইল সারালিন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ!' শোনা গেল বিস্মিত জবাব। হাসি ফুটেছে মহিলার মুখে। 'একেবারে চলে গেছে!'

দর্শকদের দিকে তাকাল সারালিন। হাত নেড়ে বলল, 'বিশ্বাসের ক্ষমতা নিজের চোখে দেখলেন আপনারা।'

'ওই মহিলার নাম মিসেস বুগার্ট, চ্যারিটি শপের মালিক,' মুসা বলল, 'বহুদিন থেকে চিনি। সারা বছরই ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়। হেন রোগ নেই, যা ওর শরীরে নেই। যেটার কথাই জিজ্ঞেস করো, বলবে, আছে। আমার ধারণা, ওর শরীরে কোন রোগই নেই। সব মানসিক।'

একের পর এক রোগী উঠে যেতে লাগল মঞ্চের কাছে। মাথায় হাতের তালু চেপে ধরে ওদের চিকিৎসা করতে লাগল সারালিন।

হঠাৎ বলে উঠল সে, 'এখানে একজন অবিশ্বাসী রয়েছে। টের পাচ্ছি আমি।'

ফিসফিস করে কিশোর বলল মুসাকে, 'তোমার কথা বলছে!'

'কেন, তুমি কি বিশ্বাসী নাকি?'

'সে একজন পুরুষ মানুষ,' সারালিন বলছে। 'সারা দেহে তার তীব্র ব্যথা, ভয়ানক যন্ত্রণা।' দুই হাত সামনে বাড়িয়ে দিল সে। 'প্লীজ, আস্থা রাখুন। চলে আসুন এখানে।'

কয়েক সেকেন্ড কিছু ঘটল না। তারপর যেন গুঞ্জনের একটা ঢেউ খেলে গেল দর্শকদের মাঝে, যখন একজন লোক উঠে এগোতে শুরু করল মঞ্চের দিকে। পা টেনে টেনে চলেছে সে। হাঁটতেও যেন কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্টে এক এক করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল সে। মঞ্চে উঠে একেবারে সারালিনের কাছে চলে যেতে চায়।

তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল সারালিন। ধরে ধরে নিয়ে এল মঞ্চের মাঝখানে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না।

'আপনার রোগ আমি সারিয়ে দেব,' সারালিন বলল। 'বহুকাল ধরে কষ্ট পাচ্ছেন বাতের ব্যথায়।'

'হ্যাঁ,' বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা দোলাল লোকটা। 'কত ডাক্তার দেখিয়েছি, কত ওষুধ খেয়েছি, কোন কাজ হয়নি।'

ওর মাথায় হাত রাখল সারালিন। 'আমি বলছি, আপনি ভাল হয়ে যাবেন!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল দুই গোয়েন্দা, ধীরে ধীরে পিঠ সোজা হয়ে যাচ্ছে লোকটার। হাসি ফুটছে মুখে।

'এবার হয়েছে বিশ্বাস?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল সারালিন।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ! হয়েছে! হয়েছে!'

'আপনার মনের জোরই আপনার রোগ সারিয়ে দিয়েছে। আর কোনদিন ভুগতে হবে না।'

হাত টানটান করল লোকটা, পা ঝাড়া দিল। 'একদম ব্যথা নেই!' মঞ্চের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সিঁড়ি টপকে নেমে এল। চেঁচিয়ে বলতে লাগল। 'সেরে গেছে! একদম ভাল হয়ে গেছি!'

বিস্মিত গুঞ্জন উঠল দর্শকদের মাঝে। শুরু হলো হাততালি।

শেষ হলো মীটিং।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'কি বুঝলে?'

মাথা নাড়তে নাড়তে বিড়বিড় করল মুসা, 'কিছুই না!'

দরজার দিকে এগোল দু'জনে। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন পুলিশ অফিসার। লোকজনকে বেরোতে দেখে চিৎকার করে বলল একজন, 'আপনারা একটু দাঁড়াবেন, প্লীজ?'

জনতার গুঞ্জন থেমে গেল।

আবার বলল অফিসার, 'আপনাদের মধ্যে মিসেস হবলগিন কোনজন?'

সম্ভ্রান্ত চেহারার মাঝবয়েসী এক ভদ্রমহিলা এগিয়ে গেলেন। 'আমি। কেন?'

'আমাদের সঙ্গে আসবেন একটু?' বিনীত স্বরে বলল পুলিশ অফিসার, 'একটা দুঃসংবাদ আছে। আপনার বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে।'

পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। পেছনে জনতার চাপ। ক্রমাগত ঠেলা দিচ্ছে।

'এই মহিলার বাড়িও আমাদের পাড়ায়,' কোনমতে বলল মুসা। 'ডাকাতগুলো সব গিয়ে যেন আমাদের বাড়ির কাছেই আড্ডা গেড়েছে!'

সাত

পরদিন নাস্তার টেবিলে বসে দ্রুত হোমওঅর্ক শেষ করছে ডন। ফ্লোটের একটা নকশা করেছে কিশোর। মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখছেন রাশেদ পাশা।

খবরের কাগজ হাতে ঘরে ঢুকলেন মেরিচাচী। 'এই দেখো, সামনের পাতায়ই লিখেছে। এটা নিয়ে ক'টা হলো?...চার, নাকি পাঁচটা?' স্বামীর দিকে তাকালেন তিনি। 'শোনো, জানালাগুলোতেও তালা লাগানোর ব্যবস্থা করো।'

'কিসের কথা বলছ?' নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলেন রাশেদ পাশা।

'চুরি, চুরি। সমানে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে।' কিশোরের দিকে তাকালেন মেরিচাচী, 'মুসাদের ওদিকটাতেই বেশি।'

'জানি,' চাচীর দিকে মুখ তুলে তাকাল কিশোর। 'কি লিখেছে পত্রিকায়? পুলিশ কোন সূত্রটুত্র পেয়েছে?'

'সেই একই ব্যাপার। নিচতলার একটা জানালার কাঁচ ভেঙে ছিটকানি খুলেছে–তালা লাগাতে বলছি এ কারণেই...ঘরগুলোকে তছনছ করেছে। জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করেছে। বহুক্ষণ ছিল বোঝা যায়। দামী জিনিস খোঁজাখুঁজি করেছে।' পত্রিকাটা টেবিলে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। 'বাড়িতে কেউ ছিল না বলেই বোধহয় সাবধান হবার প্রয়োজন বোধ করেনি চোর।'

'বাড়ির মালিকের নাম লিখেছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'মিসেস হবলগিন।'

'অ, কাল রাতেই শুনেছি। তিনি ছিলেন তখন টাউন হলে, ফেইথ হীলিং মীটিঙে,' কিশোর বলল। 'মীটিং শেষ হলে পুলিশ এসে খবর দিল তাঁর বাড়িতে চুরি হয়েছে।'

'ফেইথ হীলিঙের সঙ্গে সঙ্গে যদি গণনাও জানত সারালিন, ভাল হত। চুরি যে হচ্ছে, এটা জানাতে পারত। গুণেটুনে হয়তো চোরের নামও বলে দিতে পারত।' স্যুট জ্যাকেটটা গায়ে চড়ালেন মেরিচাচী। 'আজকাল ফেইথ হীলারের চেয়ে জ্যোতিষ আর গণকদের ইনকাম অনেক বেশি।'

'সারালিন কিন্তু রোগ সারানোর জন্যে টাকা চায়নি কারও কাছে।'

হাসলেন চাচী। মাথা দুলিয়ে বললেন, 'চাইবে, চাইবে। পাবলিক মীটিং করে ক্ষমতা দেখিয়ে প্রথমে তাক লাগিয়ে দিল। অপেক্ষা কর্। খুব শীঘ্রি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেখতে পাবি–রোগ সারানোর জন্যে প্রাইভেট চেম্বারে যোগাযোগ করার অনুরোধ।' দরজার দিকে এগোলেন তিনি। বেরোনোর আগে ফিরে তাকিয়ে রাশেদ পাশাকে মনে করিয়ে দিলেন, 'জানালায় তালাগুলো লাগিয়ে ফেলো কিন্তু।'

'আচ্ছা,' জবাব দিলেন রাশেদ পাশা।

বাইরে থেকে পাল্লাটা লাগিয়ে দিলেন মেরিচাচী।

আবার নকশার দিকে চোখ ফেরালেন রাশেদ পাশা।

'কিছু কিছু আইডিয়া তো বেশ অ্যাডভেঞ্চারাস মনে হচ্ছে,' কিশোরকে বললেন তিনি। 'এই যেমন, ফ্লোটটাকে জাহাজের আকৃতিতে বানানোর ব্যাপারটা। কিংবা দুর্গের মত, তার আবার টারিটও থাকতে হবে। আরও সহজ কিছু ভেবে বের করতে পারিস না?'

'যেমন?'

'একটা গ্যালাকটিক ব্যাটলশিপ,' ফোড়ন কাটল ডন, 'ক্রমাগত সেটা থেকে গোলা বর্ষণ করতে থাকবে লেজার আর সনিক ক্যাননগুলো।...আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করা উচিত তোমার, কিশোরভাই। কি সব কারনিভ্ল কুইন-টুইনের প্রাগৈতিহাসিক চিন্তা তোমাদের। তারচেয়ে রবিনভাইকে মহাকাশের যুদ্ধবাজ রাজার পোশাক পরিয়ে দাওগে। ভাল লাগবে। কি করলে আরও ভাল হবে, কিছু আইডিয়া দিতে পারি আমি।'

'অনেক ধন্যবাদ,' মুখ বাঁকাল কিশোর, 'তোমার সাহায্য ছাড়াই পারব আমরা।' চাচার দিকে তাকাল সে। 'ফ্লোটটা কোন্ ভাবে বানালে ভাল হয়, তুমি কোন পরামর্শ দিতে পারো?'

'একটা কাজ করা যায়। পুরানো ধাঁচে করতে চাইছিস তো, তারমধ্যে রবিন যেহেতু আবার ম্যাজিকের ওপর জোর দিয়েছে–ফ্লোটটাকে ম্যাজিক্যাল ওয়ার্ল্ড বানিয়ে ফেললেই তো হয়। পরীর রাজ্য। হার্ডবোর্ড আর রঙিন কাগজ দিয়েই সেটা বানানো সম্ভব। রবিনের পোশাকটা হবে ঝলমলে রঙের, তাতে বড় বড় ফুল আঁকা থাকবে।'

'দূর!' হাত উল্টে সব ঝেড়ে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করল যেন ডন। 'কি সব চিন্তাভাবনা!'

ওর কথায় কান না দিয়ে চাচাকে বলল কিশোর, 'ঠিক বলেছ।' হাসি ফুটল মুখে। 'চমৎকার আইডিয়া। এক্ষুণি জানানো দরকার মুসাকে।'

*

'সত্যিই দারুণ!' মুসাও স্বীকার করল। 'আমরা যা ভেবেছিলাম, তারচেয়ে ভাল। আঙ্কেল কি বললেন, সময়মত বানানো শেষ করা যাবে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'চাচা বলল কোন সমস্যা হবে না। হার্ডবোর্ডের গাছ। কাগজের পাতা, ফুল। সবুজ তেরপলে ফুল এঁকে সেটা বিছিয়ে দেয়া হবে ফ্লোটের মেঝেতে। স্কুলের ক্র্যাফ্ট্স ডিপার্টমেন্ট এ সব জিনিস সাপ্লাই করতে পারবে। বানালে দারুণ হবে।'

লাঞ্চের সময় উডওঅর্ক স্টুডিওতে গিয়ে ওখানকার ইন-চার্জ মিস্টার রডরিগের সঙ্গে দেখা করল দু'জনে। ওদের পরিকল্পনার কথা জানাল। তারপর গেল আর্ট ডিপার্টমেন্টে মিস্টার উইলিয়ামসের সঙ্গে কথা বলতে। ফ্লোটের ডেকোরেশন নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করল।

ক্যানটিনে ফিরে আসছে দু'জনে, এই সময় দেখল ডনকে। দুই হাত পকেটে। তীব্র ভ্রূকুটিতে বিকৃত হয়ে আছে চেহারা।

'কি হয়েছে তোমার?' জানতে চাইল কিশোর।

'তোমাদের ওই স্টুপিড ফেসটিভ্যাল! আমার বিশ্বাস, এটার জন্যেও তোমরা দায়ী। তোমরাই পরামর্শ দিয়েছ।'

'কোনটার?'

'স্কুলের তরফ থেকে একটা স্টল খোলা হবে। তাতে দান-খয়রাতের জিনিস বিক্রি হবে। টাউন হলের বাইরে যেখানে গিয়ে শেষ হবে মিছিলের যাত্রা, সেখানে খোলা হবে স্টল।' গুঙিয়ে উঠল ডন। 'আমাকে বাছাই করা হয়েছে বিক্রেতাদের সাহায্য করার জন্যে। সারাক্ষণ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা আর জিনিসপত্র এগিয়ে দেয়া...এই জঘন্য কাজ করতে কারও ভাল লাগে? স্যারকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম, চ্যারিটি শপের চেয়ে বরং একটা চ্যারিটি ফুটবল ম্যাচের ব্যবস্থা করা হোক। কিছুতেই শুনলেন না।'

হাসি চেপে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'এখন তোমাকে কি করতে বলা হয়েছে?'

'এখন কিছু না। স্কুল ছুটির পর দেখা করতে বলেছেন। নিশ্চয় স্টুপিডের মত আবার কোন পরামর্শ দিতে থাকবেন। শুনলাম, দোকানে বিক্রির জন্যে প্লাস্টার অভ প্যারিসের জিনিস বানাতে বলবেন। কি করে বানাতে হয়, শিখিয়ে দেবেন।'

'আমাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমি বা মুসা এ সবের কিছু জানি না। কিন্তু প্লাস্টার অভ প্যারিস দিয়ে জিনিস বানানোর কাজটা তো আকর্ষণীয়ই মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

'হতে পারে, তোমাকে ভিনগ্রহবাসীদের প্রতিকৃতি বানাতেই বলে দেবেন স্যার,' মুসা বলল।

'ইয়ার্কি মারছ!' মুসার মুখের দিকে তাকিয়ে ইয়ার্কি মারার কোন লক্ষণ না দেখে উজ্জ্বল হলো ডনের মুখ। 'তোমার কি সেরকমই মনে হচ্ছে? ভিনগ্রহবাসী বানাতে বলবেন?'

'অসুবিধে কি? তুমিও তো স্যারকে পরামর্শ দিতে পারো,' কিশোর বলল।

'হ্যাঁ, তা পারি!' ভ্রূকুটি দূর হয়ে গেল ডনের। বোধহয় মহাকাশবাসী বুদ্ধিমান জীব আর দানবের উদ্ভট চেহারা কল্পনা করতে করতেই সরে গেল ওখান থেকে।

'রবিনের সঙ্গে দেখা হয়েছে আজ?' ক্যানটিনে চেয়ারে বসতে বসতে মুসাকে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'হয়েছে। তবে বিশেষ কথা হয়নি। টমের সঙ্গে ম্যাজিক নিয়ে আলাপ করছিল। উৎসবে দেখানোর জন্যেই মনে হয়।'

'টমকে বলেছ কাল রাতে টাউন হলে ওর মায়ের ডাক্তারি দেখতে গিয়েছিলাম আমরা?'

'সুযোগ পাইনি।'

'হুঁ। রাতে কিছু ভেবেছ এ নিয়ে?' মুসার জবাবের অপেক্ষায় না থেকে কিশোর বলল, 'আমি শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবলাম। কিছু বুঝতে পারলাম না।

তোমার কি ধারণা? এ ভাবে সত্যি সত্যি রোগ সারানো সম্ভব?'

'ঘাপলা-টাপলা কিছু আছে বলে তো বুঝলাম না। কিন্তু না বুঝলেই যে ব্যাপারটা সত্যি হবে তারও কোন মানে নেই। আমি আশা করেছিলাম, ডাইনীর পোশাক পরে, কিংবা ঢোলা আলখেল্লা আর মানুষের হাড় হাতে হাজির হবে সারালিন।...কিভাবে কি করেছে তুমিই যখন ধরতে পারোনি, আমি কি করে পারব?' চিন্তিত ভঙ্গিতে রোল-এ কামড় বসাল মুসা। 'এক কাজ করা যেতে পারে। ওদের দোকানটায় গিয়ে তল্লাশি চালিয়ে আসা যায়। কোন সূত্র মিলে যেতে পারে।'

'আমিও এ কথাটাই ভাবছি। দোকানটা চেনো?'

'দোকান চিনি না, তবে কোন্ জায়গাটায় আছে অনুমান করতে পারছি। ম্যানার স্ট্রীটের শেষ মাথায় গির্জাটার কাছে। বেশ কয়েকটা অ্যানটিক শপ আছে না, ওখানটায়। চিনে নিতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। আজ স্কুল ছুটির পরেই যাওয়া যায়, কি বলো?'

'হ্যাঁ, যায়,' কিশোর বলল।

'টম ছোঁড়াটাকে যেমন পছন্দ হয়নি আমার, ওর মা'টাকেও না। চিটিংবাজিটা ফাঁস করে দিতে পারলে ভাল হত।'

'দেখা যাক কি করা যায়।'

আট

গির্জার আশেপাশের এলাকাটা কিশোরের খুব পছন্দ। এখানে ঢুকলেই মনে হয় এক লাফে বর্তমান যুগ পেরিয়ে কয়েকশো বছর আগেকার ভিক্টোরিয়ান যুগে গিয়ে প্রবেশ করেছে।

ম্যানার স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলল দুই গোয়েন্দা। লম্বা, সরু সরু বাড়িগুলোর মাঝে প্রচুর গলিপথ, ছায়ায় ঢাকা, অন্ধকার।

'এই যে এটাই হবে,' একটা ছোট দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। বোতলের কাঁচের মত দুটো সবজে রঙের জানালার মাঝের দরজার ওপরে লেখা রয়েছে

দি জুবের'স ওয়ে

'এঁহ্, জুবের'স ওয়ে!' নাক কুঁচকাল মুসা। 'রাখা উচিত ছিল আসলে চিট'স ওয়ে।'

'ওদের ওপর সাংঘাতিক খেপে আছ তুমি,' মুচকি হাসল কিশোর। 'এসো।'

দরজার গায়ে একটা ছোট সাইনবোর্ড লাগানো। তাতে লেখা:

দোকানের মালিকানা বদল হয়েছে।
ক্রেতাসাধারণকে স্বাগতম।

জানালার কাঁচের ভেতর দিয়ে উঁকি দিল কিশোর। একধারে নানা রকম বোতল, বয়াম আর শুকনো শেকড়-বাকড়-ফুল রাখা। আরেক পাশে ডাইনী আর কল্পিত দানবের অনেকগুলো মুখোশ এবং বেশ কতগুলো বাক্স। নিশ্চয় ম্যাজিক দেখানোর সরঞ্জাম রয়েছে ওগুলোতে।

'দোকানটা দেখে মনে হচ্ছে চার্লস ডিকেন্সের দা ওল্ড কিউরিওসিটি শপ,' বিড়বিড় করল কিশোর।

'বোঝার মত কিছু বলো,' হাত তুলল মুসা। 'তুমি জানো, আমি ডিকেন্স পড়িনি।'

হাসল কিশোর। 'টেলিভিশন তো দেখো। কাহিনীটা নিয়ে সিরিয়াল করেছে। তাতে লিটল নেল নামে একটা মেয়ে...'

'থাক, থাক, গল্প শোনার ধৈর্য নেই এখন,' বাধা দিল মুসা। 'লেকচার শুরু করলে আর তো থামতে চাইবে না। এখানে রাত কাটাতে আসিনি আমরা। যা দেখার দেখে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া ভাল। ঢুকে পড়ব নাকি?'

'বাধা তো দেখছি না।'

ঠেলা দিতেই খুলে গেল পাল্লা। টুংটাং করে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল। বাতাসে ধুপের কড়া গন্ধ। আড়াল থেকে মৃদু শব্দে বাজছে উচ্ছল বাজনা। সারি সারি তাক আর বেশ কয়েকটা আলমারি আছে। তাকগুলোতে রাখা হ্যালোউইন কস্টিউম, ম্যাজিকের সরঞ্জাম, শেকড়-বাকড়-ভেষজ ওষুধ, হোমিওপ্যাথি আর অ্যারোমাথেরাপির ওপর কয়েকটা পেপারব্যাক চটি বই আর কিছু বিচিত্র জিনিস যেগুলো চিনতে পারল না ওরা। লম্বা একটা আলমারি সীম আর সিয়ারিয়ালের প্যাকেটে বোঝাই।

দোকানের শেষ মাথায় একটা লম্বা কাউন্টার। তার ওপাশে বসে আছে সারালিন জুবের। কি যেন পড়ছিল। ছেলেরা ঢুকতে মুখ তুলে তাকিয়েছে। দোকানে আর কোন খরিদ্দার নেই।

'কিছু লাগবে?' জানতে চাইল মহিলা।

'দেখি আগে,' জবাব দিল কিশোর। 'পছন্দ হলে বলব।'

দেখার মত জিনিসের অভাব নেই। একটা ঘূর্ণায়মান তাকে রাখা কতগুলো অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তার। নিশ্চয় ছোটখাট ম্যাজিক দেখানোর সরঞ্জাম। বাচ্চাদের জন্যে।

'এগুলো পেলে হুমড়ি খেয়ে পড়বে ডন,' মুসার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

রবারের মাকড়সা আছে, নাড়া লাগলেই পা কিলবিল করে ওঠে। ম্যাজিক সোপ আছে। দেখতে সাধারণ সাবানের মতই। কিন্তু মুখ ধুতে গেলে কালি লাগার মত কালো হয়ে যাবে মুখ। প্লাস্টিকের তৈরি চকলেট আছে। আসল চকলেটের মত দেখতে। মুখে না দিলে বোঝা যাবে না ওগুলো প্লাস্টিক। চিনির টুকরো আছে। চায়ের কাপে দিয়ে গোলাতে গেলে বেরিয়ে আসবে ভেতরে লুকানো রবারের কালো রঙের মরা মাছি। কাউকে ঠকাতে কিংবা ভয় দেখানোর জন্যে এ সবের তুলনা হয় না।

'ডনকে বোলো না,' সাবধান করে দিল মুসা। 'কোনমতে খোঁজ পেলে সব এসে কিনে নিয়ে যেতে চাইবে। পয়সা চেয়ে চেয়ে জান জ্বালিয়ে খাবে।'

বয়ামে রাখা ভেষজ ওষুধের একটা তাকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল দু'জনে।

'মুখ খুলে শুঁকে দেখো,' সারালিন বলল। 'অনেক কাজে লাগে। একটার সঙ্গে আরেকটা ঠিকমত মিশিয়ে নিতে পারলে মাথা ব্যথা, দাঁত ব্যথা আর পেট ব্যথায় ধন্বন্তরির কাজ করে।'

একটা বয়ামের মুখ খুলে শুঁকল কিশোর। মৌরির তীব্র গন্ধ। সারালিনকে জিজ্ঞেস করল, 'যেমন?'

'পুরানো আমলে তো ভেষজ ওষুধ দিয়েই চিকিৎসা করত লোকে। প্রতিটি রোগের প্রাকৃতিক প্রতিষেধক ছিল। লবঙ্গ ব্যবহার করা হত দাঁত ব্যাথায়, পেট ব্যথার জন্যে পেপারমিন্ট। এমনি নানা রোগে নানা ওষুধ,' হাসল সারালিন। 'বহুকাল হলো, আমাকে আর ডাক্তারের কাছে যেতে হয়নি।'

'যে কোন রোগ সারাতে পারে?' বিশ্বাস হচ্ছে না মুসার।

'প্রায় সব।'

'ভাঙা পা জোড়া লাগাতে পারে?'

'পা ভাঙাটা কোন রোগ নয়,' হাসি মলিন হলো না সারালিনের।

'কি জানি। আমি তো ভাবতাম হাড় ভাঙাটাও রোগ। ব্যথায় যে রকম চেঁচামেচি করতে থাকে রোগী...'

'পা কেটে গেলেও তো রোগী চেঁচায়। তাই বলে সেটা কি রোগ?'

'না, তা অবশ্য নয়...'

'আসলে আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করছিলে, তাই না? তোমার কোন দোষ নেই। আজকাল লোকে আর এ সবের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছে না। রোগ হলেই ডাক্তারের কাছে ছোটে।'

'কাল রাতে আপনার মীটিঙে গিয়েছিলাম আমরা,' কিশোর বলল। 'রোগ সারাতে কাল ভেষজ ওষুধও লাগেনি আপনার।'

'কেউ কেউ বিশেষ ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। আমিও সেই ভাগ্যবানদের একজন।'

'আসলেই আপনি ওষুধ ছাড়া জটিল রোগ সারাতে পারেন?'

'সেটা নির্ভর করে রোগীর মনের জোরের ওপর।'

'যদি কারও সে-জোর না থাকে?'

হাসিটা এতক্ষণে মলিন হলো সারালিনের। 'বিশ্বাস আর মনের জোর ছাড়া কোন কিছুই সম্ভব নয়।'

'কেউ যদি আপনার এই জবাবের মধ্যে ফাঁকিবাজি দেখতে পায়, কি বলবেন?'

'মানে?' হাসিটা পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল মহিলার।

'দেখতে পেলেও কেউ অবশ্য আপনাকে ফাঁকিবাজ প্রমাণ করতে পারবে না। রোগ সারলে বলবেন আপনার কৃতিত্ব, না সারলে রোগীর দোষ; ভুল বললাম?'

জবাবটা এড়িয়ে গেল সারালিন, 'বহু লোকের পুরানো বেদনা-রোগ সত্যি সত্যি সারিয়ে দিয়েছি আমি।'

'আপনার ঝাড়ফুঁকেই যে সেরেছে, তার কি প্রমাণ আছে?'

হাত নাড়ল সারালিন, 'দেখো, এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না আমি।'

'কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু...'

উঠে দাঁড়াল সারালিন। 'কিছু কিনবে নাকি তোমরা?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। 'দোকান বন্ধ করব আমি।' কপাল টিপে ধরল। 'মাথা ধরেছে।...না কিনলে নেই...অন্য কোনদিন সময় করে এসো। কথা বলা যাবে।'

বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা।

ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ছিটকানি লাগিয়ে দিল সারালিন। জানালার খড়খড়ি নামিয়ে দিল।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'তোমার প্রশ্নের তোড়ে ঘাবড়ে গেল নাকি?'

'না ঘাবড়ালেও রেগেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'মুখের ওপর কাউকে ঠগ, মিথ্যুক বললে রেগে যাবারই কথা।'

'ঠিকই তো বলেছি। ও যা, তা-ই বলেছি। রাগে রাগুকগে। মাথা ধরেছে তো বিশ্বাস দিয়ে সারায় না কেন? নিজের মনের জোর কম নাকি? আমি শিওর, ভেষজ-ফেষজ বাদ দিয়ে এসপিরিন গিলছে এখন। চলো, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ নেই।'

পাশের একটা দোকান থেকে বেরিয়ে এল এক মহিলা। জুবেরদের দোকানের দরজায় 'বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখে আফসোস করে বলল, 'এহ্হে, বন্ধ করে ফেলল!'

কিশোর বলল, 'ইচ্ছে করলে এখনও দেখা করতে পারেন।'

'নাহ্, তেমন জরুরী কিছু না। পাশের ওই যে দোকানটা দেখছ, ওটা আমার। একটু আগে ডাকপিয়ন ভুল করে জুবেরের দোকানের চিঠি আমার দোকানে দিয়ে চলে গেছে,' একটা চিঠি দেখাল মহিলা। 'আমিও ছিলাম ব্যস্ত, খেয়াল করিনি। পরে দেখতে গিয়ে দেখলাম আমার চিঠি না।...এই যে দেখো, ঠিকানা লেখা থারটি ফাইভ, ম্যানার স্ট্রীট। আমারটা তেত্রিশ। মাঝে আরেকটা দোকান। ওপরে নাম যা-ই দিয়ে থাকুক, নম্বর মিলে যাচ্ছে; জুবেরদের চিঠিই এটা। এই পিয়নগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না। চোখের মাথা খেয়ে বসে থাকে!' চিঠিটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার তাড়া আছে। এটা মিসেস জুবেরকে দিতে পারবে, প্লীজ?'

'নিশ্চয় পারব,' সাগ্রহে হাত বাড়াল কিশোর।

চিঠিটা দিয়ে তাড়াহুড়া করে চলে গেল মহিলা।

খামের ওপরে লেখা ঠিকানা দেখল কিশোর। রিয়ারসাইড কাউন্টির জনৈক কে. ডিকির ঠিকানায় গিয়েছিল প্রথমে। সেখানে তাকে না পেয়ে ঠিকানা কেটে রকি বীচে জুবেরদের ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে।

মুখ তুলে তাকাল কিশোর। যে মহিলা চিঠি দিয়ে গেছে সে অনেক দূরে চলে গেছে।

'আশ্চর্য!' বিড়বিড় করল কিশোর।

'কি?' জানতে চাইল মুসা।

'ঠিকানা। প্রথমে রিয়ারসাইড কাউন্টিতে গিয়েছিল।'

'তাতে আশ্চর্যের কি হলো? ওখান থেকেই তো এসেছে টমেরা।'

'না। ওরা বলেছে রিভারসাইড কাউন্টি থেকে এসেছে। রিয়ারসাইড কাউন্টি নয়।'

'হয়তো ভুল শুনেছ। টমের উচ্চারণের কারণেও ওরকম শোনা যেতে পারে।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'না, ও রিভারসাইড কাউন্টিই বলেছে। আমি শিওর।' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল সে। 'আরও একটা ব্যাপার, চিঠিটা কে· ডিকির নামে এসে থাকলেও ঠিকানা দিয়েছে জুবেরদের দোকানের।'

'তাতে কি? কে· ডিকি হয়তো নতুন এসেছে এখানে। পার্মানেন্ট ঠিকানা নেই। জুবেরদের পরিচিত, তাই তাদের ঠিকানাতেই চিঠি এসেছে। ঠিকানা কেটে পরে পাঠিয়েছে চিঠিটা যে, সে জানে কে· ডিকি এখন কোনখানে থাকে। সেই লোক রিয়ারসাইডে বাস করলেও জুবের আর কে· ডিকি, দু'জনকেই চেনে। এক শহরের লোক কি আরেক শহরের লোককে চিনতে পারে না?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। কি যেন ভাবতে ভাবতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ। মুসার দিকে তাকাল সে। 'রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি, মুসা।'

'কি রহস্য?'

'জানি না এখনও। তবে জেনে যাব শীঘ্রি।'

নয়

'মনে তো হচ্ছে সব ঠিকঠাকমতই চলছে,' মিস ওয়ান্ডারের দিকে তাকিয়ে হাসলেন হেড টীচার মিস হ্যামিলটন। 'কোন অসুবিধে হলে বলবেন। সব রকম সহযোগিতা পাবেন আমার কাছ থেকে।'

ফেসটিভ্যাল কমিটির সদস্যদের ভরসা আর উৎসাহ দিয়ে চলে গেলেন তিনি।

'যাক, আমাদের জন্যে আরও সুবিধে হলো,' মিস ওয়ান্ডার বললেন। 'এখন কথা হলো, দায়িত্ব তো আরও কিছু বাকি রয়ে গেছে। এই যেমন, ভিডিও রেকর্ডিংটা কে করবে?'

ছাত্রছাত্রীরা চুপ করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। ওরা চাইছে, সিদ্ধান্তটা তিনিই দিন।

'গতবার কেরি করেছিল,' আবার বললেন তিনি। 'ভালই করেছিল। তবে এবার অন্য কাউকে চান্সটা দিতে চাই। বিড, তুমি করবে নাকি?'

'সরি, ম্যাডাম। ক্যামেরার ব্যাপারটা ভাল বুঝি না আমি।'

কিশোরের দিকে তাকালেন মিস ওয়ান্ডার, 'কিশোর, তুমি?'

'আমার তো আপত্তি ছিল না। কিন্তু ম্যাগাজিনের লেখার কাজটাও তো আমার ঘাড়ে পড়েছে।'

'কে দিল?'

'কেরি।'

'আমি ভেবেছিলাম এবারও ভিডিও করার দায়িত্ব পড়বে আমার ওপর,' কৈফিয়ত দিল কেরি। 'তাই লেখার কাজটা কিশোরকে করতে বলেছিলাম। কিন্তু এখন তো আর আমাকে ভিডিও করতে হচ্ছে না, আমিই লিখতে পারব। ও ছবি তুলুক।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে তিক্ত হাসি হাসল সে। 'কি, খুশি তো?'

কেরির ঝাঁজ মেশানো কর্তৃত্বভরা কণ্ঠকে উপেক্ষা করল কিশোর। মিস ওয়ান্ডারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ভিডিওর দায়িত্ব আমি নিলাম।'

'আগেই প্র্যাকটিস করে নিও। ক্যামকর্ডার চালাতে যদি কোন অসুবিধে হয়, কেরিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেবে। কেরি, কিশোরকে সাহায্য কোরো।'

আবার তিক্ত দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে তাকাল কেরি। হ্যাঁ-না কিছু বলল না।

এরপর কাজের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে জানতে চাইলেন মিস ওয়ান্ডার। এক এক করে কাজের ফিরিস্তি দিতে লাগল সদস্যরা। ক্যানভাসে আঁকার কাজ ভালই এগিয়েছে। গাছ বানানো প্রায় শেষ করে এনেছে উডওঅর্ক ডিপার্টমেন্ট। পোশাক তৈরি এখনও অনেকটাই বাকি, এটা সবচেয়ে কঠিন কাজ। বিশেষ করে রবিনের রানীর পোশাক বানানো। তবে যারা দায়িত্বে আছে, তারা কথা দিল, উৎসবের আগে শেষ করে ফেলবে যেভাবেই হোক।

জুবেরদের ঠিকানায় আসা কে· ডিকির চিঠির কথা রবিনকে বলার সুযোগ পায়নি এখনও কিশোর। মুসার সঙ্গে ঠিকানাটা নিয়ে সকালেও আলাপ হয়েছে। কিশোরের ধারণা, কোন কারণে নামের ব্যাপারে মিথ্যে বলেছে টম। রকি বীচে আসার আগে ছিল রিয়ারসাইড কাউন্টিতে, বলেছে রিভারসাইড কাউন্টি। উচ্চারণের ভুল নয়, ইচ্ছে করেই বলেছে সে।

'এটা অবশ্য তেমন কোন অপরাধ নয়,' তর্কের খাতিরে মুসাকে বলেছে কিশোর। 'এক জায়গায় থেকেছে টমরা, বলেছে আরেক জায়গার নাম, একে কি অপরাধ ধরা যায়?'

'তা যায় না,' মুসা বলেছে, 'তবে মিথ্যে কথা বলেছে সে। ওরকম একটা মিথ্যুকের সঙ্গে রবিনের মেলামেশাটা আমি ভাল চোখে দেখতে পারছি না।'

মীটিং শেষে ক্যানটিনে চলল তিন গোয়েন্দা।

'ক্যামকর্ডার কেরির হাতছাড়া হয়ে গেল বটে,' হাঁটতে হাঁটতে বলল রবিন, 'তবে ম্যাগাজিন থেকে তোমাকে পুরোপুরি বের করে দিতে পেরে

খুশিও হয়েছে।'

'হয় হোকগে,' জবাব দিল কিশোর। 'একসাথে সব কাজ তো আর আমি করতে পারব না। বসে লিখে লিখে হাত ব্যথা করার চেয়ে ভিডিও করা অনেক আনন্দের।'

'আমিই নিশ্চয় প্রাধান্য পাব বেশি,' হেসে বলল রবিন। 'প্রচুর ক্লোজ-আপ নেয়া হবে, যেহেতু রানী। এ বছরের জন্যে স্টার বানিয়ে দিলে আমাকে।'

'ভালয় ভালয় যদি উতরে দিতে পারো,' মুসা বলল, 'একটা কাজের কাজ হবে। পত্রিকাওলারাও প্রচুর লেখালেখি করবে তোমাকে নিয়ে। স্কুলের সুনাম হবে।'

দরজা ঠেলে ক্যানটিনে ঢুকল ওরা।

'ওই যে টম,' রবিন বলল। 'চলো, ওর টেবিলে গিয়েই বসি।'

খাবারের ট্রে হাতে টমের কাছে চলে এল তিনজনে। ট্রেগুলো টেবিলে রাখল।

'মীটিং কেমন হলো?' জানতে চাইল টম। 'সব ঠিক হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ,' রবিন জানাল। 'ভিডিওর দায়িত্ব পেয়েছে কিশোর।'

'ভাল। ক্যামকর্ডার চালাতে জানো তো ঠিকমত? কোন সমস্যা হলে আমাকে বোলো, দেখিয়ে দেব। বাবা যখন থিয়েটারে কাজ করত, কতবার তার ছবি তুলেছি।'

'অ, ক্যামেরাও চালাতে জানো,' ব্যঙ্গের সুর বেরোল মুসার কণ্ঠ থেকে। 'সব বিষয়েই তোমার ট্যালেন্ট দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছি আমি। অবশ্য তোমাদের পুরো পরিবারটাই ট্যালেন্টেড।'

টেবিলের নিচ দিয়ে মুসার পায়ে লাথি মারল কিশোর। থামল না মুসা। 'থিয়েটারে কি কাজ করত তোমার বাবা? অভিনয়?'

'হ্যাঁ। রিভারসাইডে তো বিরাট সুখ্যাতি ছিল তার। প্রচুর ভক্ত ছিল।'

'তাই নাকি? কই, কোনদিন তো কোন পত্রিকায় তার ছবি দেখিনি। নামও শুনিনি।'

তীক্ষ্ণ হয়ে গেল টমের দৃষ্টি। 'এত দূর থেকে তার নাম তোমাদের শোনার কথা নয়। তা ছাড়া ভিন্ন একটা নাম নিয়েছিল বাবা। সিনেমা-থিয়েটারের লোকেরা আসল নাম বাদ দিয়ে অন্য নাম নেয় না, ওরকম।' পকেট থেকে একটা পয়সা বের করল সে। 'দেখো।'

পয়সাটা এ হাত থেকে ও হাতে চালাচালি করল কয়েকবার। তারপর মুখে ফেলল। দাঁতে কামড়ে ধরে রাখল একটা মুহূর্ত। মুখের ভেতরে নিয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল। ঢোক গিলে বোঝাল পয়সাটা গিলে ফেলেছে। দুই হাত দেখাল। কোন হাতেই নেই। তারপর মুসার কানের পেছন থেকে বের করে আনল ওটা।

হেসে উঠল রবিন। হাততালি দিল।

মুসাও হাসল। 'অনেক ম্যাজিক শিখেছ তুমি। শেয়ালের মত চালাক।'

টমও হাসল। কিন্তু চোখে অস্বস্তি।

'ফেসটিভ্যালের জন্যে ও আমাকে ম্যাজিক শিখিয়ে দেবে বলেছে,' রবিন বলল।

'লোকে কি এ সব ম্যাজিক দেখতে পাবে?' এতক্ষণে কথা বলল কিশোর। 'তুমি থাকবে ফ্লোটের ওপর। রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষকে দেখাবে কি করে?'

'ঠিকই বলেছ,' টম বলল। 'এ ধরনের ম্যাজিক চোখেই পড়বে না লোকের।'

'তাহলে কি করা যায়?' রবিন বলল, 'একটা কিছু করতে চাই আমি। সারাক্ষণ একভাবে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থেকে লোকের দিকে হাত নাড়তে ভাল লাগবে না।'

'বল ছুঁড়তে পারো,' সমাধান দিয়ে দিল টম। 'সেটা ঠিকই দেখতে পাবে লোকে।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'আমার আম্মা বল ছোঁড়ায় ওস্তাদ। তোমাকে শিখিয়ে দিতে পারবে। আমিও জানি। তবে ওস্তাদী করার মত পারি না।'

'তাহলে তা-ই শিখব!'

'অত সহজ না। প্রচুর প্র্যাকটিস দরকার এর জন্যে। সময় তো বেশি নেই আর।'

চোখ জ্বলজ্বল করছে রবিনের। চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিল এটাকে। 'আমাকে দেখিয়ে দাও, ঠিক পারব। মন দিয়ে করতে থাকলে কোন কাজ পারা যায় না এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল টম। 'আমার কাজ আছে। পরে দেখা করব তোমার সঙ্গে।'

দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে টম। ওর দিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'ও একটা অসাধারণ ছেলে, তাই না?'

'ভাল অর্থে না খারাপ অর্থে?' ফস করে বলে বসল মুসা।

'মানে!'

'মাত্র কদিন আগে ওর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে তোমার। ভাল করে চেনোই না। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করেই কেবল ওর সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ…'

'মুসা, থাক,' বাধা দিতে গেল কিশোর।

মুসার দিকে তাকিয়ে রবিন বলল, 'তুমি যাই বলো না কেন, টম খুব ভাল ছেলে।'

'টমের সব কথা বিশ্বাস করা তোমার ঠিক হচ্ছে না। এই যে বলে গেল, রিভারসাইডে ওর বাপ বিরাট অভিনেতা ছিল, আসলে কি তাই? কেউ শুনল না কেন তাহলে তার নাম?'

'বলল যে শুনলে না আসল নাম ব্যবহার করেনি ওর বাবা।'

'শুনেছি। তাহলে অন্য যে নামটা ব্যবহার করত, সেটা জানাল না কেন আমাদের? প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার জন্যে পয়সা বের করে ম্যাজিক দেখানো শুরু করল। বুঝিনি ভেবেছ?'

রেগে গেল রবিন। 'টমকে তোমরা শুধু শুধু সন্দেহ করছ। উচিত হচ্ছে না। কেন ওকে পছন্দ করতে পারছ না, বুঝছি না আমি। কিন্তু ও খারাপ নয় মোটেও। যতই বলো, আমি বিশ্বাস করব না।'

'ওই আলোচনাটা বাদ দাও না এবার!' ওদের থামানোর জন্যে বলল কিশোর। 'বাইরের একটা ছেলেকে নিয়ে এ ভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধানোটা কি ঠিক হচ্ছে?'

মুসা চুপ হয়ে গেল। নরম হয়ে এল রবিন।

'রবিন,' আবার বলল কিশোর, 'এই চুরির ব্যাপারটা নিয়ে একটা তদন্ত চালাব ভাবছি। আলোচনায় বসতে চাই।'

'সরি। আজ আমার সময় হবে না। ব্যস্ত থাকব।'

খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়ে উঠে চলে গেল রবিন।

মুসা বলল, 'চিঠির কথাটা ওকে বললে না কেন?'

'লাভ হত না। রবিন যে ভাবে টমদের সাপোর্ট করছে, সন্দেহের কথাটা বোঝাতে পারতাম না ওকে। তোমার ওভাবে ওকে রাগানো ঠিক হয়নি।'

'কি করব? টমকে যেভাবে ভাল বলতে লাগল...'

'বলুক। সময় হলেই ঠিক হয়ে যাবে সব। অন্যকে নিয়ে অহেতুক ঝগড়া করে আমাদের নিজেদের বন্ধুত্বে ফাটল ধরানোটা হবে মস্ত বোকামি।'

'কিন্তু আমার কি কোন দোষ ছিল?'

'ছিল। তোমাদের দু'জনেরই দোষ। দু'জনেই অতিরিক্ত তর্ক করছ ক'দিন থেকে,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'চলো।'

'কোথায়?'

'বাড়ি যাবে না? ক্যান্টিনেই বসে থাকবে নাকি?'

মাঠের মধ্যে দিয়ে এগোনোর সময় ডনের সামনে পড়ল কিশোর। ডনের সঙ্গে রয়েছে তার দু'জন বন্ধু। ফুটবলে লাথি মারছে। ডনের মেজাজ খারাপ। কিশোরকে দেখেই বলে উঠল, 'আজকাল সবার হয়েছে কি, বলো তো, কিশোরভাই? সবাই যেন কেমন খেপে গেছে। প্রফেসর চ্যালেঞ্জারের বিষ বলয়ে ঢুকল নাকি পৃথিবী?'

'কি হয়েছে?'

'যত নষ্টের মূল ওই জঘন্য ফেসটিভ্যাল,' গজগজ করে বলল ডন। 'ওদেরকে বললাম স্টোরে বিক্রির জন্যে ভিনগ্রহের বাসিন্দা আর দানব বানাতে। ভয়ানক ভয়ানক সব দানবের চেহারাও বর্ণনা করলাম। কিন্তু আমার কথা শুনলই না। ওরা বলে ব্যাঙ, বিড়াল, ইঁদুর বানাতে। এ কোন জিনিস হলো? আমাকে দিয়েছে আরও খারাপ জিনিস বানাতে। ভূত।'

'ভূত? ভালই তো। দানবের কাছাকাছিই চেহারা হবে নিশ্চয়।'

'তোমার কথাও তো ওদের মতই!' ঝাঁজিয়ে উঠল ডন। 'কোথায় ভিনগ্রহের দানব, আর কোথায় মাটির তলার ভূত, নৌম। খেয়ে আর কাজ পেল না!' রাগটা ঝাড়ল ফুটবলের ওপর। ধাঁ করে এক লাথি মেরে ওটাকে পাঠিয়ে দিল মাঠের কিনারে। ওর দুই বন্ধু আটকাতে পারল না। 'নৌম-ফৌম

দু'চোখে দেখতে পারি না আমি!'

দশ

কিছু একটা করা দরকার, বুঝতে পারছে কিশোর। পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে, রবিনের সঙ্গে খিটিমিটিটা বাড়বেই মুসার। সেটা বন্ধ করতে হলে টমের একটা ব্যবস্থা করা দরকার। হয় প্রমাণ জোগাড় করতে হবে যে সে মিথ্যে কথা বলছে, নয়তো নিশ্চিত হতে হবে ওরা ভুল করছে।

টমের বাবার বিরুদ্ধে খারাপ কিছু জানা যায়নি এখনও। ম্যাজিক দেখানো খারাপ কিছু না, কিংবা অপরাধ নয়। হয়তো সত্যিই রিভারসাইডে নাটকে অভিনয় করত সে। ভিন্ন নামে। অসম্ভব নয়।

টমকে জিজ্ঞেস করে সুবিধে হবে না। বরং তার মায়ের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাতে কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।

আবার যেতে পারে দোকানটায়। কায়দা করে আলাপ চালাতে পারে সারালিনের সঙ্গে। একজন ম্যাজিশিয়ানের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে গেলে সন্দেহ জাগার কোন কারণ নেই। জানার চেষ্টা করবে, সত্যি ভিন্ন নামে অভিনয় করত কিনা মহিলার স্বামী। রকি বীচে আসার আগে কোন্ জায়গায় থাকত, সেটাও হয়তো জানা যাবে।

মুসাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। উল্টোপাল্টা কথা বলে সব ভজঘট করে দিতে পারে সে। গেলে একাই যেতে হবে। ডনের জন্যে জিনিস কেনার ছুতো করে।

সেদিন বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাস ধরে আবার ম্যানার স্ট্রীটে চলে এল কিশোর।

বাস থেকে নেমে রাস্তার মোড় ঘুরছে, এই সময় একটা লোকের ওপর দৃষ্টি আটকে গেল তার। সেই বেতো লোকটা, টাউন হলে যার ব্যথা সারিয়ে দিয়েছিল সারালিন, গটগট করে হেঁটে চলে যাচ্ছে রাস্তার উল্টো দিক দিয়ে।

ওই লোকটাই, কোন সন্দেহ নেই। এমন ভঙ্গিতে হেঁটে যাচ্ছে, যেন কোনকালে বাতের ব্যারাম ছিল না তার।

অবশ্য সারালিন বলেছে কোনদিন আর বাতে কষ্ট পেতে হবে না তাকে।

সত্যি কি ভাল করে দিয়েছে?

আসলেই কি অসুখ ছিল লোকটার?

মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দেখতে লাগল সে। গাঁট্টাগোট্টা শরীর, মাঝবয়েসী, মাথাভর্তি চুল, সরু, চ্যাপ্টা লম্বাটে মুখ, ঠেলে বেরুনো চোয়াল আর খাড়া নাক। রাতে অল্প আলোয় এত ভাল করে দেখতে পারেনি। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন অর্ধভুক্ত একটা ব্লাডহাউন্ড খাবারের সন্ধানে চলেছে।

চোখ বড় বড় হয়ে গেল কিশোরের। লোকটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে সারালিনের দোকানের সামনে। জানালা দিয়ে উঁকি দিতে লাগল। দোকান থেকে বেরিয়ে এল স্বয়ং গ্রেট মিসটিরিয়োসো। কথা বলতে লাগল লোকটার সঙ্গে।

কয়েক মিনিট পর দোকানে তালা লাগিয়ে লোকটার সঙ্গে হেঁটে চলল গ্রেট মিসটিরিয়োসো।

সন্দেহ জাগল কিশোরের। একে অন্যকে চেনে ওরা। কি করে চিনল? ফেইথ হীলিং মীটিঙে সেদিন উপস্থিত ছিল না জুবের। দেখা হওয়ার কথা নয়। তাহলে চিনল কিভাবে?

একটাই জবাব, সাজানো নাটক ছিল ঘটনাটা। লোকটা বাতের রোগী ছিল না। দর্শকদের সামনে অসুস্থতার ভান করেছে। অভিনয়।

সারালিনের সঙ্গে কথা বলা বাদ দিয়ে তাড়াতাড়ি বাস ধরে বাড়ি ফিরে এল কিশোর। মুসাকে ফোন করল স্যালভিজ ইয়ার্ডে চলে আসতে। জরুরী কথা আছে।

মুসা বলল, আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

ফোন সেরে রান্নাঘরে ঢুকল কিশোর। মুখ তুলে তাকাল ডন। মুখে, হাতে, সাদা সাদা কি যেন লেগে আছে। টেবিলে বসে চীনা মাটির পাত্রে মেরিচাচীর সবচেয়ে প্রিয় কাঠের হাতাটা দিয়ে কি যেন ঘুঁটছে।

'কি করছ?'

'নৌম বানাচ্ছি,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল ডন।

'চাচীর জিনিস চাচীকে বলে নিয়েছ?'

ডনের জামার সামনেটা সাদা জিনিসে মাখামাখি। ওই একই জিনিস অনেকখানি পড়ে আছে মেঝেতেও।

'খালা কিছু বলবে না। কিসে নিয়ে ঘুঁটব?'

শঙ্কিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে কিশোর বলল, 'চাচী তোমাকে খুন করবে! কি পরিমাণ নোংরা করেছ দেখো!'

নিজের দিকে তাকাল ডন। 'মুছে ফেললেই হবে।' আরও জোরে জোরে ঘুঁটতে লাগল সে।

টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর, 'করছটা কি তুমি?'

বাটির পাশে রাখা একটা থকথকে নরম প্লাস্টিকের মূর্তি তুলে দেখাল ডন। কল্পিত নৌমের ছবির সঙ্গে মিল আছে। 'এটা হলো ছাঁচ। বাটিতে এই যে প্লাস্টার ঘুঁটছি, এটা ঢেলে দেব ছাঁচের মধ্যে। শক্ত হয়ে গেলে ছাঁচটা দু'দিক থেকে টেনে খুলে ফেলব। ব্যস, নৌম তৈরি হয়ে যাবে।'

ভুরু কুঁচকাল কিশোর। 'বানাতে পেরেছে একআধটা?'

মাথা নাড়ল ডন। টেবিলে রাখা একটা প্লাস্টিকের দলা দেখাল। 'চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। এটাই প্রথম। দোষটা কোনখানে বুঝতে পেরেছি। গোলানোটা ঠিকমত হয়নি। বেশি পাতলা করে ফেলেছিলাম। ঢালার পর শক্ত হওয়ার জন্যেও যথেষ্ট সময় দিইনি। এ জন্যেই এখন আরও ঘন করে ঘুঁটে নিচ্ছি।'

ঘড়ির দিকে তাকাল কিশোর। 'চাচী নিশ্চয় বাজারে গে
ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে। ভাল চাও তো তাড়াতাড়ি স
ফেলো এগুলো।'

'ও নিয়ে ভেবো না। সব ঠিক করে ফেলব আমি।'

সরে গেল কিশোর। রান্নাঘরেই থাকল না আর। চাচী এসে ঢোকার সময় ওখানে কোন কিছুর বিনিময়েই থাকতে রাজি নয় সে।

নিজের ঘরে ফিরে এসে নোটবুকটা বের করল। নতুন কেসটার ব্যাপারে যে সব নোট লিখে রেখেছে, দেখে দেখে সেগুলো নিয়ে ভাবতে লাগল।

নতুন একটা পাতার ওপরে লিখল সে–সারালিন জুবের, ফেইথ হীলার। আরও কিছু লিখতে যাচ্ছিল, দরজার বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। ঘরে ঢুকল মুসা।

সারালিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কি দেখে এসেছে, ওকে জানাল কিশোর।

'আমি জানতাম!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল মুসা। 'শুরু থেকেই সন্দেহ করেছিলাম মহিলা একটা ঠগ। এখন তো প্রমাণ হয়ে গেল। জুবেরদের সহকারী হিসেবে কাজ করছে ওই ভুয়া বেতো রোগীটা। সারালিনের ব্যাপারেও নতুন খবর শুনে এলাম। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাকি মহিলাদেরকে ফেইথ হীলিঙের তালিম দেয়। মা গিয়েছিল মিসেস জুমিংদের বাড়িতে, সান্ত্বনা দিতে। কয়েক দিন আগে চুরি হয়েছে ও বাড়িতে। মাকে বলেছে মিসেস জুমিং, চুরি হওয়ার কয়েক হপ্তা আগে নাকি সারালিন তাকে তালিম দিতে গিয়েছিল। ফী হিসেবে মোটা টাকা আদায় করে ছেড়েছে। অনেক টাকার ভেষজ ওষুধ বিক্রি করেছে।' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল মুসা, 'কথাটা যদি সত্যি হয়ে থাকে–না হওয়ার কোন কারণ নেই, মিসেস জুমিং মিথ্যে বলবে না–তাহলে কি দাঁড়াল?'

'চাচী অবশ্য পত্রিকার লেখা পড়েই আগাম বলে দিয়েছিল,' কিশোর বলল, 'এই ব্যবসা শুরু করবে সারালিন। এখন দেখা যাচ্ছে আরও আগে থেকেই শুরু করেছে। ভাবছি, আর কতজনের কাছ থেকে এ ভাবে ঠকিয়ে টাকা আদায় করেছে সারালিন?'

'ডন!' সিঁড়িতে যেন পিস্তলের গুলির মত টাস্‌স্‌ করে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ। 'এখানে আয়! এক্ষুণি!'

আঁতকে উঠল কিশোর, 'দেখে ফেলেছে!'

'কি?'

ডনের নৌম বানানোর কথাটা মুসাকে জানাল কিশোর।

ফিসফিস করে মুসা বলল, 'দরজাটা লাগিয়ে দেব?'

'না, দরকার নেই। চাচী এখানে আসবে না।'

নিচের চিৎকার-চেঁচামেচিকে উপেক্ষা করে জুবেরদের নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো দু'জনে। এতটাই উত্তেজিত হলো মুসা, সারালিন জুবের একটা ঠগ–প্ল্যাকার্ডে বড় করে এ কথা লিখে নিয়ে দোকানটার সামনে গিয়ে টহল

দিতেও রাজি।

ইচ্ছে করল অনেক কিছুই, কিন্তু আপাতত কোন কিছু করার উপায় দেখল না ওরা। করতে হলে হাতেনাতে ধরতে হবে, প্রমাণ জোগাড় করতে হবে, তার আগে কিছু করা যাবে না। নোটবুকটা বন্ধ করল কিশোর।

কিভাবে প্রমাণ জোগাড় করা যায় সেটা নিয়ে আলোচনা শুরু হলো।

'যাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি,' মুসা বলল। 'মিসেস জুমিঙের বাড়ি থেকে শুরু করা যায়।'

'কিন্তু লোকে আমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আগ্রহী হবে না। পুলিশকে দিতে দিতেই বিরক্ত হয়ে গেছে।'

'তা হয়তো হয়েছে। কিন্তু মা'র সঙ্গে আমাদের পড়শীদের খুব ভাল সম্পর্ক। মা'কে পটিয়ে-পাটিয়ে পাঠাতে পারি, কিংবা সঙ্গেও নিয়ে যেতে পারি।'

'তাহলে গিয়ে দেখতে পারো। তুমি ওদিকে চেষ্টা চালাও, আমি খবরের কাগজ ঘাঁটতে থাকি। দেখা যাক কোথায় গিয়ে ঠেকে।'

'বেচারী মিসেস জুমিং। প্রথমে দোহন করল তাঁকে সারালিন, তারপর সাফ করে দিয়ে গেল চোরেরা,' আফসোস করে বলল মুসা।

'তাকে দিয়েই ঠগবাজিটা শুরু করেছে সারালিন, বিশ্বাস হয় না আমার। কাঁচা কাজ হলে বোঝা যেত। তারমানে পাকা, বহু বছর ধরে করছে এই লোক ঠকানোর কাজ। শুধু রকি বীচেই নয়, আরও অনেক জায়গায় করে এসেছে।' উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল, উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠে বসল কিশোর। 'সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুরানো রোগে ভোগা অসুস্থ মানুষেরা ওর শিকার। ফাঁকি দিয়ে ওদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব টাকা হাতিয়ে নিয়ে কেটে পড়ে। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। মানুষ সতর্ক হয়ে যাওয়ার আগেই গা ঢাকা দেয়।...মা কি করছে, টম সব জানে। সেজন্যেই মিথ্যে বলেছে, রিয়ারসাইডকে রিভারসাইড। শেষ কোন্‌খান থেকে ঠগবাজি করে এসেছে, আমাদের জানাতে চায়নি। চোরের মন পুলিশ পুলিশ!...রবিনকে সাবধান করে দেয়া দরকার।'

'কালই করতে হবে। দেরি করা যাবে না। যদি বিশ্বাস না করে?'

'সেটাই তো সমস্যা,' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'দেখি কি করা যায়!'

পরদিন শনিবার। স্কুলে ফেসটিভ্যালের ড্রেস রিহারসল হবার কথা। রবিনও থাকবে। ওকে সব বলতে হলে টমের কাছ থেকে সরাতে হবে। জোঁকের মত ওর সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকে ছেলেটা।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো। খুলে গেল ভেজানো পাল্লা।

মেরিচাচী এসে দাঁড়িয়েছেন। কিশোরের দিকে তাকালেন। প্রচণ্ড রেগে গেছেন, চেহারাই বলছে। 'ডন বলল রান্নাঘরে যা করেছে ও, তুই নাকি দেখেছিস?'

'আমি দেখার আগেই ও যা করার করে ফেলেছে। সাফ করে ফেলতে বলেছিলাম...'

'ওর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারলি না? রান্নাঘরটার কি অবস্থা করেছে!

এখন আমি কখন কি করি...'

উঠে দাঁড়াল মুসা। কিশোরকে বলল, 'চলো না সাফ করে ফেলি। আমিও সাহায্য করব। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

মুসার কথায় কাজ হলো। নরম হয়ে গেলেন মেরিচাচী।

রান্নাঘরে নেমে এল মুসা আর কিশোর। এক কোণে মুখ গোমড়া করে দুই হাতে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছে ডন। ওদের দেখে চট করে ঘুরে গেল।

হেসে ফেলল কিশোর, 'কি, বলেছিলাম না? তোমার খালা নাকি কিছু বলবে না?'

জবাব দিল না ডন।

টেবিলের দিকে তাকাল কিশোর। তিনটে বিকৃত শরীরের নৌম পড়ে আছে। এই জিনিস স্টলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি তো দূরের কথা, রাখতেও দেবে না।

শার্টের হাত গোটাল মুসা। এগিয়ে গেল টেবিলের দিকে। কোন্‌খান থেকে শুরু করবে ভাবছে।

এগারো

'আরেকটু বাঁদিকে কাত করো,' চিৎকার করে বললেন মিস্টার রডরিগ। 'আরেকটু।...হ্যাঁ হয়েছে। এবার পেরেক ঠোকো।'

হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মেরে একটা পেরেক ঢুকিয়ে দিল কিশোর। কাঠের সঙ্গে আটকে গেল তেরপলটা। ফ্লোটের ডেক থেকে লাফ দিয়ে নেমে এলেন মিস্টার রডরিগ।

'ঠিক আছে,' বললেন তিনি, 'এখন এক মিটার পর পর পেরেক লাগাও। তেরপলটা সমান করে ধরে লাগাবে। ভাঁজ পড়ে যাবে নইলে।'

শনিবার সকাল। ব্যস্ত হয়ে কাজ করছে সদস্যরা। এখনও অর্ধেক কাজ বাকি।

ফ্লোটের অলঙ্করণ করতে কয়েকজন ছাত্রকে সাহায্য করছেন রাশেদ পাশা। হার্ডবোর্ড দিয়ে গাছ বানিয়ে সেগুলোকে রঙ করা হয়েছে। কাত করে ফেলে রাখা হয়েছে শুকানোর জন্যে। শুকালে তখন তুলে বসানো হবে ফ্লোটে।

কিশোর, মুসা আর আরও কয়েকজন মিলে ফ্লোটের মেঝেতে উজ্জ্বল রঙ করা তেরপল লাগাচ্ছে। মিস্টার রডরিগ আর মিস্টার উইলিয়ামস তদারক করছেন, হুকুম দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে এসে নিজেরাও হাত লাগাচ্ছেন।

খানিক দূরে বাজনা বাজাচ্ছে বাদকদল। যারা নাচতে নাচতে মিছিল করে এগিয়ে যাবে ফ্লোটের সঙ্গে তারা নাচ প্র্যাকটিস করছে। ওদের অঙ্গভঙ্গি দেখে হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মুসা। হাসি-আনন্দ, হই-হট্টগোলের মধ্যে কাজ

এগিয়ে চলেছে।

ভাঁড় সাজবে কে, সেটা এখনও ঠিক হয়নি। খুদে ঘণ্টা লাগানো ত্রিকোণ টুপিটা অনেকের মাথায় পরিয়ে দেখলেন মিস ওয়ান্ডার। কাউকেই পছন্দ হলো না তাঁর। শেষে মুসার মাথায় বসিয়ে দিলেন।

'খাইছে! আমি পারব না,' অস্বস্তিতে মাথা নাড়াল মুসা। টুংটাং করে উঠল সরু, ছোট্ট শেকলে ঝোলানো ঘণ্টাগুলো। 'এ জিনিস মাথায় নিয়ে হাঁটে কি করে মানুষ!'

'তুমিই পারবে,' হেসে বললেন মিস ওয়ান্ডার। 'সবচেয়ে বেশি মানিয়েছে তোমাকে।' একটা লাঠি ধরিয়ে দিলেন মুসার হাতে। লাঠির মাথায় বাঁধা একগুচ্ছ বেলুন। 'এটা দিয়ে মানুষকে বাড়ি মারা প্র্যাকটিস করো। সত্যি সত্যি জোরে মেরে বোসো না আবার। গায়ে যেন লাঠিটা না লাগে, শুধু বেলুন।...হ্যাঁ, মারো তো আমাকে?'

আলতো করে বাড়ি মারল মুসা।

মিস ওয়ান্ডারের হাসিটা বাড়ল। 'চমৎকার! ভাঁড় হিসেবে তোমার তুলনা নেই।'

*

হাতুড়ি ঠুকে পেরেক বসাচ্ছে কিশোর। দু'জন দু'দিক থেকে টানটান করে ধরে রাখছে তেরপলটা। পিঠে হালকা বাড়ি পড়ল কিসের যেন। ফিরে তাকিয়ে দেখে লাল-সাদা পোশাক, মাথায় ত্রিকোণ টুপি হাতে দাঁড়িয়ে আছে একজন ভাঁড়। হাতের লাঠির মাথায় বেলুন বাঁধা।

'শিখে ফেলেছি, না?' ঝকঝকে সাদা দাঁত বের করে হাসল মুসা। 'কেমন লাগছে আমাকে?'

'মিস ওয়ান্ডার ওয়ান্ডারফুল এক কাজ করেছেন,' হেসে বলল কিশোর, 'জন্মই হয়েছে তোমার ভাঁড় হওয়ার জন্যে।' এদিক ওদিক তাকাল। 'রবিনকে দেখেছ?'

'পোশাক পরে রানী সাজার প্র্যাকটিস করছে।'

'টম কোথায়?'

'সারা সকালে একবারও দেখিনি।'

'দাঁড়াও, এটা শেষ করে ফেলি। তারপর গিয়ে কথা বলব রবিনের সঙ্গে।' পেরেক ঠোকায় মন দিল কিশোর।

লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। কাছাকাছি যে-ই আসছে তাকেই বাড়ি মারছে।

কাজ সেরে ফ্লোট থেকে নেমে এল কিশোর। স্কুল বিল্ডিঙের দিকে রওনা হলো। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার একটা শ্বেত পাথরের মূর্তি বসিয়ে রাখা হয়েছে পাথরে বাঁধানো চত্বরে। তার নিচে এসে দাঁড়িয়ে গেল মুসা। মূর্তির গায়ে বেলুন দিয়ে বাড়ি মেরে বলল, 'কার দিকে তাকিয়ে আছেন, স্যার?'

'এই, কি করছ?' পেছনে শোনা গেল রাগত কণ্ঠ।

ঘুরে দাঁড়াল দু'জনে।

দাঁড়িয়ে আছেন ডেপুটি হেডটীচার মিস্টার বারবেট।

'আমার কোন দোষ নেই, স্যার। যাকে সামনে দেখব তাঁকেই বাড়ি মারতে বলে দিয়েছেন মিস ওয়ান্ডার,' বলেই বেলুন দিয়ে বাড়ি মারল মিস্টার বারবেটের গায়ে।

একটা মুহূর্ত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার বারবেট। দ্বিধায় পড়ে গেছেন। মুসা আবার লাঠি তুলতেই দ্রুত কেটে পড়লেন ওখান থেকে।

কৃত্রিম আক্ষেপের সুরে বলল মুসা, 'একেবারেই বেরসিক।'

মুচকি হাসল কিশোর, 'ভাল জিনিসই তুলে দিয়েছেন তোমার হাতে মিস ওয়ান্ডার।...সময় নষ্ট করছ শুধু শুধু। চলো, রবিনের সঙ্গে আলোচনাটা সেরে ফেলি।'

প্র্যাকটিসের জন্যে একটা ক্লাসরুম খালি করে দেয়া হয়েছে। নানা ধরনের পোশাক পরে জটলা করছে ওখানে অনেকে। বাদকদলের কয়েকজন আছে। ফ্লোটের পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে বাজনা বাজাবে ওরা। পেছন পেছন নেচে নেচে এগোবে মরিস-ড্যান্সারদের একটা দল। ওদের পেছনে থাকবে আরও কিছু চরিত্র। সবার পেছনে ভাঁড়।

বিচিত্র সব পোশাকধারীকে দেখা গেল ঘরের ভেতর। মাথা ঢাকা মুখোশ পরে কেউ সেজেছে কুমির, শেয়াল, গাধা, বাঘ; বাকিরা মানুষই আছে, তবে পরনে মধ্যযুগীয় পোশাক।

দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে দুই গোয়েন্দা। সামনে এসে দাঁড়াল একটা হরিণ। ওদের দিকে মাথা নুইয়ে শিং নাড়াল। তার আর কাগজ দিয়ে বেশ সুন্দর শিং বানিয়েছে ছেলেটা।

রানীর পোশাক পরে একটা টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে রবিন। টেনেটুনে ঝুল ঠিক করে দিচ্ছে নিচে দাঁড়ানো দুটো মেয়ে।

খুব সুন্দর হয়েছে তার পোশাকটা। ঝলমলে রঙ। ফুলের বেড আর রঙিন পাখির মিশ্রণ মনে হচ্ছে রবিনকে।

'খাইছে!'

মুসার কথা কানে যেতে ফিরে তাকাল রবিন। হেসে হাত নাড়ল। ঝিকিয়ে উঠল যেন রামধনুর সাত রঙ।

মুসা কাছে যেতে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

'দারুণ! সাংঘাতিক! বলে বোঝানো যাবে না!'

'মাথায় পরার হেড-ড্রেসটা বানানো হয়েছে?' জানতে চাইল কিশোর।

'হয়েছে,' হাত তুলে আরেকটা টেবিল দেখাল রবিন।

রাজকীয় পোশাকের সঙ্গে মানানসই করে তৈরি একটা রাজকীয় মুখোশ পড়ে আছে টেবিলে। ভোরের সূর্য যেন আলোর ছটা বিকিরণ করছে। সোনার তৈরি মনে হলেও সোনা নয়, সোনালি রঙ করা।

টেবিল থেকে লাফিয়ে নেমে গিয়ে মুখোশটা তুলে নিল রবিন। মাথা গলিয়ে মুখের ওপর নামিয়ে দিল। পুরোপুরি ঢাকা পড়ে গেল তার মুখ। কেবল

চোখের জায়গায় দুটো গোল গোল ফুটো।

'খুব ভাল হয়েছে,' প্রশংসা করলেন মিসেস জুটার। 'খোলো এখন। পোশাকের হেমটা সেলাই বাকি রয়েছে।'

পোশাক খুলতে রবিনকে সাহায্য করল মুসা আর কিশোর।

'হুফ্!' হাঁপ ছাড়ল রবিন। 'এ সব জিনিস পরে থাকত কি করে সেকালের রানীরা ভেবে পাই না। যা ভারী আর গরম। উৎসবের দিন গরম পড়লে ঘামতে ঘামতে মরব। বাইরে কি এখন খুব রোদ নাকি?'

'এসো না, দেখে যাও,' আমন্ত্রণ জানাল কিশোর।

বারান্দার সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। গাছের রঙ শুকিয়েছে। ধরাধরি করে তুলে ওগুলো ফ্লোটে বসানো হচ্ছে। ছেলেদের সাহায্য করছেন রাশেদ পাশা।

'রবিন, তোমার সঙ্গে কথা আছে,' কিশোর বলল। 'টমের ব্যাপারে।'

হাসল রবিন। 'ওকে নিয়ে তর্কাতর্কি করে এমন সুন্দর দিনটাকে মাটি করতে চাই না।'

'তর্ক করব না,' মুসা বলল। 'ওর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না তুমি। জানা দরকার।'

এক মুহূর্ত ভাবল রবিন। 'বেশ, বলে ফেলো।'

দোকানের সামনে যে লোকটাকে জুবেরের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে, তার কথা বলল কিশোর। সারালিন কিভাবে মানুষকে ঠকিয়ে পয়সা আদায় করে, সেটাও জানাল।

চুপচাপ শুনল রবিন। 'কিন্তু তাতে টমের দোষটা কোথায়?'

'ওর বাবা-মা কি করছে, নিশ্চয় জানে ও,' মুসা বলল।

'হয়তো জানে। কিন্তু মা যদি খারাপ কাজ করেই থাকে, বাধা দেবে কিভাবে?'

'তা নাহয় দিতে পারল না। কিন্তু তোমার সঙ্গে মিথ্যে বলেছে ও।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

'কোন্খান থেকে এসেছে ওরা।'

'একটা চিঠি দেখেছি,' কিশোর বলল। 'রিয়ারসাইড কাউন্টির ঠিকানায় গিয়েছিল, রিভারসাইড কাউন্টিতে নয়। দুটো জায়গা আলাদা।'

'যে একটা মিথ্যে বলে, সে আরও মিথ্যে বলতে পারে,' মুসা বলল। 'রবিন, ওকে তোমার বিশ্বাস করা উচিত হচ্ছে না। ওর কাছ থেকে সরে থাকা ভাল।'

ভ্রুকুটি করল রবিন। 'ওকে তুমি দেখতে পারো না বলে এ রকম করে বলছ। ও মিথ্যে বলেছে, এটা যতক্ষণ প্রমাণ করতে না পারবে, আমি কিছু বিশ্বাস করব না।'

মুসা বা কিশোরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে প্র্যাকটিস রূমে চলে গেল রবিন।

বোকা হয়ে পরস্পরের দিকে তাকাতে লাগল দুই গোয়েন্দা। রবিনের

আচরণ যে স্বাভাবিক নয়, আরও নিশ্চিত হলো ওরা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে কিশোর বলল, 'ওকে বলতে এসে ব্যাপারটা বোধহয় আরও খারাপ হয়ে গেল।'

বেলুন-লাঠি দিয়ে মেঝেতে বাড়ি মারতে মারতে মুসা বলল, 'এখন কি করা?'

'টমের অন্তত একটা মিথ্যে রবিনের কাছে ফাঁস করে দিতে হবে। রিভারসাইডে অভিনয়ের সময় কি নাম ব্যবহার করত টমের বাবা, ওর মা'র কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। আমি শিওর, টমের মিথ্যেটা ধরা পড়বেই।'

'দেখো, যা পারো করো,' নিরাশ ভঙ্গিতে বলল মুসা।

ওর দিকে তাকাল কিশোর। 'আজ বিকেলেই যাব সারালিন জুবেরের দোকানে।'

আলতো করে বেলুন দিয়ে কিশোরের মাথায় বাড়ি মারল মুসা, 'তোমার মগজটাই এখন একমাত্র ভরসা।'

বাসে করে এসে ম্যানার স্ট্রীটে নামল দুই গোয়েন্দা। শনিবারের রোদে উজ্জ্বল বিকেল। গির্জার আশেপাশে লোকের ভিড়। বেড়াতে এসেছে।

সারালিনের দোকানেও ভিড়। বিক্রিটিক্রি ভালই হচ্ছে মনে হয়। কিন্তু যার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, সারালিন, তাকেই দেখা গেল না। কাউন্টারের ওপাশে রয়েছে টম।

'গেল সব!' দোকানের একটা র‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এসে কোন লাভ হলো না। কি করব?'

'ডনের জন্যে কয়েকটা জিনিস কিনব,' জবাব দিল কিশোর। 'সন্দেহ করতে পারবে না টম।'

জিনিস পছন্দ করতে করতে আবার বলল, 'একটা কথা মাথায় এসেছে। জিজ্ঞেস করব ওকে। দেখি, কি বলে ফাঁকি দেয় এবার।'

কাউন্টারের সামনে এসে দাঁড়াল দু'জনে।

'হালো,' টম বলল। 'স্কুলে তোমাদের সাহায্য করতে যেতে পারলাম না আজ, সরি। এখানে এত বেশি ব্যস্ত···তোমাদের কাজ শেষ হয়েছে?'

'মোটামুটি,' কাছাকাছি কাউকে দেখতে পেল না কিশোর। 'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

হাসল টম। 'করে ফেলো।'

'সেদিন তোমার আম্মার মীটিঙে গিয়েছিলাম। একজন বেতো রোগীকে সারিয়ে দিয়েছেন। কাল রাতে তোমার আব্বার সঙ্গে এই দোকানের সামনে তাকে দেখেছি।'

'তাই? তাতে কি হয়েছে?'

'সেদিন মনে হয়েছিল লোকটা তোমার আম্মার একেবারে অপরিচিত। তাহলে মাত্র দু'দিন পর তোমার আব্বার সঙ্গে অতি পরিচিতের মত কথা বলে কিভাবে?'

হাসি ছড়িয়ে পড়ল টমের মুখে। 'তারমানে, বলতে চাইছ ঘটনাটা সাজানো নাটক ছিল?'

'হ্যাঁ,' কিশোরের আগেই জবাব দিয়ে দিল মুসা। 'তাই ছিল না?'

'না,' মসৃণ স্বরে বলল টম। 'রোগে ভুগে ভুগে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছে লোকটা। অসুখ থাকায় কাজও করতে পারত না ঠিকমত। সারার পর শরীর ঠিক হলে প্রথম যে চিন্তাটা মাথায় এল, সেটা কাজের। সবাই চলে গেলে আম্মাকে ধন্যবাদ দেয়ার জন্যে হলে রয়ে গেল সে। ধন্যবাদের সঙ্গে সঙ্গে একটা কাজও চেয়ে বসল আম্মার কাছে।' হাসল টম। 'কি আর করবে আম্মা। দোকানের ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলল। সেজন্যেই এসেছিল। দাঁড়াও, ডাকি, তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

দোকানের পেছনে চলে গেল টম।

পরস্পরের দিকে তাকাল কিশোর আর মুসা। অস্বস্তি বোধ করছে।

কয়েক মিনিট পর বেরিয়ে এল টম। সঙ্গে সেই সরু-মুখো লোকটা।

'কন,' পরিচয় করিয়ে দিল টম, 'এরা আমার বন্ধু–কিশোর, আর ও মুসা।'

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' নীরস স্বরে বলল লোকটা। 'আমার নাম কন ডিকি।'

'ব্যথাট্যতা কি এখনও আছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'না একেবারে শেষ?'

'কিচ্ছু নেই। দশ বছরের মধ্যে এই প্রথম শান্তিতে আছি। মিসেস জুবেরের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারব না।' টমের দিকে তাকাল কন। 'তোমার আম্মার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।'

দুই গোয়েন্দার দিকে তাকাল টম। চোখে নীরব জিজ্ঞাসা–আর কোন প্রশ্ন আছে?

'ভাল আছেন শুনে খুশি হলাম।' টমের দিকে তাকাল কিশোর। তাক থেকে তুলে আনা দুটো জিনিস দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এগুলো কত?'

দাম মিটিয়ে মুসাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল সে।

'টমের কথা বিশ্বাস করেছ তুমি?' ক্ষোভের সঙ্গে জানতে চাইল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'করতাম, যদি খামের ওপর ওই নামটা না দেখতাম।'

'কোন নাম?'

দোকানের দরজা দিয়ে ভেতরে তাকাল কিশোর। ধারে কাছে শোনার মত কেউ আছে কিনা দেখল। 'ভুলে গেছ? রিয়ারসাইড কাউন্টি থেকে আসা ওই চিঠিটা। ঠিকানায় নাম লেখা ছিল কে· ডিকি। কে· মানে কন। রোগ সারার সঙ্গে সঙ্গে সারালিন লোকটাকে চাকরি দিয়েছে এ কথা যদিও বা বিশ্বাস করা যায়, মীটিঙের পরদিনই দোকানের ঠিকানায় তার নামে চিঠি চলে এসেছে, এটা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'ঠগবাজিটা আগেই সন্দেহ করেছিলাম,

এখন শিওর হলাম। ভাবতে হবে, কিভাবে সেটা প্রমাণ করা যায়।'

বারো

'ওঠ্, ওঠ্, মুসা, জলদি ওঠ্! সব নিয়ে গেছে আমাদের!'

বিছানায় গড়িয়ে চিত হলো মুসা। বিড়বিড় করে ঘুমের ঘোরেই কি বলল। কাঁধ চেপে ধরা হাতটা সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল।

বিচিত্র মোড় নিয়েছে স্বপ্নটা।

অলিম্পিক ঘোড়দোড়ের ট্রায়াল চলছে। পাখা মেলে যেন উড়ে চলেছে ওর ফায়ার। সব ঘোড়াকে ছাড়িয়ে লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গিয়েছিল, এই সময় ভাঙিয়ে দেয়া হলো স্বপ্ন। শেষটা আর দেখা হলো না।

'মা! সরো!'

'মুসা, ওঠ্ না! চুরি করে নিয়ে গেছে তো সব!'

বিছানায় উঠে বসল মুসা। গায়ে আলুথালুভাবে চাদর জড়ানো। চোখ মিটমিট করে তাকাল মায়ের দিকে। 'কি?'

শোবার পোশাক পরেই চলে এসেছেন মা। 'এইমাত্র নিচে থেকে এলাম। রাতে চুরি হয়েছে আমাদের বাড়িতে।'

'যাহ্...'

'পুলিশকে ফোন করব। কাপড় পরে নে তাড়াতাড়ি।'

পুরানো জিনস আর সবুজ ঢোলা শার্টটা পরে নিল মুসা।

ওর বিছানায় বসে পড়েছেন মা। 'রিসিভারটা কোথায়?'

দু'জনেই তাকিয়ে আছে মেঝের দিকে। যেখানে জিনিসপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে এলোমেলো করে রেখেছে মুসা। একটা মহাজগাখিচুড়ি। 'এক্সটেনশন লাইন রেখে তোর লাভটা কি এখানে যদি কাজের সময় খুঁজেই পাওয়া না যায়?'

'শান্ত হও, দিচ্ছি বের করে।'

বহু খোঁজাখুঁজির পর তারটা দেখতে পেল মুসা। সেটা ধরে ধরে অনেক কষ্টে খুঁজে বের করল রিসিভারটা। মায়ের কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলল, 'কোন্ জিনিসটা কোন্‌খানে আছে, আমার মুখস্থ। বলার সঙ্গে সঙ্গে বের করে দেব।'

'হ্যাঁ, নমুনা তো দেখলামই। আধঘণ্টা লাগালি রিসিভার বের করতে।'

প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্যে মুসা বলল, 'জিনিস কি বেশি নিয়েছে?'

'গিয়ে নিজের চোখেই দেখে আয় না।'

পা টিপে টিপে নামতে শুরু করল মুসা। যেন আশঙ্কা আশেপাশেই লুকিয়ে আছে চোর। ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

সামনের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। কোট আর ব্যাগগুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। কেবিনেট থেকে ড্রয়ারগুলো খুলে ফেলে রাখা হয়েছে। ভেতরের জিনিসপত্র সব ঢেলে দিয়েছে কার্পেটের ওপর।

বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে রইল মুসা।

পেছনের লম্বা ঘরটায় এসে ঢুকল। একটা খোলা জানালার ফাঁক দিয়ে ফুরফুর করে ঢুকছে ভোরের হাওয়া।

'ছুঁসনে কিছু।'

ফিরে তাকাল মুসা। মা দাঁড়িয়ে আছেন দরজায়। 'পুলিশ বলেছে কোন কিছুতে হাত না দিতে।'

'দেব না,' মুসা বলল। 'কোন শব্দই তো শুনলাম না। নিচতলায় ঢুকে সারা বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেল ওরা, একটা শব্দ কানে ঢুকল না। ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি!'

'সাবধান থেকেছে, যাতে শব্দ না হয়। যা করার নিচতলায়ই করেছে। ভাগ্যিস ওপরতলায় যায়নি! তাহলে ফকির বানিয়ে রেখে যেতে পারত,' ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন মা। কপাল টিপে ধরলেন।

'মাথা ধরেছে? অ্যাসপিরিন এনে দেব?'

মাথা নেড়ে মা বললেন, 'কতবার তোর বাবাকে বললাম একটা অ্যালার্ম সিসটেম লাগিয়ে দিতে, দিল না...'

'অ্যালার্ম দিয়ে কি হবে? ঘণ্টা শুনলেই চোরেরা পালাত। আসলে দরকার ছিল একটা বাঘা কুত্তার। কি কি চুরি গেছে, দেখেছ?'

'সময় পাইনি। ঘরের অবস্থা দেখেই দৌড়ে গিয়ে তোকে ডাক দিলাম। বোস এখানে। আমি কাপড় বদলে আসি। পুলিশ এলে দরজা খুলে দিস।'

ওপরতলায় চলে গেলেন মা।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল মুসা। কিছু একটা করা দরকার। এ রকম হাত গুটিয়ে রেখে পুলিশের জন্যে অপেক্ষা করার কোন মানে নেই।

হলে এসে ঢুকল মুসা। ওপর দিকে মুখ তুলে চিৎকার করে বলল, 'মা, আমি কিশোরকে ফোন করছি।'

জবাব এল না।

কিছু না বলে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল সে।

*

'পুলিশ কি বলল?' জানতে চাইল কিশোর।

মুসাদের রান্নাঘরে বসে টোস্ট আর কমলার রস খাচ্ছে। মিসেস আমান পাশের ঘরে। ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি আর ইনশিওরেন্স ফার্মকে ফোন করছেন।

'বলল,' জবাব দিল মুসা, 'কাঁচা হাতের কাজ। পেছনের একটা জানালা দিয়ে ঢুকেছে, দরজা দিয়ে বেরিয়েছে। বাড়ি মেরে কাঁচ ভেঙে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানি খুলেছে। খুব সহজ, সাধারণ চুরি। পনেরো মিনিটের বেশি ঘরে ছিল না চোর। ভারী জিনিসগুলো ধরেনি। দামী অ্যানটিকগুলো নিতে পারেনি বোধহয় ভারী বলেই। ছোটখাট দামী কিছু জিনিস নিয়েছে। মা'র হাতব্যাগটাও নিয়ে গেছে। টাকা কমই ছিল ওতে। ক্রেডিট কার্ড আর মূল্যবান কাগজপত্র ছিল।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে পুলিশ?'

'না। রবিবারে নাকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা কাজ করে না। কাল সকালেই চলে আসবে। ততক্ষণ যা যেভাবে আছে, সেভাবেই রাখতে বলে গেছে।'

উজ্জ্বল হলো কিশোরের চোখ। 'গুড। আমাদের সূত্র খুঁজতে সুবিধে হবে।'

'কিন্তু কিছু ছুঁতে তো মানা করে গিয়েছে পুলিশ।'

'ছোঁব না। চোখ দিয়ে খুঁজব। আচ্ছা, আশেপাশে যারা চুরি করেছে, তারাই কি তোমাদের ঘরে ঢুকেছে বলে পুলিশের ধারণা? আমার ধারণা তা-ই।'

'আমারও। পুলিশ এ ব্যাপারে কিছু বলেনি। শুধু বলেছে, যা যা চুরি গেছে একটা লিস্ট করে রেখে দিতে। সেটা আমাকে দিয়ে হবে না। মা আর বাবা কবে কোন্ জিনিস কিনে এনে কোথায় রাখে, আমি খেয়ালই করি না।' কমলার রসের গ্লাসে চুমুক দিল মুসা। 'তাহলে খুঁজবেই?'

পকেট থেকে নোটবুকটা বের করল কিশোর। 'সন্দেহজনক কিছু দেখলে লিখে রাখতে হবে।'

পেছনের জানালাওয়ালা লম্বা ঘরটা থেকে খোঁজা শুরু করল ওরা। বাঁ দিকের পাল্লাটার ওপরের দিকে খানিকটা জায়গার কাঁচ ভাঙা। কার্পেটে কাঁচের টুকরো ছড়িয়ে আছে। উবু হয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগল কিশোর।

'রবিনকে ছাড়াই এ কেসের তদন্ত করছি আমরা,' মুসা বলল, 'ভাবতে কেমন লাগছে না?'

নিচের দিকে তাকিয়ে থেকেই নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'ফোন করব ওকে?'

সোজা হলো কিশোর। 'করা যায়।'

ফোন করতে গেল মুসা। ফিরে এল আধ মিনিটের মধ্যে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে জানাল, 'বাড়ি নেই। আন্টির সঙ্গে কথা বলেছি।' কিশোরের দিকে তাকাল সে, 'কার সঙ্গে বেরিয়েছে আন্দাজ করতে পারো?'

'টম।'

'হ্যাঁ।'

'চলো, বাইরেটা দেখি। পরে সব বলা যাবে রবিনকে।'

'যদি শুনতে চায়।'

কোন সূত্র পাওয়া গেল না।

বাকি সকালটা মুসার আম্মাকে চুরি যাওয়া জিনিসের লিস্ট করতে সাহায্য করল দু'জনে। এর মধ্যেও এমন কিছু পেল না, যেটার সূত্র ধরে 'কে চোর' তার হদিস করা যায়।

*

পরদিন সকালে স্কুলে রবিনের সঙ্গে দেখা হলো দু'জনের।

'সাংঘাতিক কাণ্ড শুরু করেছে তো চোরেরা!' রবিন বলল। 'কাল রাতে বাড়ি ফিরলে মা আমাকে সব বলেছে। রাতেই ফোন করতে চেয়েছিলাম। মা

বলল, অত রাতে করে আর কাজ নেই। মুসা নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। মুসা, বেশি জিনিস নিয়েছে?'

আগের দিন যা যা ঘটেছে, সব রবিনকে জানাল মুসা আর কিশোর।

রবিনের দৃষ্টিকে অনুসরণ করে হঠাৎ ফিরে তাকাল কিশোর। টম দাঁড়িয়ে আছে। নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পেছনে।

টম জিজ্ঞেস করল, 'কিসের কথা বলছ তোমরা?'

'টম,' রবিন বলল, 'কাল মুসাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে।'

তাকিয়ে রইল টম। 'তাই নাকি?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ। শনিবার রাতে।'

'শনিবার!' আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে টম বলল, 'আশ্চর্য!'

'এতে আশ্চর্যের কি হলো? শনিবার রাতে কি চুরি করে না নাকি চোরেরা?' মুসার প্রশ্ন। 'অফ ডিউটি থাকে?'

'না, তা বলছি না···কিন্তু শেষ পর্যন্ত তোমাদের বাড়িতেও চুরি? গোয়েন্দার বাড়িতে। এ জন্যেই অবাক হচ্ছি।'

'এ নিয়ে পাঁচটা চুরি হলো আমাদের পাড়ায়।'

'ঢুকল কি করে? জানালা ভেঙে নাকি?'

'হ্যাঁ। এ ছাড়া ঢোকার আর পথ কই? সদর দরজা তো আর চোরের জন্যে রাতে খুলে রাখে না মানুষ।'

ভ্রূকুটি করল টম, 'না, তা রাখে না।···যাই, কাজ আছে আমার। দেখা হবে।'

'কাল না বললে আজ আমাকে বল ছোঁড়া প্র্যাকটিস করাবে,' রবিন বলল।

'বলেছি। কিন্তু একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে। পরে শেখাব।' হাসল টম। 'টিফিনে দেখা হবে।'

টম চলে গেলে দুই বন্ধুর দিকে ফিরল রবিন। 'ও বলেছে একসঙ্গে অনেকগুলো বল ছোঁড়ার কৌশল শেখাবে আমাকে। ফ্রোটে দেখানোর জন্যে।' সামান্য দ্বিধা করে বলল, 'আমি জানি, ওকে তোমরা পছন্দ করো না। কিন্তু আমি মিশে দেখেছি, অত খারাপ নয় ও।'

কিশোর বা মুসা জবাব দেয়ার আগেই ঘণ্টা পড়ল। যে যেখানে ছিল, দ্রুত ক্লাসের দিকে রওনা হলো ছাত্ররা। তিন গোয়েন্দাও পা বাড়াল।

তেরো

পরদিন আরেকটা চুরির খবর পাওয়া গেল।

ওদেরই স্কুলের একটা ছেলে, জনি বিয়াভাদের বাড়িতে। টিফিনের সময় ওর সঙ্গে কথা বলল তিন গোয়েন্দা।

ব্যাপারটা নিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে যেন মুখিয়েই ছিল জনি। কিশোরের প্রশ্নের জবাবে বলল, 'অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো, কিভাবে ঢুকেছে,

কিছুই বোঝা যায়নি। রাতে শব্দ শুনে আব্বা নিচে নেমে দেখতে যায়। নিশ্চয় তাকে নামতে শুনেছিল চোর। সামনের দরজা দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যায়। কিছু নিতে পারেনি।'

'জানালা-টানালা খোলা ছিল? কাঁচ ভাঙা?' জানতে চাইল কিশোর।

'নাহ্। পুলিশের ধারণা, আমার দাদু সামনের দরজাটা খুলে রেখেছিল। রাতে হেঁটে এসে লাগাতে ভুলে গিয়েছিল। এই ভুলে যাওয়াটা দাদুর একটা রোগ। ডাক্তার দেখিয়ে সারাতে না পেরে যোগাযোগ করেছিল এক ফেইথ হীলার মহিলার সঙ্গে...'

'সারালিন জুবের?'

'হবে হয়তো। আমি জানি না। আরও একটা রোগ আছে দাদুর। বাত। ফেইথ হীলার মহিলা নাকি বাতও সারাতে পারে। দাদু তাকে বাড়ি আসতে অনুরোধ করেছিল।'

'মহিলা এসেছিল?'

'হ্যাঁ...'

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ল। আর কোন কথা হলো না।

বিকেলে ছুটির পর বল-প্র্যাকটিসের কথা বলে তাড়াহুড়া করে চলে গেল রবিন। গেট দিয়ে বেরিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল মুসা আর কিশোর।

আনমনে বলল কিশোর, 'ভুল করে দরজা খুলে রাখার ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। বড় বেশি কাকতালীয়।'

'জনিদের বাড়ির কথা বলছ?'

'হ্যাঁ।'

'দরজা খোলা না পেলে ঢুকল কি করে?'

'চাবি দিয়ে দরজা খুলে নিয়েছে।'

'চাবি পেল কোথায়?'

'সেটাই বুঝতে পারছি না। তবে একটা জিনিস বুঝে গেছি, দরজা দিয়েই ঢোকে চোর। তোমাদের পাড়ায় যতগুলো চুরি হয়েছে, একটা জিনিস কমন–জানালার কাঁচ ভাঙা পাওয়া যায়। কেবল জনিদের বাড়িতে পাওয়া যায়নি। এর মানে কি? জনির বাবা শব্দ শুনে দেখতে যাওয়ায় কিছু না নিয়ে পালাতে বাধ্য হয় চোর। সময় পায়নি। সময় পেলে চুরি করে বেরিয়ে যাওয়ার আগে একটা জানালার কাঁচ ভেঙে দিয়ে যেত। এটা করে রেখে যায় পুলিশের নজর অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্যে। যাতে পুলিশ ভাবে, চোর জানালা দিয়ে ঢুকেছিল। নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে।'

'সেই কারণটা কি?'

'জানি না। জানলে, আমার বিশ্বাস, অনেক প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাব।'

'কিন্তু দরজা দিয়ে যে ঢোকে বলছ, খোলে কিভাবে তালা? আমাদের দরজায় ডাবল লক লাগানো। বাইরে থেকে চাবি ছাড়া অন্য কোন কিছু দিয়েই খোলা সম্ভব নয়। আমাদের চাবিটা খোয়া যায়নি। চুরির পরেও দেখেছি। আছে।'

প্রশ্নটার জবাব দিতে পারল না কিশোর।

পরদিন সকালের কাগজে আরেকটা চুরির খবর বেরোল। রাতে উইলো ডেল নামে এক মহিলার বাড়িতে চুরি হয়েছে। মুসাদের পাড়াতেই বাড়ি।

তার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে রইল কিশোর। স্কুল ছুটির পর বেরোতে যাবে, ডেকে পাঠালেন মিস ওয়ান্ডার। ক্যামকর্ডারটা নিয়ে খানিকক্ষণ প্র্যাকটিস করতে বললেন কিশোরকে। কোন গোলমাল থাকলে আগেই সেরে নিতে বললেন, যাতে উৎসবের দিন কোন ঝামেলা না বাধায় যন্ত্রটা।

রবিন চলে গেল। মুসা অপেক্ষা করতে লাগল কিশোরের জন্যে। প্র্যাকটিস শেষ করে ক্যামকর্ডারটা স্কুলের স্টোরে রেখে বেরিয়ে এল কিশোর। দু'জনে মিলে রওনা হলো মিস উইলো ডেলের বাড়িতে।

মহিলা মাঝবয়েসী। কথা বলে জানা গেল, সে-ও বাতের রোগী। সারালিনের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাকে বাড়িতে ডেকে এনেছিল রোগ সারানোর জন্যে। একটা মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেল মিস ডেলের কাছে। তাকে চিকিৎসা করার সময় নাকি নিজের হাতে একটা চাবি চেপে ধরে রেখেছিল সারালিন।

'চাবি কেন?' জানতে চাইল কিশোর।

'রোগীর ব্যবহার করা জিনিস ধরে মন্ত্র পড়লে নাকি রোগীর ভেতরে বিশ্বাসটা তাড়াতাড়ি প্রবেশ করে, জোরাল হয়।'

'তারপর?'

'একটা জিনিস যখন চাইল, হাতের কাছে কলম দেখে সেটা দিতে চেয়েছিলাম। সারালিন বলল, ধাতব জিনিস হলে ভাল হয়। নিজে থেকেই বলল চাবিটার কথা।'

'সদর দরজার চাবি নাকি?'

'তুমি কি করে জানলে?' পাল্টা প্রশ্ন করল মিস ডেল।

উত্তেজনায় বুক কাঁপছে কিশোরের। 'অনুমান।'

মাথা ঝাঁকালেন মিস ডেল। 'হ্যাঁ, সদর দরজার চাবি।'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? আমার ভেতরে বিশ্বাস ঢুকিয়ে চাবিটা ফেরত দিয়ে চলে গেল সারালিন।'

'সত্যি বিশ্বাস ঢুকেছে আপনার মধ্যে? ব্যথা কমেছে?'

'বিশ্বাস ঢুকেছে কিনা জানি না। কিন্তু কই, ব্যথা তো যাচ্ছে না। সাময়িক একটু আরাম হয়েছিল অবশ্য। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যখন বিড়বিড় করে কথা বলছিল, মাথার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল আমার-কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিলাম। ও চলে যেতেই সব স্বাভাবিক হয়ে গেল আবার। ব্যথা সেই আগের মত। কয়েকবার চিকিৎসা নিলে হয়তো পুরোপুরি সারবে!'

বাড়ি ফিরে ডনকে দেখতে পেল না কিশোর। কোথাও তার সাড়াশব্দও পেল না। ডিনারের সময়ও যখন টেবিলে এল না, অবাক লাগল। চাচীকে জিজ্ঞেস করল, 'ডন কই?'

'ওর ঘরে। স্কুল থেকে ফিরে সেই যে ঢুকেছে, আর বেরোয়নি। কি করছে খোদাই জানে। ডাকতে গিয়েছিলাম, বলল পরে খাবে।'

কৌতূহল হলো কিশোরের। উঠে দাঁড়াল।

'তুই আবার যাচ্ছিস কোথায়?'

'ডন কি করছে দেখে আসি।'

ওপরে উঠে দরজায় টোকা দিল কিশোর।

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কে?'

'আমি।'

'দরজা খোলা।'

পাল্লা ঠেলে খুলে ভেতরে পা রাখল কিশোর।

গভীর মনোযোগে প্লাস্টার অভ প্যারিস দিয়ে নৌম বানাচ্ছে ডন। সেদিন মেরিচাচীর বকা খাবার পর আর তাঁর কোন জিনিস ছোঁয়নি। ইয়ার্ড থেকে খুঁজে খুঁজে পুরানো পাত্র আর হাতা বের করেছে। সেগুলো দিয়ে কাজ করছে নিজের ঘরের মেঝেতে বসে।

ক্রমাগত প্র্যাকটিস করতে করতে নৌম বানানোয় সফলতা এসেছে ডনের। সদ্য বানানো প্লাস্টিকের দুটো নিখুঁত নৌম বসে আছে ওর পাশে, মেঝেতে।

'কেমন হলো?' নৌম দুটো দেখিয়ে গর্বের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ডন।

'ভাল। খুব ভাল।'

'আরও সুন্দর হবে, রঙ দিয়ে যখন চোখ, ভুরু এঁকে দেব।'

'হুঁ।' চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগল কিশোরের কৌতূহলী চোখ। অদ্ভুত দেখতে প্লাস্টিকের একটা বাতিল জিনিস দেখিয়ে জানতে চাইল, 'এটা কি?'

'আমার হাতের ছাপ। নৌম বানাতে গিয়ে গবেষণা কম করিনি। দেখেছি, অর্ধেক শুকিয়ে আসা প্লাস্টিকে যদি হাত চেপে ধরা হয়, তাতে স্পষ্ট ফুটে ওঠে হাতের ছাপ। শক্ত হয়ে গেলেও তাতে ছাপটা থেকে যায়। যতদিন ইচ্ছে রেখে দিতে পারো। বড় হয়ে নিজের হাতের ছাপ দেখে নিজেই অবাক হতে পারবে, ছোটবেলার কথা মনে করে মনে মনে হাসতে পারবে–এত ছোট ছিল আমার হাত!'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছাপটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ডন, তুমি একটা জিনিয়াস! বুঝে গেছি, কিভাবে কাজটা করে ওরা!' ডনের সাদা পাউডার মাখা নোংরা হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে বলল, 'থ্যাংক ইউ! অনেক ধন্যবাদ তোমাকে!'

দরজার দিকে ছুটল কিশোর। যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে বিড়বিড় করল ডন, 'বেশি খাটাতে খাটাতে মাথাটা পুরোপুরিই গেছে ওর!'

ডিনারের পর মুসাকে ফোন করল কিশোর।

'কে, মুসা? এক্ষুণি চলে এসো।'

'এখন? কি ব্যাপার?'

'এসো। এলেই জানতে পারবে।'

তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে এসে বসল কিশোর। আধঘণ্টা পর মুসার সাইকেলের বেল কানে এল।

সাইকেলটা বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকল মুসা। 'কি হয়েছে? এত জরুরী তলব?'

'কি করে চাবি জোগাড় করে ওরা, জেনে গেছি,' কোন ভূমিকা না করে বলল কিশোর।

'খাইছে! বলো কি?'

'হ্যাঁ। বসো। দেখাচ্ছি।' হাত বাড়াল কিশোর। 'দাও তো তোমার সাইকেলের চাবিটা।'

আস্তে বাড়িয়ে দিল মুসা।

চাবিটা নিতে নিতে কিশোর বলল, 'তোমার চোখে কি পড়েছে?'

চোখ মিটমিট করল মুসা। হাত দিয়ে ডলল। 'কই, কিছু না তো!'

'চোখ কচকচ করছে না?'

'না!' আবার চোখ ডলল মুসা।

'ও, তাইলে আমি ভুল দেখেছি।'

কিশোরের এ ধরনের কথায় অবাক হলো মুসা।

চাবিটা ফিরিয়ে দিল কিশোর।

'কি করছ তুমি? চাবিটা নিলে, আবার ফেরত দিলে!'

'কাজ হয়ে গেছে।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'প্লীজ, কিশোর, তোমার মঙ্গল গ্রহের ভাষাটা বাদ দাও। সহজ করে বলো, কি বলতে চাও।'

ডান হাতটা চিত করল কিশোর। প্লাস্টার অভ প্যারিসের একটা নরম দলা আটকে রয়েছে তালুতে। তাতে স্পষ্ট বসে গেছে মুসার চাবিটার দাগ।

হেসে মাথা দোলাল কিশোর, 'এবার বুঝলে তো?'

একবার কিশোরের হাতের দিকে একবার মুখের দিকে তাকাতে লাগল মুসা। 'না, বুঝিনি!'

'এটা প্লাস্টার অভ প্যারিস। হাতের তালুতে আটকে রেখেছিলাম। তোমার কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে চোখে কিছু পড়েছে বলে তোমাকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিলাম, মন আর চোখ অন্য দিকে সরিয়ে দিয়েছিলাম, যাতে আমার হাতের দিকে না তাকাও। এই সুযোগে চাপ দিয়ে চাবিটার ছাপ ফেলে দিয়েছি প্লাস্টার অভ প্যারিসে। এই ছাপের মাপ নিয়ে সহজেই যত খুশি ডুপ্লিকেট চাবি

বানিয়ে ফেলা যায়। তোমার সাইকেলটা চুরি করা কি আর তখন কঠিন হবে?'

বিমূঢ়ের মত মাথা নাড়তে নাড়তে জবাব দিল মুসা, 'মোটেও না। তারমানে সারালিন...'

'হ্যাঁ। রোগীর চাবি হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়া কিংবা অন্যকিছু পড়ার ছুতোয় তাকে অন্যমনস্ক করিয়ে রাখে সারালিন। চাবির ছাপ নিয়ে যায়। রাতে তার দলের লোকদের পাঠায় চুরি করার জন্যে।'

'উফ্, জঘন্য মহিলা! কতভাবে যে সর্বনাশ করছে লোকের! ওকে এক্ষুণি ধরা দরকার। পুলিশকে ফোন করছ না কেন?'

'হাতেনাতে ধরতে চাই চোরগুলোকে। একটা ফাঁদ পাততে হবে।'

'কি করে?'

'সারালিনের ওপর নজর রাখতে হবে। দেখব, এরপর কার বাড়িতে রোগ সারাতে যায় সে। ও বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকে প্রতি রাতে ওই বাড়ির ওপর চোখ রাখব, লুকিয়ে থেকে, যতক্ষণ না চোর আসে। দরকার হয় পুলিশকে জানিয়েই যাব পাহারা দেয়ার জন্যে।'

'হুঁ! কিন্তু আজ তো আর হবে না। কালও না। কাল উৎসব।'

'ফ্লোটের পর থেকে পুরোদমে পেছনে লাগব সারালিনের। এখন তো শিওর হয়ে গেছি, চোরের দলের লোক সে। কিভাবে চাবি বানায়, তাও জেনে গেছি। ওদের ধরা আর কঠিন হবে না। এখন কেবল সময়ের অপেক্ষা।'

চোদ্দ

ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল কিশোরের, আজ উৎসবের দিন। বিছানা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল জানালার কাছে।

চমৎকার দিন। ফেসটিভ্যালের জন্যে উপযুক্ত। ঝলমলে রোদ। পরিষ্কার নীল আকাশ। ইতিমধ্যেই গরম হয়ে উঠেছে বাতাস। ভোরের কনকনে ঠাণ্ডাকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে আরম্ভ করেছে।

তাড়াতাড়ি গোসল সেরে, কাপড় পরে নিচে নামল। নাস্তা সেরে ফোন করল মুসাকে। মুসা জানাল, স্কুলে রওনা হচ্ছে। ওখানে দেখা হবে।

রবিনকে ফোন করল কিশোর। বার বার চেষ্টা করেও লাইন পেল না। বোধহয় টেলিফোন নষ্ট। থাক, স্কুলে গেলেই দেখা হবে। বেরিয়ে পড়ল সে।

স্কুলে পৌছে দেখল, কার পার্ক বোঝাই হয়ে গেছে গাড়িতে। অনেকেই তাদের উৎসবের পোশাক পরে ফেলেছে। গেটের কাছে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে রামধনু রঙের স্কুল ফ্লোটটা। চকচকে রঙিন কাগজে রোদ চমকাচ্ছে। অপূর্ব লাগছে দেখতে। ওটার পেছনে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত মিউজিক প্র্যাকটিস করছে বাদকেরা।

গেটেই মুসার সঙ্গে দেখা হলো কিশোরের। ওর অপেক্ষাতেই দাঁড়িয়ে

আছে মুসা।

ওদের দেখে এগিয়ে এলেন মিস ওয়ান্ডার। 'এসেছ। রবিন কোথায়?'

'আসেনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল কিশোর।

'না। এত দেরি করছে!...আমি জানতাম, শেষ মুহূর্তে একটা ভজঘট পাকাবে! এইই হয়। রানী না পেলে এখন ফ্লোট ছাড়ি কি করে?'

'ভাববেন না, ম্যাডাম। চলে আসবে। রবিন অত কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়।'

কিশোরের কথায় উদ্বেগ কমল না তাঁর। তবে আর কিছু বললেন না।

মিস্টার উইলিয়ামসের গাড়ির পেছনে বাক্স তুলছে ডন। চ্যারিটি স্টলে বিক্রির জিনিস।

ওকে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'রবিনকে দেখেছ?'

মাথা নাড়ল ডন।

'টমকে?'

আবার মাথা নাড়ল ডন।

'ডন,' ডাক দিলেন মিস্টার উইলিয়ামস, 'কাজটা শেষ করবে, নাকি শুধু কথাই বলবে!'

'এই যে, হয়ে গেছে, স্যার,' জবাব দিল ডন। কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, 'দিলে তো একটা বকা শুনিয়ে। আমি কোন কথাই বললাম না, অথচ স্যার বলছেন...'

'সরি,' বলে মুসার কাছে সরে এল কিশোর। 'ডনও দেখেনি ওকে।'

'আসেনি, তাই দেখেনি,' মুসা বলল। 'কিন্তু এতক্ষণ কি করছে ও?'

সময় যাচ্ছে। ফ্লোট ছাড়ার সময় হয়ে গেল। রবিনের দেখা নেই।

স্কুলে ঢুকল দু'জনে। ভাঁড়ের পোশাক পরে নিল মুসা। স্টোর থেকে ক্যামকর্ডারটা বের করে আনল কিশোর। ঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে নামতেই দেখা হয়ে গেল মিস ওয়ান্ডারের সঙ্গে। রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন তিনি।

'কোথায় গেছে কিছু বুঝতে পারছ?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'সকালে বেরোনোর আগে ফোনে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। ধরেনি। নিশ্চয় ফোন নষ্ট। রবিনেরও নিশ্চয় কিছু হয়েছে। অসুখ-টসুখ।'

'হুঁ। গাড়িতে ওঠো। বাড়ি থেকে নিয়ে আসব।' ঘড়ি দেখলেন মিস ওয়ান্ডার। 'এতক্ষণে সব রেডি করে ফেলার কথা ছিল। কি যে ঘটবে বুঝতে পারছি না!'

রবিনদের রকি বীচের বাড়িতে পৌঁছতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। গেটের ভেতর ঢুকে দৌড়ে এসে সদর দরজার সামনে দাঁড়াল কিশোর আর মুসা। বেল বাজাল কিশোর। খুলে দিলেন রবিনের আম্মা।

'রবিনকে নিতে এলাম,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'যেতে দেরি করছে কেন?'

অবাক চোখে ওদের দিকে তাকালেন মিসেস মিলফোর্ড। 'ও তো চলে

গেছে। দশ মিনিট আগে তুলে নিয়ে গেছে ওকে।'

'নিয়ে গেছে?' কিশোরও অবাক।

'হ্যাঁ। ওই যে ছেলেটা, কি যেন নাম...টম। ওর বাবার সঙ্গে এসেছিল। স্কুলে পৌঁছায়নি এখনও রবিন?'

'আমরা দেখলাম না বলেই তো নিতে এসেছি।'

'নিশ্চয় ট্র্যাফিক জ্যাম। আজকাল ঘর থেকে বেরোনোই দায় হয়ে পড়েছে।'

বাইরে গাড়িতে বসে আছেন মিস ওয়াল্ডার। তাঁর কাছে ফিরে এল দুই গোয়েন্দা।

'আমার ভাল মনে হচ্ছে না,' গাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে বলল কিশোর। 'স্কুলে গিয়ে যদি রবিনকে না দেখি, পুলিশকে ফোন করতেই হবে।'

স্কুলে ফিরে দেখল, ফ্লোট চলে গেছে। ড্রাইভওয়েতে কয়েকটা ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে তখনও।

'এই, রবিন এসেছিল?' ওদের জিজ্ঞেস করলেন মিস ওয়াল্ডার।

একটা মেয়ে এগিয়ে এল। 'ফ্লোটে উঠতে দেখলাম তো ওকে। পোশাক পরেই উঠেছে।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মিস ওয়াল্ডার। আস্তে করে কপালটা নামিয়ে দিলেন স্টীয়ারিঙে। 'ওহ্, খোদা, বাঁচালে!' কিশোর আর মুসার দিকে ফিরে বললেন, 'চলো। ওদের কাছে। ধরে ফেলা যাবে, অসুবিধে হবে না।'

মুসার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন আবার, 'ভাঁড়ের পোশাকটা খুব ভাল হয়েছে তোমার। দেখি, মুখটা বাড়াও তো, রঙটা একটু মেরামত করে দিই।'

হ্যান্ডব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে মুসার গালে দু'তিনটে পোঁচ মারলেন তিনি। দেখতে দেখতে বললেন, 'হ্যাঁ, এবার হয়েছে। চমৎকার।' লিপস্টিকটা মুসার হাতে দিয়ে বললেন, 'রেখে দাও। লাল রঙটাই আসল। উঠে গেলেই লাগাবে।'

গাড়ি চালালেন তিনি। রাস্তার দুই ধারে তিনকোনা নিশানের সারি। শহরের মাঝখানটাও ঘিরে ফেলে আলাদা করে দিয়েছে পুলিশ, যাতে গাড়ি ঢুকতে না পারে।

সবখানে মানুষ আর মানুষ। যে দিকেই তাকানো যায়, লোকের ভিড়। এত লোককে রাস্তায় সচরাচর দেখা যায় না। সাধারণ সময়ে রাস্তাগুলো দেখলে মনেই হয় না ছোট্ট শহরটাতে এত লোকের বাস।

গাড়ি পার্ক করার জন্যে পেছন দিকের একটা খালি রাস্তা খুঁজতে লাগলেন মিস ওয়াল্ডার।

খানিকক্ষণ চেষ্টা করে নিরাশ হয়ে বললেন, 'নাহ্, হবে না এখানে। শোনো, তোমরা নেমে যাও। মিছিলে যোগ দাওগে। আমি অন্য কোনখানে গাড়িটা রেখে আসছি। রবিনকে বলবে, ও যা করেছে, আরেকটু হলে হার্ট-অ্যাটাক হয়ে যেত আমার।'

পনেরো

ভিড়ের চাপে ফ্লোটের কাছে এগুনো কঠিন হয়ে গেল দুই গোয়েন্দার জন্যে। গুঁতোগুঁতি করে ভিড় থেকে যা-ও বা বেরোল, কোথা থেকে সামনে এসে দাঁড়াল ভ্রাম্যমান হট-ডগ আর আইসক্রীমের ভ্যান। ছোটাছুটি করে এল ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। ওদের কাছে সরে এল এক বেলুনওয়ালা। বেলুন বিক্রি করতে গিয়ে ভিড় আরও বাড়িয়ে দিল।

'ঘেমে গেছি,' মুসা বলল। 'একটা আইসক্রীম খেয়ে নিই।'

'সময় নেই,' বাধা দিল কিশোর। 'ওই যে, মিছিল আবার চলা শুরু করেছে।'

সামনের ফ্লোটগুলো ধীরে ধীরে আবার চলতে শুরু করেছে রাস্তা ধরে। জোরাল বাজনার শব্দ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে দেয়ালে দেয়ালে। তার সঙ্গে মিশেছে উল্লসিত কোলাহল আর করতালি। উৎসবের আনন্দে যেন হাসছে ব্যানারগুলো। সামনের ফ্লোটের ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল হলুদ ফোলানো পোশাক পরেছে, লাগছে মুরগীর ছানার মত।

পরের ফ্লোটটা সাজানো হয়েছে ভিকটোরিয়ান স্টাইলে। ছেলেমেয়েরা পরেছে ওই আমলের পোশাক। বড় করে ব্যানার লাগিয়েছে, তাতে লেখা রকি বীচ অ্যামেচার ড্রামাটিকস সোসাইটি।

সামরিক বাহিনীর বিউগল আর বাজনা শোনা গেল। ফিরে তাকিয়ে দুই গোয়েন্দা দেখল, চমৎকার ভাবে মার্চ করে এগিয়ে আসছে কিশোর সেনাবাহিনীর একটা খুদে দল। এটাও আরেকটা ফ্লোট।

গায়ে গায়ে লেগে থাকা দর্শকদের ভিড় ঠেলে অনেক কষ্টে বেরিয়ে গেল মুসা। এগিয়ে গেল ধীর গতিতে এগোনো ফ্লোটের মিছিলের দিকে। নিজেদের ফ্লোটটা খুঁজছে। পেছনে তাকিয়ে কিশোরকে বলল চিৎকার করে, 'পরে দেখা হবে। আমি ফ্লোটে যাচ্ছি।'

কাঁধের ওপর ক্যামকর্ডার তুলে নিল কিশোর। সবচেয়ে সামনের ফ্লোটটার ওপর ফোকাস করল। ভিউ ফাইন্ডারে লাফ দিয়ে যেন উঠে এল অতি খুদে খুদে হলুদ মুরগীর ছানারা। পাশ থেকে কনুই দিয়ে গুঁতো মারল কে যেন। চোখের সামনে থেকে সরে গেল ছানাগুলো।

প্রচুর লোক। ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি করছে। তাদের কাছ থেকে না সরলে ছবি তুলতে পারবে না। সামান্য সামনে এগোল কিশোর। আবার ফোকাস করল ফ্লোটের ওপর। ড্রামাটিকস সোসাইটির ভাল একটা শট নেবার ইচ্ছে। হাসি হাসি মুখগুলো ফুটে উঠেছে ভিউ ফাইন্ডারে। তবে শট ভাল হবে না। সুবিধেমত একটা জায়গার জন্যে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে।

মোড়ের দিকে এগোল। মেইন রোড ধরে এগিয়ে আসা পুরো মিছিলটাকে

চোখে পড়ছে এখান থেকে। সামরিক বাহিনীর বিউগল আর ড্রামের বিকট শব্দে কান ঝালাপালা। আগে আগে চলেছে একজন ড্রাম-মেজর।

চমৎকার একটা শট নিল কিশোর। মনে মনে সন্তুষ্ট হলো। আরও সামনে এগিয়ে গেল সে, তবে মোড়ের কাছ থেকে সরল না। মিছিলের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে থাকল।

দূরে, মিছিলের বেশ অনেকটা পেছনে নিজেদের ফ্লোটের গাছ চোখে পড়ল তার। খানিকটা ওপরে যদি ওঠা যেত, আরও ভাল করে শট নেয়া যেত। পেছনে একপাশে লাইটপোস্টের নিচে একটা ওএইস্ট পেপার বিন দেখে কাছে এগিয়ে গেল। খুব সাবধানে ভারসাম্য রক্ষা করে ওপরে উঠল ওটার। একহাতে থামটা পেঁচিয়ে ধরেছে। ক্যামেরাটা ঝুলছে গলায়।

হ্যাঁ, হয়েছে। এখান থেকে অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে স্কুলের ফ্লোটটা। রবিনকে দেখা গেল। রামধনু রঙের পোশাক আর মুখে চকচকে সান মাস্ক পরে ফ্লোটের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে রঙিন বল নিয়ে লোফালুফি করে যাচ্ছে ভোজবাজির দক্ষ খেলোয়াড়ের মত। বলগুলো ছুঁড়ে দিয়ে নিখুঁত ভাবে ধরে ফেলছে একের পর এক, একটিবারও মিস হচ্ছে না। ভালমত প্র্যাকটিস করেছে, বোঝা যায়।

আবার ক্যামেরা তুলে জুম করল কিশোর। ভিউ ফাইন্ডারে ফুটে উঠল নাচতে নাচতে এগিয়ে যাওয়া মরিস-ড্যান্সারদের; তাদের পেছনে জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ পরা দলটা হেলেদুলে চলেছে। কেউ কেউ পরেছে মধ্যযুগীয় পোশাক। কেউ বুড়ো, কেউ ছোট; বুড়োরা আসলে বুড়ো নয়, বুড়ো সেজেছে।

হেসে ফেলল কিশোর। ভিউ ফাইন্ডারে দেখা দিয়েছে ভাঁড়, বেলুন লাগানো লাঠি দিয়ে সমানে পিটিয়ে চলেছে যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই।

গাছ লাগানো ফ্লোটে নজর ফেরাল কিশোর। বল ছুঁড়ে দেয়া রানীর ওপর স্থির হলো লেন্স।

আগের চেয়ে দ্রুত বল ছুঁড়ছে রবিন। আলাদা করে চেনাই যাচ্ছে না আর এখন বলগুলোকে। কেবল তিনটে রঙের ঝিলিক। নিখুঁত ভাবে ছুঁড়ছে আর ধরছে। একটিবারের জন্যে ফসকাচ্ছে না। একটিবারের জন্যে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে না।

জুম বাটনটা টিপে ছবি যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে আসার চেষ্টা করল কিশোর। রানীর হাত দুটোর ওপর ফোকাস করল–এক হাতের আঙুল স্প্রিঙের মত ছেড়ে দিচ্ছে বলগুলোকে, অন্য হাত কাপের মত হয়ে লুফে নিচ্ছে। পাতলা, রোগাটে হাত। রোগাটে আঙুল। একটা আঙুলে আংটি।

রবিন আংটি পরে না!

মুখোশের ওপর ফোকাস করল কিশোর। চকচকে সোনালি সূর্যটার নিচে কার মুখ লুকানো রয়েছে বলা অসম্ভব। রঙিন পোশাকের আড়ালে কার শরীর লুকিয়ে আছে, তা-ও বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু আর যে-ই হোক, রবিন নয়, নিশ্চিত হয়ে গেছে সে। বুকের মধ্যে

কাঁপুনি শুরু হয়েছে।

ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে মুসাকে খুঁজল কিশোরের চোখ।

রাস্তার ওদিকটায় পুলিশের বেষ্টনী নেই। পেছনের দর্শকদের চাপে সমান থাকতে পারছে না সামনের সারি, ভেঙে এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। সবাই সামনে আসতে চায় ভাল করে দেখার জন্যে।

ভাঁড়ের লাল বেলুনগুলো চোখে পড়ল কিশোরের। রাস্তার ধারে দর্শকদের কাছাকাছি চলে গেছে মুসা। বেলুন দিয়ে বাড়ি মারছে দর্শকদের মাথায়। হেসে অস্থির হচ্ছে ওরা। ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল একটা হাত। কব্জি চেপে ধরল মুসার। টেনে সরিয়ে নিল একপাশে। এক মুহূর্ত থামল। তারপর আবার টেনে নিয়ে চলল। চলে গেল প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে।

ওদের সঙ্গে সঙ্গে কিশোরও সরিয়ে ফেলেছে ক্যামেরার চোখ। মুসার পাশ ঘেঁষে আছে লোকটা। চেপে রয়েছে গায়ের ওপর।

লোকটা কন ডিকি। কিছু বলছে মুসাকে। মাথা নাড়ছে মুসা। ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করল।

বিন থেকে লাফ দিয়ে নেমে ওদের দিকে দৌড় দিল কিশোর।

স্কুলের ফ্লোটটার পাশ কাটিয়ে এল। লোকের চিৎকার, হাসাহাসি, বাজনার শব্দে কানে তালা লাগার জোগাড়।

মুসাকে দেখতে পেল না আর কিশোর। ফ্লোট, নেচে নেচে এগুনো ছেলেমেয়ের দল, জন্তু-জানোয়ারের মুখোশ ভিউ ফাইন্ডারে ফুটছে আর সরছে। কিন্তু মুসা নেই।

চোখের সামনে থেকে ক্যামেরা সরিয়ে তাকাল সে। জনতার মাথার ওপর দিয়ে দেখার চেষ্টা করল।

ওই যে! অসংখ্য মাথার ওপর বাতাসে কাঁপছে একগুচ্ছ লাল বেলুন। কিন্তু মুসাকে চোখে পড়ল না।

ভিড় ঠেলে এগোনোর চেষ্টা করল সে।

কঠিন একটা হাত তার বাহু ধরে ঠেলে ফেলে দিল পেছনে। সরিয়ে দিল বেলুনগুলো থেকে দূরে।

কে সরাল দেখার জন্যে ফিরে তাকাল। চোখে পড়ল একটা হরিণের মুখোশ। মুখোশের নিচে কার মুখ রয়েছে দেখতে পেল না। ফুটো দিয়ে চোখজোড়া কেবল দেখা যাচ্ছে।

হেসে উঠল একটা কণ্ঠ। আবার হাত ধরে টান মারল আরেকজন। চিৎকার করে বলল, 'কিশোর, এসো আমাদের সঙ্গে।'

'ছাড়ো! ছাড়ো!'

'আরে, এসো না। খালি কি ছবিই তুলবে নাকি?' হাসতে হাসতে বলল কণ্ঠটা।

'আহ্, ছাড়ো না!' মোচড় দিয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর। কাঁধ দিয়ে ঠেলা মারতে মারতে ঢুকে পড়ল দর্শকের ভিড়ে। বিরক্ত হয়ে চেঁচাতে লাগল দর্শকরা। বকাবকি করতে লাগল ওকে।

থামল না কিশোর। মাথার ওপরে এখনও দেখা যাচ্ছে লাল বেলুনগুলো। তিল তিল করে এগিয়ে চলল ওগুলোর দিকে।

চাপ কিছুটা কমল অবশেষে। মূল ভিড়টা থেকে বেরিয়ে এসেছে সে। বোতলের মুখের ছিপির মত ছিটকে বেরোল বাইরে; উপুড় হয়ে পড়তে পড়তে বাঁচল। একটা দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। চোখ খুঁজছে বেলুনগুলোকে।

চারপাশে ঘিরে আছে হাসিখুশি মুখগুলো। হাসছে, হুল্লোড় করছে, আইসক্রীম আর ক্যান্ডি খাচ্ছে।

কিন্তু লাল বেলুনগুলোকে চোখে পড়ল না ওর।

ষোলো

ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল কিশোরের। আবার চোখে পড়ল বেলুনগুলো। যে সাইড স্ট্রীটটাতে বেরিয়ে এসেছে, সেটাতেই কিছুদূরে দাঁড়ানো একটা আইসক্রীম ভ্যানের অন্যপাশে দর্শকদের মাথার ওপর।

দৌড় দিল সে। এঁকেবেঁকে, রাস্তায় দাঁড়ানো মানুষগুলোর পাশ কেটে। হৃৎপিণ্ডটা উঠে এসেছে যেন গলার কাছে, উদ্বেগে কেমন ঘোলা হয়ে গেছে মাথার ভেতরটা।

ভিড় ঠেলে এগুলো বেলুনগুলোর কাছে।

হতাশ হলো। ছোট একটা ছেলে একগুচ্ছ লাল বেলুন তুলে রেখেছে মাথার ওপর।

মুসা ভেবে ছুটে এসেছিল কিশোর। ধাক্কার চোটে এসে পড়ল ছেলেটার গায়ে। তার বেলুন বাঁধার সুতোয় হাত লাগল। টান লেগে ছেলেটার হাত থেকে ছুটে গেল সুতোটা। লাফ দিয়ে আকাশে উঠে গেল বেলুন। চিৎকার করে উঠল ছেলেটা।

'সরি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল কিশোর। 'খুবই দুঃখিত আমি। আমি ভেবেছি...'

আবার ভিড় ঠেলে পিছিয়ে এল সে। আইসক্রীম ভ্যানটার পাশ কাটিয়ে এল। চারদিকে বেলুনের ছড়াছড়ি। লাল, হলুদ, নীল, সবুজ বেলুন, হাসিখুশি মানুষের মুখ আঁকা বেলুন, হৃৎপিণ্ডের মত করে তৈরি রূপালী রঙ করা বেলুন। বেলুন আর বেলুন। বেলুনের ঝাঁক নাচানাচি করছে মাথার ওপর।

দূরে এক ঝলক লাল রঙ চোখে পড়ল। রাস্তাটার শেষ মাথায়। দেখতে না দেখতেই হারিয়ে গেল পথের মোড়ে।

সেদিকে দৌড় দিল কিশোর। ধাক্কা দিয়ে সামনে থেকে মানুষজন সরিয়ে পথ করে নিতে লাগল। অবাক চোখে তাকাচ্ছে সবাই। গলায় ঝোলানো ভারী ক্যামকর্ডারটা বাড়ি মারছে পিঠে, কোমরে। গতি কমিয়ে দিচ্ছে তার।

মোড়ের কাছে এসে দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে যেন থেমে গেল সে।
রাস্তায় অলস ভঙ্গিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে একটা বেলুন। লাঠির মাথায় বাঁধা লাল বেলুন।

খুব আনন্দে আছে মুসা।
ভাঁড়ের পোশাক আর মুখে রঙ মেখে লোকের সামনে আসার অস্বস্তিটা কেটে যেতেই মজা পাওয়া শুরু করেছে সে। স্কুল-ফ্লোটের আশেপাশে ছোটাছুটি করে লোকের মাথায়, গায়ে বাড়ি মারছে। চমকে উঠছে লোকে। গাল দেয়ার জন্যে ফিরে তাকিয়ে সামনে ভাঁড় দেখে থমকে যাচ্ছে। হেসে উঠছে মুসা। নতুন শিকারের আশায় তাকাচ্ছে চারদিকে। একবার যাকে মেরেছে তাকে আর দ্বিতীয়বার মেরে মজা নেই।
বাজনাটা সংক্রামক। তালে তালে আপনাআপনি পা উঠে যায়। এক জায়গায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তারও উঠছে।
দর্শকদের সারির দিকে ছুটে গেল সে। বেলুন বুলিয়ে দিল তাদের মাথায়।
হাতটা বেরিয়ে এল হঠাৎ। চেপে ধরল তার কব্জি। বেলুন বোলানোয় এতটাই মগ্ন ছিল সে, চমকে গেল। কার হাত বুঝতে সময় লাগল।
'টম তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়,' কানের কাছে হিসহিস করে উঠল কন ডিকির কণ্ঠ। মোরগের মত ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়ে আছে সে। 'রবিন জখম হয়েছে। তোমার যাওয়াটা জরুরী।'
চট করে ফ্লোটের দিকে চোখ চলে গেল মুসার। 'ওর আবার কি হলো? ওই তো দাঁড়িয়ে আছে।'
'ও রবিন নয়। এসো আমার সঙ্গে,' হাত ধরে টান দিল ডিকি। জোরাজুরি শুরু করল। বাধা দিল মুসা। যেতে চাইছে না। শীতল আঙুলগুলোর চাপ কঠিন হলো কব্জিতে। 'এসো আমার সঙ্গে। তোমার সাহায্য দরকার...'
'রবিন নয়!...তাহলে কে...'
কথা শেষ করতে পারল না মুসা। হ্যাঁচকা টানে দর্শকদের ভিড়ে ওকে ঢুকিয়ে ফেলল ডিকি। চারপাশের মানুষগুলোর মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার আগে ফিরে তাকিয়ে পলকের জন্যে দেখল ওদের দিকে দৌড়ে আসছে কিশোর।
ওর সঙ্গে কথা বলার কোন সুযোগ নেই। ভিড় মুসাকে আপনাআপনি ঠেলে দিচ্ছে পেছন দিকে। বেরিয়ে এল, কিংবা বলা ভাল, বের করে দেয়া হলো ওকে একটা সাইড স্ট্রীটে। এখানে ভিড় পাতলা।
'রবিনের কি হয়েছে?' জানতে চাইল সে। 'কোথায় ও?'
'সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। আর কোন প্রশ্ন নয়,' কর্কশ হয়ে উঠল ডিকির কণ্ঠ। মুসার গায়ে চেপে এল সে। শক্ত কিছুর খোঁচা লাগল পেটের একপাশে। ঘাড় কাত করে তাকিয়ে দেখল একটা ছুরির চকচকে ফলা। ডিকি বলল আবার, 'চেঁচাবে না।'

আর বাধা দিল না মুসা। ডিকির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে লাগল।
'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'
'তোমাদের বাড়িতে। তোমার বন্ধুকেও ওখানেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।'
'কেন?'
জবাব দিল না ডিকি।
একটা মোড় ঘুরতে মুসার কব্জিতে শক্ত হলো আবার আঙুলগুলো। চাপা স্বরে গর্জে উঠল ডিকি, 'কোন চালাকি নয়, বুঝেছ?'
একটা গাড়ির কাছে মুসাকে নিয়ে এল ডিকি।
ধড়াস করে এক লাফ মারল মুসার হৃৎপিণ্ড। আশার আলো জ্বলল মনে। সাইকেল চালিয়ে ওদের দিকে আসতে দেখল বিডকে।
গাড়ির অন্য পাশে এসে ব্রেক কষে মাটিতে পা নামিয়ে দিল বিড।
'মুসা, এখানে কি করছ?'
কথা বলার জন্যে মুখ খুলতে গেল মুসা। কিন্তু ওর আগেই জবাব দিয়ে দিল ডিকি, 'মুসার আম্মা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি আমি।'
'ও,' উদ্বেগ ফুটল বিডের চেহারায়। 'বেশি খারাপ?'
তীক্ষ্ণ খোঁচা লাগল মুসার পেটে। 'না, কনি। কিশোরের সঙ্গে দেখা হলে তাকে বোলো কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাকে।'
শূন্য দৃষ্টিতে মুসার দিকে তাকাল বিড। 'বলব!'
একটানে প্যাসেঞ্জার ডোর খুলে ফেলল বিড। মুসার কাঁধ ধরে ঠেলে ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। হাত থেকে বেলুন বাঁধা লাঠিটা খসে গেল মুসার। পড়ে গেল রাস্তায়।
'অতটা খারাপ নয়,' বিডের দিকে তাকিয়ে বলল ডিকি। প্যাসেঞ্জার ডোর লাগিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্যপাশের দরজা খুলল। 'তোমার কাজ তুমি করোগে। মুসাকে আমি দেখব।'
প্যাসেঞ্জার সীটে ভাঁজ করে ফেলে রাখা হয়েছে একটা ম্যাপ। তার ওপরই বসে পড়েছে মুসা। টেনে বের করল নিচ থেকে। ম্যাপটা এমন ভাবে ভাঁজ করা হয়েছে, রকি বীচের একটা অংশ বেরিয়ে আছে।
ডিকি কথা বলছে বিডের সঙ্গে। কয়েক সেকেন্ড সময় পাওয়া গেছে। সুযোগটা কাজে লাগাল মুসা। পকেট থেকে মিস ওয়ান্ডারের দেয়া লিপস্টিকটা বের করল। সেটা দিয়ে ম্যাপে দ্রুত একটা গোল দাগ দিল। ওদের বাড়িটা যে গলিতে রয়েছে, সেটাতে। বুঝিয়ে দিল তাকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর ম্যাপটা একপাশে রেখে দিল, দরজার কাছাকাছি।
সাইকেলে বসে থেকে পাশের জানালা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে বিড।
'বাই, কনি,' বিডের দিকে তাকিয়ে বলল মুসা। ছুরিটা ধরা নেই এখন। ইচ্ছে করলে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু রবিনের ব্যাপারটা রহস্যময় মনে হচ্ছে ওর কাছে। নিশ্চয় ও কোন বিপদে পড়েছে। তার কাছে যাওয়া দরকার।

গাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে ওর কাছে যাওয়া হবে না। ডিকি তাকে ফেলে রেখেই পালাবে। রবিনকে এখন যেখানে রেখেছে সেখান থেকে সরিয়ে ফেলবে।

গাড়িতে উঠে দড়াম করে দরজা লাগাল ডিকি। স্টার্ট দিল। এমন করে গাড়ি পিছাতে শুরু করল, বিডের সাইকেলেই বাড়ি লাগার অবস্থা।

তাড়াতাড়ি প্যাডাল করে সরে গেল সে।

আচমকা দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসা। খুলে ফেলল কয়েক ইঞ্চি। চোখের পলকে ছুটে এল ডিকির হাত। টান দিয়ে বন্ধ করে ফেলল আবার দরজাটা।

'খবরদার!' গর্জে উঠল ডিকি। 'আরেকবার খোলার চেষ্টা করে দেখো খালি! মারা পড়বে বলে দিলাম!'

সীটে হেলান দিল মুসা। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে ডিকির দিকে। তবে তার কাজ সে সেরে ফেলেছে। দরজাটা ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ফেলে দিয়েছে ম্যাপটা।

সতেরো

মোড়ের কাছে বিডকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল কিশোর। চলন্ত গাড়িটার দিকে তাকিয়ে আছে বিড।

তার কাছে দৌড়ে এল কিশোর। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'আটকালে না কেন? কোথায় নিয়ে গেল মুসাকে?'

বিমূঢ়ের মত কিশোরের দিকে তাকাল বিড। 'লোকটা তো বলল, মুসার আম্মার নাকি অসুখ। আমাকে কনি বলে ডাকল মুসা। অবাক লাগছিল। আমি ভাবলাম, ভাঁড় সেজেছে তো, এটাও কোন ধরনের রসিকতা।'

'রসিকতা!' বুঝতে পেরে চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'মোটেও না! ওকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কোথায় নিয়ে গেছে জানো কিছু?'

'বলল তো হাসপাতালে…রাখো, রাখো, দরজা দিয়ে কি যেন ফেলেছে মুসা। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

সাইকেল ঘুরিয়ে রওনা হয়ে গেল বিড। পেছনে ছুটল কিশোর। ওর আগেই ম্যাপটা তুলে নিল বিড। বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে।

ম্যাপে লিপস্টিকের দাগটা দেখল কিশোর। 'মুসাদের বাড়ির রাস্তা। ওখানেই গেছে। পুলিশকে জানানো দরকার। জলদি! শিওর, রবিনকেও ওখানেই নিয়ে গেছে ওরা।'

'রসিকতা করছ না তো? আমাকে ঠকানোর জন্যে?' দ্বিধা যাচ্ছে না বিডের। 'রবিন তো রয়েছে ফ্লোটের ওপর, তাই না?'

'না। ফ্লোটে যে আছে সে রবিন নয়। আমার ধারণা, ও টমের মা। দেখি,

সাইকেলটা দাও তো তোমার।' হ্যান্ডেল ধরে মোচড় দিয়ে বিডের হাতটা সরিয়ে দিল গ্রিপ থেকে। তাকে প্রায় ধাক্কা মেরে নামিয়ে দিল সীট থেকে।

বোকার মত তাকিয়ে আছে বিড। 'কিশোর, কি করছ...কোথায় যাবে?'

লাফ দিয়ে সীটে চড়ে বসল কিশোর। প্যাডালে চাপ দিল। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'রবিনদের বাড়িতে যাচ্ছি। তুমি পুলিশে খবর দাওগে, জলদি!'

বিডকে বুঝিয়ে বলার সময় নেই। দ্রুত প্যাডাল করে চলল সে। মুসাদের অনুসরণ করে কি হবে, সেটাও জানে না। শুধু জানে, মুসা আর রবিন ভয়ানক বিপদে পড়েছে। সময়মত ওদের কাছে পৌঁছতে হবে।

তীরবেগে ছুটছে সাইকেল।

মুসাদের বাড়ির পঞ্চাশ গজ দূরে এসে সাইকেল থামাল সে। হ্যান্ডেলবারে ভর রেখে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দম নিতে লাগল ডাঙায় তোলা মাছের মত হাঁ করে। পা দুটোতে মনে হচ্ছে কোন সাড় নেই। অবশ।

সাইকেল থেকে নেমে ঠেলে এনে ঠেস দিয়ে রাখল পাতাবাহারের বেড়ায়। পা বাড়াল মুসাদের গেটের দিকে। এত উত্তেজনার মধ্যেও সামান্যতম অসতর্ক হয়নি।

ড্রাইভওয়েতে পৌঁছে গাড়িটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে চট করে বসে পড়ল একটা ইঁটের থামের আড়ালে। স্টীয়ারিঙে বসা লোকটার দিকে নজর।

বড় বড়, ভারী কয়েকটা দম নিল কিশোর। শরীরটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল। আস্তে মাথা তুলে তাকাল আবার।

গাড়িতে বসে আছে টম।

চারপাশে চোখ বোলাল কিশোর। গেটের বাইরের লম্বা, ঢালু রাস্তাটা একেবারে নির্জন। সবাই চলে গেছে ফেসটিভ্যালে। পাহারা দিচ্ছে টম। তার চোখ এড়িয়ে সামনের দরজার কাছে যাওয়ার উপায় নেই।

পিছিয়ে এল কিশোর। সরে চলে এল খানিক দূরের ছাউনিটার দিকে। ওটার পাশ দিয়ে ঘুরে চলে এল বাড়ির পেছনে। দুটো ঘরের মাঝখানে বাগান। ভাল করে তাকিয়ে দেখল, এটা পেরোতে গেলে টমের নজরে পড়বে কিনা। তারপর ক্যামকর্ডারটা শক্ত করে চেপে ধরে মাথা নিচু করে দিল দৌড়।

পেছনের দরজায় তালা দেয়া। এটাই আশা করেছিল। অন্য একটা চিন্তা এল মাথায়।

আবার ছুটল। চলে এল বড় একটা জানালার কাছে। ভেতরে উঁকি দিল। এ ঘরে বসেই পার্টির দিন গ্রেট মিসটিরিয়োসোর জাদু দেখেছিল।

চুরি করার পর যে কাঁচটা ভেঙে রেখে গিয়েছিল চোর, সেটা আটকে দেয়া হয়েছে এক টুকরো প্লাইউড দিয়ে। হাত বাড়িয়ে নাগাল পাওয়া যায় না।

বাড়ির পাশে সাজিয়ে রাখা বড় বড় ফুলের টবের একটাকে টেনে নিয়ে এল জানালার নিচে। কিনারে পা রেখে উঠে দাঁড়াল। কাত হয়ে পড়ে যাবার ভয় আছে। কোনমতে ভারসাম্য বজায় রেখে নখ দিয়ে খুঁচিয়ে তোলার চেষ্টা করল

প্লাইউডে বসানো পেরেক।

অসম্ভব কাজ। যন্ত্র ছাড়া হবে না। চারপাশে তাকাতে লাগল। বাগানে কাজ করার পুরানো কতগুলো যন্ত্রপাতি পড়ে আছে। পুরানো, মরচে ধরা একটা কর্ণিক তুলে এনে চাড় মেরে সরু মাথাটা ঢুকিয়ে দিল প্লাইউড আর জানালার ফ্রেমের ফাঁকে। চাপ দিতে শুরু করল।

মচমচ আওয়াজ হতে লাগল। চাপ ছাড়ল না সে। পেরেক ছুটল না, প্লাইউডটাই গেল ভেঙে। আচমকা ঝাঁকি লেগে ভারসাম্য হারিয়ে কাত হয়ে গেল টব। পড়ে যেতে যেতে জানালায় হাত রেখে কোনমতে সামলে নিল সে। পায়ের ধাক্কায় সোজা করল আবার। ভাঙা ফোকর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ছিটকানিটা খুঁজতে লাগল।

আধ মিনিটের মধ্যে ঘরে ঢুকে পড়ল। পা টিপে টিপে এগোল দরজার দিকে।

কাছেরই কোন ঘর থেকে ভেসে এল কথার শব্দ। নিঃশব্দে হল পেরিয়ে এসে দাঁড়াল একটা আধখোলা দরজার সামনে।

এদিকে পেছন করে বসে আছে কন ডিকি। এক হাত দিয়ে খামচে ধরেছে চেয়ারের হেলান, আরেক হাত ঝুলছে একপাশে, আলতো করে ধরে রেখেছে একটা ছুরি। তার সামনে বসিয়ে রাখা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। চেয়ারের সঙ্গে হাত-পা বাঁধা।

'...আমি সেজন্যে ভাবছি না,' কন ডিকি বলছে। 'ওকেও ধরব আমরা। তিনজনকেই আটকাব।'

ঝিলিক দিয়ে উঠল রবিনের চোখ। কিশোরকে দেখে ফেলেছে।

'কিশোরকে আপনি চেনেন না। কিছুতেই ধরতে পারবেন না,' ডিকির চোখে চোখ রেখে বলল রবিন। 'এই মুহূর্তে নিশ্চয় পুলিশের সঙ্গে কথা বলছে সে।'

মুসাও দেখেছে কিশোরকে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ সরিয়ে নিল। ডিকির সন্দেহ জাগাতে চায় না।

'তা ঠিক,' রবিনের কথায় সুর মেলাল মুসা। 'যেই দেখবে, মিছিলে আমি নেই, সব বুঝে ফেলবে সে। ক'দিন থেকেই আপনাদের ওপর নজর রয়েছে আমাদের।'

'আমি হলে হাল ছেড়ে দিতাম এতক্ষণে,' রবিন বলল। 'ভাল চাইলে ওপরতলায় আপনার সঙ্গীর কাছে চলে যান।'

সিঁড়ির দিকে ঘুরে গেল কিশোরের চোখ। রবিনের ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছে। কন ডিকি একা নয় বাড়িতে।

'সে দেখা যাবে,' ডিকি বলল। 'যাই, টমকে গিয়ে বলে আসি তোমাদের বন্ধুকে নিয়ে আসার জন্যে।' চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল সে।

'আমাদের নিয়ে কি করার ইচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'জানলে খুশি হবে না। তবে একটা কথা নিশ্চিত জেনে রাখো, পুলিশ আসার অনেক আগেই এখান থেকে বহুদূরে চলে যাব আমরা। হয়তো সেটা

দেখার ভাগ্যও তোমাদের হবে না।'

'এ সব করে পার পাবেন না,' কঠিন স্বরে বলল রবিন।

হেসে উঠল ডিকি। হাসিটা ভয়ঙ্কর।

দরজার কাছ থেকে সরে গেল কিশোর। দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে শুনে নিঃশব্দে দৌড় দিল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়িতে উঠে লুকিয়ে পড়ল।

পায়ের শব্দে বুঝল, হলঘরে ঢুকেছে ডিকি।

ওপর থেকে শোনা গেল আরেক জোড়া পায়ের শব্দ। মুসার আম্মার বেডরুমে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ।

পা টিপে টিপে ল্যান্ডিঙে উঠে এল কিশোর। দরজা খোলা। ভেতরে উঁকি দিল। একটা চেস্ট অভ ড্রয়ার টেনে খুলে তার মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করছে টমের বাবা মার্ক জুবের। মেঝেতে ছড়িয়ে ফেলেছে কাপড়-চোপড়, নানা জিনিস।

একা ওর সঙ্গে পারবে না। তবে ও কিছু বোঝার আগেই দরজাটা আটকে দিতে পারে।

দম বন্ধ করে হাত বাড়াল কিশোর। শব্দ হলে আর রক্ষা নেই। মুহূর্তে ছুটে এসে চেপে ধরবে তাকে।

নেবার মত কিছু না পেয়ে গজ গজ করছে মার্ক। ঠেলা মেরে ড্রয়ারটা লাগিয়ে দিয়ে আরেকটা ড্রয়ারের দিকে হাত বাড়াল।

তালার ভেতরের দিকের ফুটোয় ঢুকিয়ে রাখা চাবিটা লাগল কিশোরের আঙুলের মাথায়। ঠাণ্ডা, ধাতব স্পর্শ। টেনে খুলে আনা একটা ভীষণ কঠিন কাজ মনে হলো এমুহূর্তে।

আরেকটু এগোতে গেল সে। একই সঙ্গে টান দিল চাবিটা ধরে। কাঁধ থেকে পিছলে গেল ক্যামকর্ডারের ফিতে। বাড়ি লাগল দরজায়। সামান্য শব্দ। কিন্তু কিশোরের মনে হলো যেন বোমা ফাটল।

চাবিটা খুলে চলে এসেছে হাতে। ঝটকা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে জুবের। চোখে চোখ পড়ল দু'জনের।

হাতল ধরে একটানে দরজাটা লাগিয়ে দিল কিশোর। চাবি ঢুকিয়ে দিল তালার ফুটোয়। ভেতরে শোনা গেল জুবেরের গর্জন। দুপদাপ করে ছুটে আসছে। ঝাঁপিয়ে পড়ল দরজার গায়ে। এত জোরে শব্দ হলো, মনে হলো ভেঙে যাবে দরজা।

তালা লাগিয়ে দিয়েছে কিশোর। সন্তুষ্ট হয়ে আপনমনে বলল : যাহ্, একটা গেল!

সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে লাগল সে। সামনের দরজাটা খোলা। ডিকিকে দেখা যাচ্ছে না।

এত দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে বোধহয় আর কোনদিন নামেনি। কোন দিকে না তাকিয়ে, আছড়ে পড়ে পা ভাঙার পরোয়া না করে সিঁড়ির গোড়ায় নেমে এল সে। ছুটল যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছে মুসা আর রবিনকে। ঢুকেই দরজা লাগিয়ে দিল।

'চাবি আছে এ ঘরের?' জানতে চাইল।

'না,' মাথা নাড়ল মুসা। চোখের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'ওটা দিয়ে ঠেস দাও।'

তাড়াতাড়ি গিয়ে চেয়ারটা টেনে নিয়ে এল কিশোর। এমনভাবে রাখল, যাতে দরজার হাতলের নিচটা চেয়ারের হেলানে আটকে যায়। অন্যপাশ থেকে ঘোরাতে পারবে না আর হাতলটা। তালার কাজ দেবে।

মুসার বাঁধন খুলতে শুরু করল সে। গিঁট ঢিলে হয়ে এসেছে, এই সময় অন্যপাশে চিৎকার শোনা গেল। কন ডিকির গলা নয়, ওপর থেকে আসছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে মার্ক জুবের।

'ডিকি!' বলছে সে, 'আমাকে আটকে দিয়েছে! জলদি এসো!'

দ্রুত হাত চালাল কিশোর। মুসার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে ছুটে গেল রবিনের দিকে। পায়ের বাঁধন মুসা নিজেই খুলতে পারবে।

রবিনের কব্জিটা সবে মুক্ত করেছে, দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কে যেন। হ্যান্ডেল ঘোরানোর চেষ্টা করছে। সামান্য কাত হয়ে গেল চেয়ারটা। ভয় হলো, পড়ে যাবে। কিন্তু কার্পেটে আটকে গেল চেয়ারের পায়া। যেটুকু কাত হয়েছে তার বেশি আর হলো না। হাতল যেটুকু ঘুরেছে তাতে খুলবে না দরজা।

কাঁধের জোরাল ধাক্কা পড়তে লাগল পাল্লার গায়ে।

শঙ্কিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে থেকে রবিন বলল, 'ভাঙতে পারবে না, কি বলো?'

'না, পারবে না,' মুসা বলল। তবে জোর নেই গলায়। আঙুল তুলে আরেকটা আধখোলা দরজা দেখাল। রবিন আর কিশোরও দেখল, ডাইনিং-রুমটা দেখা যাচ্ছে।

'ওদিক দিয়ে আসতে পারে!' আবার বলল মুসা।

বলতে না বলতেই একটা ছায়া পড়ল দরজার ওপাশে।

দরজায় দেখা দিল কন ডিকি। মুখ-চোখ লাল। হাতের বাঁকা ফলাওয়ালা ভয়ানক ছুরিটা খোঁচা মারার ভঙ্গিতে তুলে রেখেছে।

আঠারো

ওরা যেমন চমকে গেছে, ওদের দেখে ডিকিও চমকে গেছে। দাঁড়িয়ে গেল। সময় নষ্ট হলো তাতে।

সুযোগটা কাজে লাগাল কিশোর। এক লাফে চলে গেল দরজার কাছে। ডিকির মুখের ওপর দড়াম করে লাগিয়ে দিল পাল্লাটা।

মুসাও উঠে পড়েছে। একটা চেয়ার ঠেলে নিয়ে গিয়ে ঠেসে ধরল হাতলের নিচে। প্রথম দরজাটা যেভাবে আটকানো হয়েছে, এটাকেও সেভাবেই

আটকে দিল।

'ফোনটা কই?' এদিক ওদিক তাকাতে লাগল রবিন। 'পুলিশকে ফোন করা দরকার।'

'ওটা তো হলঘরে,' মুসা বলল।

'তাহলে উপায়? বেশিক্ষণ তো আটকে রাখা যাবে না এদের।'

'জানালা!' বলেই চেয়ারের পায়ায় কষে এক লাথি মারল মুসা, হেলানটা আরও শক্ত করে লাগিয়ে দিল হাতলের সঙ্গে। তারপর ছুটল জানালার দিকে।

বন্ধ দরজায় যেন বাজ পড়ল। জোরে জোরে ধাক্কা মারছে।

'মুসা, কি করছ?' পেছন থেকে জানতে চাইল কিশোর।

জানালার ছিটকানি খোলার চেষ্টা করছে মুসা। বহুদিন খোলা হয় না বলে মরচে পড়ে আটকে গেছে।

'নাহ্, নড়ছেও না,' নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল মুসা। 'একটা স্ক্রু-ড্রাইভার হলে চেষ্টা করে দেখা যেত। চাড় মেরে...'

'আনো তাহলে স্ক্রু-ড্রাইভার,' রবিন বলল।

'এ ঘরে কোথায় পাব?'

বিচিত্র একটা শব্দ হতে ঘুরে তাকাল তিনজনেই। কার্পেটের সঙ্গে আটকে যাওয়া প্রথম চেয়ারটা কার্পেট সহই সরতে আরম্ভ করেছে। ঘুরে গেল হাতল। ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। একটা হাত দেখা গেল, দরজার কিনার ধরে রেখেছে।

দৌড়ে গিয়ে ক্যামকর্ডারটা দিয়েই ঘুরিয়ে বাড়ি মারল কিশোর। রাগে, ব্যথায় আর্তচিৎকার করে উঠল হাতের মালিক। দরজা ছেড়ে দিল হাতটা।

'পুলিশ আসছে!' ভয় দেখানোর জন্যে চিৎকার করে বলল কিশোর। 'যে কোন মুহূর্তে চলে আসবে!'

কন ডিকিও সমানে ধাক্কা মেরে যাচ্ছে দরজার গায়ে। ঠেলা, ধাক্কা, লাথি, হাতল ঘোরানোর জন্যে চাপাচাপি–যে ভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে সে, পাল্লা খুলতে দেরি হবে না। দু'দিক থেকে যদি ছুরি-পিস্তল নিয়ে আক্রমণ চালায় শত্রুরা, আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গতি থাকবে না গোয়েন্দাদের।

কাত হয়ে গেল চেয়ার। ঘুরতে শুরু করল হাতল। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দরজা।

দৌড়ে এল মুসা আর রবিন। হাতে বাড়ি খাওয়া অন্যপাশের লোকটা আবার ঢোকার চেষ্টা চালানোর আগেই ঠেলা মেরে লাগিয়ে দিল পাল্লা। চেয়ারটা ঢুকিয়ে দিতে গেল হাতলের নিচে।

'না না, লাগিয়ো না!' বাধা দিল কিশোর।

অবাক হলো দুই সহকারী। কি আছে গোয়েন্দাপ্রধানের মনে? কি করতে চায়?

আবার ফাঁক হয়ে গেল দরজা। খুলতে শুরু করল।

চেয়ারটা তুলে নিল কিশোর।

ঝটকা দিয়ে হাঁ হয়ে খুলে গেল দরজা। তাল সামলাতে না পেরে সামনের দিকে সামান্য বাঁকা হয়ে গেল কন ডিকির শরীর। মাথাটা ঝোঁকানো।

কোন রকম দ্বিধা করল না কিশোর। চেয়ার দিয়ে বাড়ি মারল ডিকির মাথায়। সোজা হওয়ারও সুযোগ পেল না ডিকি। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কার্পেটে।

'মর ব্যাটা!' আনন্দে চিৎকার করে উঠল মুসা। হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা লোকটার ওপর দিয়ে লাফ মেরে চলে এল অন্যপাশে। কিশোর আর রবিন তার আগেই পার হয়ে গেছে। হুড়মুড় করে ডাইনিং-রূমে ঢুকল তিনজনে। দরজার দিকে ছুটল। ওটা দিয়ে হলঘরে ঢোকা যায়।

কিন্তু সামনের দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে টম। হাতে বাড়ি খেয়ে আর ঘরে ঢোকার চেষ্টা করেনি। এখনও হাত ডলছে। ওদের দেখে ডিকির নাম ধরে চেঁচিয়ে উঠল।

ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ হলো। টম যে দরজাটা খোলার চেষ্টা করেছিল, সেটা খুলে বেরিয়ে এল ডিকি। রাগে জ্বলছে চোখ।

'দোতলায়!' বলেই সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল মুসা।

ছুটল তিনজনে।

পেছন থেকে কিশোরের জ্যাকেট খামচে ধরল ডিকি। ফিরে তাকানোর সময় নেই। ক্যামকর্ডারটা ঘুরিয়ে আন্দাজেই বাড়ি মারল কিশোর। থ্যাক করে লাগল ডিকির মুখে। আর্তনাদ করে মুখ চেপে ধরল ডিকি। তাকাল না কিশোর। লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যেতে লাগল সিঁড়ি বেয়ে।

'ধরো ওদের! ধরো না, পালিয়ে যাচ্ছে তো!' দরজার কাছ থেকে বলল টম।

ল্যান্ডিং দিয়ে আসার সময় জুবেরের চিৎকার আর দরজা ধাক্কানোর শব্দ শুনতে পেল তিন গোয়েন্দা। সোজা এসে ঢুকে পড়ল মুসার শোবার ঘরে।

দরজায় তালা লাগিয়ে দিল মুসা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল তিনজনে।

'নেংটি ইঁদুরের দল!' বিড়বিড় করে গাল দিল মুসা। 'আবার এসেছে। একবার চুরি করে গিয়েও শান্তি হয়নি।'

'একবারে তো আর সব নিতে পারেনি,' রবিন বলল। 'দামী দামী জিনিস দেখে গেছে। লোভ কি আর সামলাতে পারে।...আগে বলোনি কেন আমাকে? আজ সকালে তাহলে কোনমতেই আমাকে তুলে আনতে পারত না টম।'

'কতবার সাবধান করতে চেয়েছি তোমাকে,' মুসা বলল। 'তুমি তো আমাদের কথা শুনতেই চাওনি। জাদু করেছিল নাকি তোমাকে ওরা?'

'কি করেছিল জানি না। তবে কিছু একটা করেছিল...সম্মোহন-টম্মোহন কোন কিছু; কোল্ড ড্রিংকসের সঙ্গে মিশিয়ে কোন ধরনের ওষুধও খাইয়ে থাকতে পারে।...মোট কথা, টমের মা'টার কাছে কিছুক্ষণ থাকলেই মাথার

মধ্যে কেমন যেন হয়ে যেত আমার...'

'কেন করল?'

'তা তো জানি না!'

'রকি বীচের মানুষ সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্যেই নিশ্চয় তোমার সাথে খাতির করেছিল টম,' কিশোর বলল। 'তা ছাড়া আমাদের কথাও হয়তো শুনে থাকবে। ঘন ঘন চুরিদারি হতে থাকলে তদন্ত করতে পারি আমরা—ওদের জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমাকে হাত করে আমাদের দমিয়ে রাখতে চেয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হতে পারে।...যাই হোক, আমাকে স্কুলে না যেতে দেখে তোমরা খোঁজ নাওনি? আমাকে ছাড়াই ফ্লোট ছেড়ে দিয়েছে?'

'ফ্লোটে তোমার জায়গায় আরেকজন চড়ে বসে আছে,' জবাব দিল কিশোর।

'মানে!' বুঝতে পারছে না রবিন।

মুসাও তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে।

'টমের মা, সারালিন জুবের,' কিশোর বলল। 'সবার অলক্ষে কোন এক ফাঁকে স্কুলে ঢুকে তোমার পোশাকটা পরে ফেলেছে। তোমার নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারটা কাউকে বুঝতে দিতে চায়নি, বিশেষ করে আমাকে আর মুসাকে।...কিন্তু আমাদের ধরে আনল কেন ওরা? কি করতে চেয়েছিল আমাদের নিয়ে?'

'টমের বাবাকে স্পেনে চলে যাওয়ার কথা বলতে শুনেছি,' রবিন বলল। 'ওরা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছিল, তোমরা ওদের সন্দেহ করেছ। ওদের কাজে বাধা দিতে পারো। তাই কোথাও আটকে রেখে নিরাপদে কাজ সেরে পালিয়ে যেতে চেয়েছিল।'

'চোরের গোষ্ঠী চোর! শয়তানের দল!' আবার গাল দিল মুসা। 'আটকে রাখত না মেরে ফেলত কে জানে। মেরে ফেলাটাই ছিল ওদের জন্যে নিরাপদ...'

দরজা ধাক্কানোর শব্দ কানে আসছে।

'বেরোও! বেরিয়ে এসো!' কন ডিকির গলা। 'তাহলে আর কিছু বলব না।'

'তা তো বটেই,' ব্যঙ্গ করে জবাব দিল রবিন। 'আরও তোমাদের বিশ্বাস করি!'

আবার ধাক্কাধাক্কি শুরু করল ডিকি। মিসেস আমানের বেডরুমে চেঁচামেচি করছে মার্ক জুবের। এখনও বেরোতে পারেনি।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'কি করব?'

'এখানেই বসে থাকব। যত ধাক্কাধাক্কিই করুক, ঢুকতে পারবে না ওরা। জুবেরকে না বের করা পর্যন্ত যেতেও চাইবে না। ততক্ষণে পুলিশ চলে আসবে।'

'সত্যি ঢুকতে পারবে না?' সন্দেহ যাচ্ছে না রবিনের।

তার প্রশ্নের জবাবেই যেন ঘন ঘন লাথি পড়তে লাগল দরজায়। তারপর অন্য ধরনের একটা শব্দ। ধারাল কিছু দিয়ে কোপ মারা হচ্ছে মনে হলো। কুড়াল না তো!

'খাইছে!' আঁতকে উঠল মুসা। 'এবার সত্যি সত্যি ভেঙে ফেলবে!'

'থাকা যাবে না এখানে,' রবিন বলল। 'পালানো দরকার।'

জানালার দিকে তাকাল কিশোর, 'ওদিক দিয়ে বেরোনো যায় না?'

জানালার কাছে এসে দাঁড়াল তিনজনে। বাগানের দিকে তাকাল। মসৃণ, সবুজ ঘাসে ঢাকা বাগানটা অনেক নিচে মনে হলো।

'কত আর হবে?' আন্দাজ করল রবিন। 'বারো-চোদ্দ ফুট? লাফিয়ে নামা যাবে। কি বলো?'

গুঙিয়ে উঠল কিশোর। 'আমি পারব না।'

মাথা কাত করল মুসা। 'না পারার কি হলো?'

'আমার ভারী শরীর...'

'ওতে কিছু হবে না। নিচে মাটি নরম। এসো, দেখো, কিছুই হবে না।'

'তোমরা যাও। আমি আসছি।'

দৌড়ে দরজার কাছে চলে এল কিশোর। চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই, কোপাকুপির দরকার নেই। দরজাটা নষ্ট কোরো না। খুলছি।' কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল। জানালার পাল্লা খুলে ফেলেছে মুসা। চৌকাঠে উঠে বসেছে। 'ইয়া আলী!' বলে চিৎকার করে উঠে ব্যাঙের মত ঝাঁপ দিল সে।

মুসা অদৃশ্য হয়ে যেতেই চৌকাঠে উঠে বসল রবিন।

দরজার দিকে ঘুরল আবার কিশোর।

'সত্যি বেরোচ্ছ তো?' অন্যপাশ থেকে কথা শোনা গেল। ডিকি নয়, মার্ক জুবেরের কণ্ঠ। ওকে মুক্ত করে ফেলেছে।

'হ্যাঁ। চাবিটা আটকে গেছে। ঘুরছে না। একটু দাঁড়ান।' চেয়ার-টেবিল সব তুলে এনে দরজায় ঠেস দিল কিশোর। তার ওপর চাপিয়ে দিল ভারী ভারী জিনিস। তারপর ছুটে এল জানালার কাছে।

রবিনও নেমে গেছে। নিচে উঁকি দিল কিশোর। মুখ তুলে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে দু'জনে। ও তাকাতেই তাড়াতাড়ি নামতে ইশারা করল।

চৌকাঠে উঠে বসল সে। চোখ বন্ধ করে দিল লাফ। কানের কাছে বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ শুনল। পা দুটো ঠেকল মাটিতে।

প্রচণ্ড ঝাঁকুনি। হ্যাঁক করে উঠল বুকের মধ্যে কোথায় যেন। সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল হাঁ করা মুখ থেকে।

একপাশ থেকে ধরে তাকে টেনে তুলল মুসা। 'ব্যথা পেয়েছ?'

নীরবে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল কিশোর।

বাড়ির সামনের গেটের দিকে দৌড় দিল ওরা।

ড্রাইভওয়েতে এসে গাড়িতে কাউকে না দেখে ছুটে গেল রবিন। ইগনিশন থেকে টান দিয়ে চাবিটা খুলে নিল।

ছুটতে ছুটতে বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। কোন্‌দিকে যাবে ভাবছে, এই

সময় কানে এল সাইরেনের শব্দ।
পুলিশের সাইরেন!
'যাক, বিড তাহলে খবরটা দিয়েছে!' হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল কিশোর।
বাড়ির দিকে ফিরে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজনে। টম, জুবের কিংবা ডিকি বেরোয় কিনা, পাহারা দিতে লাগল।
বেরোল না কেউ।
গেটের কাছে পৌঁছে গেল পুলিশের গাড়ির বহর। চারটে গাড়ি এসেছে। ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল সামনের গাড়িটা। লাফিয়ে নামল একজন অফিসার। চোরেরা কোথায় আছে জানাল তাকে কিশোর।
পুলিশের সঙ্গে আবার বাড়ির মধ্যে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। এত পুলিশ দেখে বিশেষ বাধাটাধা দিল না আর জুবের। তার দেখাদেখি কন ডিকিও চুপ করে রইল। দু'জনের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো।
কিন্তু টম কোথায়? পুলিশের সাইরেন শুনেই নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।
হলঘরের খোলা জানালাটার দিকে চোখ পড়তেই বুঝে ফেলল কিশোর, কোন্‌দিকে গেছে টম। দৌড় দিল সেদিকে। জানালা দিয়ে মুখ বের করে বাইরে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'ওই যে! চলে যাচ্ছে!'
আধডজন পুলিশ পিছু নিল টমের।

'কিশোর, দেখো কে এসেছেন,' দরজা খুলে দিয়ে বললেন মিসেস আমান।
হাসিমুখে ঘরে ঢুকলেন পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার।
মুসাদের বাড়ির হলরুমে রয়েছে তিন গোয়েন্দা। আরও অনেক ছেলেমেয়ে উপস্থিত। ফেসটিভ্যাল উৎসবের কয়েক দিন পর মুসাদের বাড়িতে জমায়েত হয়েছে ওরা। শুধু ছোটদের জন্যে আরেকটা পার্টি দিচ্ছেন মুসার আম্মা। বাড়িতে চুরি ঠেকানোর আনন্দে।
লাইব্রেরি থেকে ম্যাজিকের ওপর বই এনে গবেষণা করেছে কিশোর। সে, মুসা আর রবিন মিলে বেশ কিছু হাত সাফাইয়ের প্র্যাকটিস করেছে। মানুষ গায়েব করার খেলা দেখানোর জন্যে যে ধরনের বাক্স ব্যবহার করেছিল গ্রেট মিসটিরিয়োসো, ওরকম একটা বাক্সও জোগাড় করেছে। পার্টিতে খেলা দেখাবে তিন গোয়েন্দা ওরফে তিন কিশোর জাদুকর।
হই-চই করছে উত্তেজিত কিশোর-কিশোরীরা। ইয়ান ফ্লেচারের আগমনে সামান্য স্তিমিত হলো।
'ভাবলাম,' এগিয়ে এসে তিন গোয়েন্দার উদ্দেশে বললেন তিনি, 'চুরির কেসের কতখানি অগ্রগতি হয়েছে জানতে চাইবে তোমরা। মিসেস পাশাকে ফোন করে তোমাকে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, এখানে আছ। মিসেস আমানকে ফোন করলাম। তিনি পার্টির দাওয়াতই দিয়ে বসলেন।'
একটা চেয়ার এগিয়ে দিল মুসা।

'থ্যাংকিউ,' বলে তাতে বসলেন ক্যাপ্টেন। কিশোরের দিকে তাকালেন, 'কিশোর, তোমার ধারণাই ঠিক। এখানে আসার আগে রিয়ারসাইড কাউন্টিতে ছিল জুবেররা। ডিকিও থাকত ওদের সঙ্গে। সে সারালিনের ভাই। ওখানেও লোক ঠকিয়ে, চুরিদারি করে শেষে আর টিকতে না পেরে পালিয়ে এসেছে রকি বীচে। ওখানকার পুলিশ ওদের খুঁজছে। এখানে এসেও সেই একই খেলা জুড়েছিল। ম্যাজিক শো কিংবা ফেইথ হীলিঙের মীটিং করার সময় কায়দা করে লোকের বাড়ির চাবির ছাপ রেখে দিত। পরে ডুপ্লিকেট চাবি বানিয়ে রাতে যেত চুরি করতে। এটাই ওদের পেশা। অনেক শহরে এ কাজ করেছে, ধরা পড়েনি। লোকের সন্দেহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে এসেছে।'

হাসলেন ক্যাপ্টেন। 'রকি বীচে আসাটা উচিত হয়নি ওদের। তিন গোয়েন্দার খপ্পরে পড়লে যে মুক্তি পাবে না জানলে আর আসত না।'

'টমের বাড়াবাড়ির জন্যেই আসলে ধরাটা পড়ল,' কিশোর বলল। 'নিজেকে অতি বুদ্ধিমান প্রমাণ করতে গিয়ে নানা রকম সূত্র তুলে দিতে লাগল আমাদের হাতে।'

'মিথ্যে কথা বলতে গিয়েই প্রথম সন্দেহটা জাগাল আমাদের,' মুসা বলল।

'মিথ্যে কথা বলে, ফাঁকিবাজি করে আর কদ্দিন,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ধরা ওদের পড়তেই হত। এখানে না হলেও অন্য কোনখানে···যাকগে, মিসেস আমান বললেন তোমরা নাকি একটা ম্যাজিক শো'র ব্যবস্থা করেছ?'

'হ্যাঁ,' হাসিমুখে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'তবে ভয় নেই। কারও কাছে চাবি চাইতে যাব না আমরা।'

'সে তো জানিই,' হাসতে হাসতে বললেন ক্যাপ্টেন।

'খেলাটা কি দেখতে চান?' মুসা বলল, 'গ্রেট মিসটিরিয়োসো যে ভাবে মানুষ উধাও করে দিত, আমরাও সেটা শিখেছি।' কিশোরের দিকে তাকাল সে। 'দেরি কেন? শুরু করে দিতে পারি, কি বলো?'

মাথা কাত করল কিশোর। 'হ্যাঁ।' নাটকীয় ভঙ্গিতে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলল, 'প্রিয় বন্ধুরা, চুপ করো, আমাদের শো এখন শুরু হতে যাচ্ছে। দয়া করে যার যার চেয়ারে বসে পড়ো।'

বসে পড়ল সবাই। সব আলো নিভিয়ে দেয়া হলো। ঘর অন্ধকার। কয়েক মিনিট পর জ্বলে উঠল পর্দার ওপরের বাতিটা। গোল আলো ফেলতে থাকল নিচের মেঝেতে রাখা ম্যাজিক বক্সের ওপর।

বুম করে পটকা ফোটার মত শব্দ হলো। রঙিন ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গ্রেট মুসাইয়োসো ওরফে মুসা আমান। তার সহকারী রবিন মিলফোর্ড। পয়সা উধাও করা আর বল লোফালুফি করে দর্শকদের করতালি পাবার পর বিণীত ভঙ্গিতে সরে দাঁড়াল একপাশে।

মানুষ উধাও করে দেবার ঘোষণা দিল তখন মুসা। ভারী কণ্ঠে বলল, 'প্রিয় বন্ধুরা, এবার তোমরা দেখতে পাবে শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর জাদু, গ্রেট মুসাইয়োসোর মানুষ উধাওয়ের খেলা। এই যে বাক্সটা দেখছ, এর মধ্যে

তোমাদের যে কাউকে ঢুকিয়ে নিয়ে জাদুর সাহায্যে আমি গায়েব করে দিতে পারি। বিশ্বাস না হয়, এসে বাক্সে ঢুকে প্রমাণ করতে পারো। তবে বুঝেশুনে আসবে। যদি কিছু ঘটে যায় আমাকে দোষ দিতে পারবে না।'

কিন্তু কেউ অবিশ্বাসী হয়ে প্রমাণ করতে আসতে রাজি হলো না। কে যায় বাক্সে ঢুকে চিরকালের জন্যে গায়েব হতে। পেশাদার ম্যাজিশিয়ান নয় মুসা। যদি গায়েব করে দিয়ে আর বাতাস থেকে ফেরত আনতে না পারে!

আগ্রহী কাউকে না পেয়ে শেষে রবিনকে অনুরোধ করল মুসা, 'রবিন, তুমি ঢুকবে?'

খানিকক্ষণ ইতস্তত করে শেষে যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো রবিন। ঘাড় কাত করে বলল, 'ঠিক আছে। তবে গায়েব করার পর ফিরিয়ে আনতে পারবে তো?'

হেহ্ হেহ্ করে খাঁটি জাদুকরি ভঙ্গিতে হাসল মুসা। 'গ্রেট মুসাইয়োসোর ওপর তোমারও অবিশ্বাস? নাও, দেরি কোরো না আর। নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ো।'

বাক্সের ডালা তুলে ধরে রাখল মুসা। রবিন ঢোকার পর ডালা নামিয়ে তালা লাগিয়ে দিল। চাবিটা রাখল পকেটে।

ঘরে পিনপতন নীরবতা। চোখ বুজে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ার ভঙ্গি করল মুসা। পকেট থেকে ছোট গোল একটা জিনিস বের করে আছাড় মারল। পটকা ফোটার শব্দ হলো। রঙিন ধোঁয়ায় ভরে গেল বাক্সের আশেপাশের খানিকটা জায়গা।

ধোঁয়া সরে গেলে কৌতূহলী দর্শকদের দিকে তাকিয়ে ভাবগম্ভীর স্বরে বলতে লাগল মুসা, 'প্রিয় বন্ধুরা, রবিনকে গায়েব করে দিয়েছি আমি। বিশ্বাস না হলে, এসো, দেখে যাও বাক্সের মধ্যে কিছু নেই।'

গুঞ্জন করে উঠল দর্শকরা। উঠে এল কয়েকজন। বাক্স ঘিরে দাঁড়াল।

হাসিমুখে পকেটে হাত দিল মুসা। বের করে আনল চাবিটা। ধীরে সুস্থে তালা খুলে সরে দাঁড়াল। বলল, 'নাও, নিজেরাই তুলে দেখো।'

ডালা তুলল একটা ছেলে। চিৎকার করে উঠল।

মুখ কাঁচুমাচু করে বেরিয়ে এল রবিন।

চেঁচামেচি শুরু করল দর্শকরা :

আহা, কি জাদুরে!

কই, গেল না তো!

ম্যাজিক জানে না, কচু!

পুরো একটা মিনিট বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। তারপর ফেটে পড়ল রবিনের দিকে তাকিয়ে, 'গেলে না কেন!'

সমান তেজে জবাব দিল রবিন, 'কি করে যাব? ঝাঁপির লক তো লাগানো। খুলেছিলে ওটা?'

ফাটা বেলুনের মত চুপসে গেল মুসা। বসে পড়তে গেল বাক্সের ওপর। ডালাটা যে খোলা, খেয়াল করল না। পড়ে গেল ভেতরে। শরীরের পেছনটা

কোমর সহ বাক্সের মধ্যে ঢুকে গিয়ে হাস্যকর ভঙ্গিতে ওপর দিকে উঁচু হয়ে রইল চার হাত-পা। কেউ টেনে না তুললে উঠে আসা কঠিন হবে।

হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল ছেলেমেয়ের দল।

গম্ভীর কণ্ঠে মন্তব্য করলেন ক্যাপ্টেন, 'ম্যাজিক দেখানো সহজ নয়!'

ভারী ভারী কথা বলে চাপতে চেয়েছিলেন হাসিটা। পারলেন না শেষ পর্যন্ত।

***

ভলিউম ৩৪

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা।

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০